অমরেন্দ্র দাস

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ অক্টোবর ১৯৬২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশক : শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায়
সুরভি প্রকাশনী
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ

মুদ্রাকর : শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ছয় টাকা

জেবুন্নিসার অতৃপ্ত আত্মার অমরস্মৃতি

এই লেখকের বই ঃ

বেগম রিজিয়া (২য় সং)
আকাশ-কন্যা (২য় সং)
কালীঘাটের ঘর সংসার
পটে আঁকা ছবি
কুহু-কুহু
মিলন-বিরহ
নাম নেই ছেলেটির (কিশোর উপন্যাস)
এর শেষ নেই (নাটক)
সিরাজের ফৈজী
জোনাকি ওরা

ভিন্ন ভিন্ন রঙের পাত্রে অপর্যাপ্ত রঙ। চোখের সামনে বিচিত্র রঙগুলি যেন লোলুপ রূপের বরণডালা নিয়ে ইসারা আঁকে। যেন কয়েকটি সদ্যযৌবন পাওয়া মেয়ে। তাদের এড়িয়ে নিজের চরিত্রের নিশান তোলা কঠিন তপস্যার মত।

তাই আমিও বুঝি তাদের এড়িয়ে চলে যেতে পারি নি। জড়িয়ে পড়েছি তাদের সঙ্গে। গ্রহণ করেছি তাদের। এবং এমন এক অপার্থিব স্বর্গীয় জগতের নিভৃতকুঞ্জে উপনীত হয়েছি যা ভাষায় ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত।

এরই ফলস্বরূপ এই সুবৃহৎ রচনার উপস্থাপনা। রচনার ছত্রে ছত্রে একটি উদ্দেশ্যকেই ব্যক্ত করবার বার বার চেষ্টা হয়েছে—মোগল অন্তঃপুরের রাজকুমারীদের মনের অভিব্যক্তি—তাদের যৌবনের আকাঙ্ক্ষা—অশ্রু-মালিকায় গাঁথা সহস্র বিনিদ্র রাত্রির দীর্ঘনিশ্বাস। সম্রাট আকবর বিধান রচনা করেছিলেন—'তৈমুর বংশের শাহজাদীদের শাদী হবে না।'

সম্রাটের অপূর্ব বিধানে রাজঅন্তঃপুরের শাহজাদীরা তাদের যৌবনের আগুনে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারের মধ্যে বীভৎস জীবন নিয়ে পুড়েছে। কেউ কেউ তার মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে—কারো চিন্তার মধ্যে একটু পবিত্রতার ছোঁয়াচ। ······জেবুন্নিসা পবিত্র ছিল কিনা জানি না। তবে যে সমস্ত ইতিহাস জানবার সুযোগ হয়েছে—তাদের মধ্যে জেবুন্নিসার কবি-প্রকৃতিটির একটি সুন্দর স্বচ্ছন্দ মনভঙ্গি আমাকে চমৎকৃত করেছে। যার মনের মধ্যে কবিতার রঙ—সে কী কখনো ব্যভিচারিণী জীবন যাপন করতে পারে? ইতিহাস অবশ্য অনেক কথাই বলছে। তবে সবই গোলমেলে। তবু এই বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান যুগে ব্যভিচারিণীর মূল্যায়ন অন্যার্থে অপবিত্র না। জীবনকে ন্যায়ের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত না করলেই ব্যভিচারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এখন সেই ব্যভিচারের পশ্চাতের ইতিহাস আলোচনা সাপেক্ষ।

অনেক গ্রন্থ পড়তে হয়েছে। তবে অনেকের সাহায্য প্রয়োজন হয় নি। টড, অর্ম, বার্ণিয়ার, টাভার্ণিয়ার—এঁদের ভ্রমণকাহিনী

মূল্যবান। সেদিনের মোগল সাম্রাজ্যের অনেক ইতিহাস তাঁদের গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ আমার বর্তমান রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। তবে তাঁর চরিত্র-বিচার বর্তমানের আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নমতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এছাড়া শ্রীযদুনাথ সরকারের History of Aurangzib (Vol III), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জহান্‌-আরা, মোগলবিদুষী, শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেবশর্মার জেবুন্নিসা বেগম, শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরীর জাহানারার আত্মকাহিনী, রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণ উল্লেখযোগ্য।

আরো অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। স্বল্পপরিসরে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া গেল না। গ্রন্থপঞ্জী দেওয়ার উদ্দেশ্য—ইতিহাসকে বিকৃত না করে উপন্যাস রচনার চেষ্টাকে সপ্রমাণিত করা। তা সে যাই হ'ক অনেকের বহু সাহায্য আমার এই রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে—তাঁদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তাই ঋণশোধের চেষ্টা করে কাউকে ছোট করব না।

পরিশেষে বক্তব্য 'জেবুন্নিসা'-'জেব্‌-উন্নিসা' দুটি নামই প্রচলিত। অবনীন্দ্রনাথ একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে 'জেবুন্নিসা' ব্যবহার করেছেন—আমি তাঁকেই অনুসরণ করলাম মাত্র।

২৫ অক্টোবর ১৯৬২
কলকাতা ১৪

জে বু ন্নি সা

'হর্ কি দীদন মৈল্ দারদ—
দর্ শুখন্ বীনদ মরা।'

'যে আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে সে আমার
কবিতার ভেতর আমাকে দেখতে পাবে।'

'The Paths of Glory lead but to the Grave.'

হবার ঘোষণা। সেই উপলক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য। তাই এই উৎসবকে চিরস্থায়ী করতে যা কখনও হয় নি, যা অসম্ভব, সেই সব উপকরণকে এই উৎসবের প্রাণবন্ত করে তোলাই ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছা।

এই উৎসবে পিতার রাজ্যপ্রাপ্তিতে খুশী ঔরঙ্গজেবের শেষের দু'কন্যা মিহরউন্নিসা ও জুবয়েৎউন্নিসা। তারা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের তখ্‌ত্র পিতা কর্তৃক অধিকৃত হতে দেখে সৌভাগ্যের রোশনাইয়ে হঠাৎ কেমন যেন ধাঁধিয়ে গেছে। নেমে পড়েছে তারা শাহজাদীর সম্মান থেকে একেবারে হাজারো সরাবপ্যায়ী উন্মত্ত সৈনিকদের মাঝে। অসামান্য সৌন্দর্যের জৌলুষ ছড়িয়ে দিয়েছে মাসুম মনের পবিত্রতাকে বিলিয়ে দিয়ে। ঔরঙ্গজেব তাও দেখেছেন, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। রাজ অন্তঃপুরের আবরণ উন্মোচন করে দিয়ে জোয়ানী শাহজাদীদের উপভোগ করতে দিয়ে সৈন্যদের আরও বশীভূত করবার জন্যেই তাঁর এই কৌশল। না হয় কিছু কালো রেখা রক্তবর্ণের ওপর স্পষ্ট দাগ রাখল, তাতে ক্ষতি কি? গোলাপের সুবাসে সমস্ত মনের ময়লা ধৌত করলেই তো আবার খোলতাই হবে জগতের সেরা খাব্‌সুরত সৌন্দর্য।

এ সব কথা কিছুই ভাব'ছন না ঔরঙ্গজেব পাদিশাহ। তিনি ভাবছেন, শাহজাহানকে আগ্রায় বন্দী করা হয়েছে, প্রহরী নিযুক্ত আছে তাঁরই যোগ্য-পুত্র সুলতান মুহম্মদ। জাহানারা পিতার শুশ্রূষার জন্যে এগুলো পাঠিয়েছিল। তার সে অনুরোধ মেনে নেওয়া হযেছে। সুলতান মুহম্মদকে সুজার অন্বেষণে পাঠিয়ে নপুংসক মুতমদ্‌কে পিতার প্রহরাধীনে রাখতে হবে। কারণ এই নপুংসক মুতমদ্‌ বন্দীর প্রতি ঠিক ব্যবহারই করবে। সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে থাকাকালীন এই মুতমদের এক অপরাধের দারুণ শাস্তি দিয়ে-ছিলেন। মুতমদ্‌ যে আজ সেই আঘাতের বেদনা বিস্মৃত হযেছে বলে মনে হয় না। ঔরঙ্গজেব মনে মনে হেসে বললেন, সেই মুতমদ্‌ই হবে পিতা শাহজাহানের আগামী দিনের প্রহরী।

এরপর আছে দারা শিকো, দারা শিকোর পুত্র সুলেমান শিকো, সুজা ও মুরাদ এই কজনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে পারলে পরম শান্তি। রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টিকারীদের শেষ করতে পারলে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ থাকবে না, তখন রাজ্যবিস্তারে মন দিলে মোগল সাম্রাজ্যের পরিধি আরও সমুদ্রসমান হবে।

এখন দারা লাহোরে পলায়ন করেছে। সেখানে গিয়ে নিশ্চয় সৈন্য সমাবেশে মন দিয়েছে। আবার দারার বিরুদ্ধে সৈন্য সাজাতে হবে। অভিযান চালাতে হবে।

সিংহাসনের প্রথম রাজকার্য সাঙ্গ হবার পর আমীর ওমরাহদের বিদায় দিয়ে ঔরঙ্গজেব এলেন রাজঅন্তঃপুরে। জ্যেষ্ঠকন্যা জেবুন্নিসার সন্ধান করা তাঁর একান্ত দরকার। তার পরামর্শ কিছু কিছু না নিলে মাঝে মাঝে কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়। বুদ্ধিতে শান দিয়ে নেবার জন্য জেবের বুদ্ধির ধার মাঝে মাঝে নিতে হয়। তবে সব বুদ্ধি নেন না ঔরঙ্গজেব। হাজার হোক জেব রমণী। রমণীর বুদ্ধিতে আছে মমতা। সে মমতার মিঠেল মৌতাত দিয়ে বিচার করে। আর ঔরঙ্গজেব সেই বিচারগুলো পুরুষের কাঠিন্য দিয়ে যোদ্ধার তরবারীর রূঢ়তায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে নেন। সেই জেবকে এখুনি একবার দরকার। কিন্তু কোথায় জেব? ঔরঙ্গজেব দেখলেন, তাঁর আর এককন্যা জিনৎউন্নিসা ক্রন্দনরতা দারার কন্যা জাহনজেব বাহুর শুশ্রূষায় ব্যস্ত। ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছে করল, জিনৎকে ছুটে গিয়ে প্রহার করে জাহনজেবের শুশ্রূষা থেকে নিবৃত্তি করেন। যার পিতা বিধর্মী শয়তান সিংহাসন লোভী, অথচ দুর্বল শক্তি নিয়ে সিংহাসন প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়তে আসে, তার কন্যাকে কোন ক্ষমা না।

কিন্তু মেয়েটা কাঁদছে কেন? পিতা পালিযে গেছে তার বর্তমানের তিন প্রণয়িণী উদিপুরী, রানাদিল, নাদিরা বানু ও তার চোদ্দবছরের সন্তান সিপিহরকে নিয়ে। তাকে নিয়ে যায় নি বলে কাঁদছে, না তার পিতার ভবিষ্যৎ কল্পনায় কাঁদছে? তার পিতার ভবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকারে মসীলিপ্ত, সে কথা ভেবেই হয়ত সে শোকার্তা। ঔরঙ্গজেবের একবার ইচ্ছা হল, জিনৎকে ডেকে জাহনজেবের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কি ভেবে তা থেকে নিবৃত্তি হয়ে তিনি জেবুন্নিসার সন্ধানে অন্যস্থানে চলে গেলেন।

সমস্ত উৎসবের আনন্দ কোলাহল থেকে সরে গিয়ে একেবারে নৈঃশব্দের নিশ্চুপ মৃতলোকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আলুলায়িত কেশদাম লুটিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন এক অলিন্দের একান্তে দাঁড়িয়ে জেবুন্নিসা ভেঙে পড়েছে।

জেবুন্নিসা কাঁদছে। তার সাগর নীল দুটি ডাগর চোখের কোল বেয়ে

অশ্রুবিন্দু পেলব গাল বেয়ে নামছে। অশ্রুবিন্দু নয় মুক্তাবিন্দু। আগামীদিনের শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট আলমগীরের পেয়ারী কন্যা, রংমহলের সেরা মোগলাই জৌলুষ জেবুন্নিসার চোখে জল। জেবুন্নিসার বুকের ভেতর রক্তাক্ত আহত সৈনিকের যন্ত্রণা। সাগর নীল চোখের প্রান্তদেশ থেকে মুক্তাবিন্দু অসামান্য পেলব গালের মসৃণ কুসুম বুকে এসে জমছে।

জেবুন্নিসা কাঁদছে কেন? তার স্নেহময় পিতা ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ঔরঙ্গজেব আজ জগতের সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। সবচেয়ে গৌরব যদি কারও হয়—তাহলে তা জ্যেষ্ঠকন্যা জেবুন্নিসারই হওয়া উচিত! কিন্তু তা না হয়ে সে আজ শোকার্তা, ব্যথিতা। বাপের এই আকস্মিক সৌভাগ্যে সে মনে মনে বাপের হয়ে আল্লার কাছে ক্ষমা চাইছে। বাপের ঘাড়ে যে শয়তান ভর করেছে, সেই চিন্তা করেই সে কাঁদছে। দাদু শাহজাহান আগ্রার নিভৃত-কক্ষে পিতা কর্তৃক বন্দী। দারা, সুজা, মুরাদ চাচাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে পিতা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের হত্যা করাই পিতার অভিপ্রেত। পিতার সে মনইচ্ছা বহুদিন তার কাছে পেশ করেছেন। এমন কি ভাইজান সুলেমান শিকোকে পর্যন্ত পিতা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চান! পিতার এই নারকীয় হত্যাপিপাসা বহুবার জেব নিবৃত্তি করার জন্য অন্য পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সিংহাসনের মোহে তিনি ধর্মের ন্যায়ান্যায় বিচারও ভুলেছেন। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ মহম্মদকে অপমানিত করে বাবার কার্যনীতি যে অসমর্থন যোগ্য—এ কথা বার বার তাকে যন্ত্রণা দিয়ে তার মনের কোমল বৃত্তিগুলো রূঢ় করে দিয়েছে। ঐ পিশাচ ময়ূর সিংহাসনের রূপবহ্নি প্রদাহে মোগল শাহজাদারা সবাই পুড়ছে। সিংহাসন চাই, ঐশ্বর্য চাই, রংমহলের খুসীর মৌতাত চাই। পুরুষের ভাগ্যের উচ্চস্তম্ভে আরোহণের জন্য সিংহাসনের ভাবী-উত্তরাধিকারীরা রক্তের খেলায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে। কিন্তু তার সবচেয়ে আক্ষেপ—পিতাকে সে বশীভূত করতে পারল না। তার বাইশ বছরের জ্ঞান হওয়ার দিনটি থেকে সে যে তার পিতাকে নিজের মনের মত করে গড়বার চেষ্টা করেছে। লোকে যদি কখনও জেবুন্নিসার প্রশংসা করে, তার পিতারও যে করবে এই চিন্তায় সে-যে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল!

কিন্তু দাদু শাহজাহানই বড় ভুল কাজ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে হঠাৎ উপাধি দিয়ে বসলেন। 'শাহ্ ই-বুলন্দ ইক্‌বাল্' (উচ্চভাগ্য সম্পন্ন

কুমার)। এর মানে কি? ভাইয়ের ওপর ভাই সর্বদাই ঈর্ষান্বিত। সেখানে তার পিতার যদি ক্ষোভ হয়, নিশ্চয় অন্যায় ক্ষোভ না।

পিতা একজন বড় যোদ্ধা। কৌশলী। বৃহৎ সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন। তার প্রমাণ দাক্ষিণাত্যের শাসন পরিচালনা। সেই বীরকে যদি অপমানিত করে জ্যেষ্ঠকে সম্মান দেওয়া হয়, তাহলে বীরভাইয়ের ক্ষোভ হওয়া অন্যায় না।

পিতার কোন অপরাধ একদিক দিয়ে যেমন জেবুন্নিসা দেখতে পায় না, আবার অন্যদিকে দারুণ অপরাধী মনে করে পিতাকে। পিতা লোভী, পিতা বিলাসী। পিতার ধর্ম, সুন্নীধর্ম। পিতা নিজেকে সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত একজন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বলে মনে করেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে সুরা স্পর্শ করেন না। নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসকে বর্জন করে সম্পূর্ণ আল্লার নামে হৃদয় মন উৎসর্গ করে নিজেকে সাধু বানিয়ে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

অথচ পিতা নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে নিজেকে পরিচিত করে অধার্মিকের মত সিংহাসনের জন্য রক্তের খেলায় জীবন উৎসর্গ করেছেন! পিতার এই কার্যনীতি জেবুন্নিসার বোধগম্য না। পিতা সুরা স্পর্শ করেন না, নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ বর্জন করেছেন কিন্তু রমণীর রূপ সৌন্দর্য দেখলে তার হৃদয় অধিকার করবার জন্যে মন আকুল হয়ে ওঠে। সেইজন্যে ঔরঙ্গজেব আলমগীরের হারেমে বহুরূপের ও রূপসীর হাট। দৌলতাবাদের মহলের পাশে নতুন একটি মহল বানিয়ে ঔরঙ্গজেব তার মধ্যে সারা পৃথিবীর রূপসীদের বেছে বেছে এনে রেখেছিলেন। এখন তারা আবার পিতার রাজ্য প্রাপ্তির পর দিল্লীর রংমহলের বেগম হারেমে এসে ঢুকেছে।

জেবের জননী দিলরসবানু এইজন্যে স্বামীর ওপর যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। যদিও মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাটের পুত্র শাহাজাদা হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে এক-পত্নীতে খুসী থাকা কাপুরুষতার লক্ষণ। তবু শাহনৌআজ খাঁর দুহিতা হয়ে দিলরসবানু চেয়েছিলেন, স্বামী তাঁর তাঁরই! অন্য কোন রমণী সেই অধিকারে অংশীদারী হবে, এ তিনি চান নি। কোন রমণীই তা চায় না, কিন্তু বিশেষ করে বাদশাহের ঘরে কোনসময়েই বা কে একপত্নীতে খুশী থেকেছে! আর তাছাড়া মোগলসাম্রাজের যুগে মোগলবংশে বাদশাহরা, বাদশাহের পুত্র শাহজাদারা, রাজকর্মচারীরা সকলেই বহু রমণী পরিবৃত হয়ে জীবন ও যৌবনকে উপভোগ করেছেন।

তবু দিলরসবানু চেয়েছিলেন স্বামী তাঁর সবার থেকে ভিন্ন হোক্। স্বামী তাঁর সবার থেকে ভিন্ন হয়েছে। সুরা স্পর্শ করেন না। বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করেন না। নাচ, গান, রঙ্গরসিকতা তাঁর ক্ষোভের বস্তু। কিন্তু রমণীর সুঠাম দেহের খাঁজে খাঁজে রহস্যময়গোপনতা দেখলে তাঁর ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনা সপ্তমার্গ স্পর্শ করে।

আর তারই জন্যে দিলরসের যত রাগ। ঠিক সময়ান্তরে গর্ভের সন্তানদের ভূমিষ্ঠ হতে তিনি সাহায্য করেছেন মাত্র। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। অর্থের বিনিময়ে পালিতা মার সাহার্যে তাদের জগতে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। জেবুন্নিসার পাঁচবোন, তিন ভাইয়ের জীবন এমনি কয়েকটি ধাত্রীমার ওপর ন্যস্ত ছিল। মোগল রাজপরিবারের মধ্যে প্রচলিত প্রথাই ছিল একজন নিষ্ঠাচারিণী ধাত্রী প্রতিপালনের ভার নেবে। কিন্তু তবু যে জননীর স্নেহ! সন্তানের মন কি শুধু প্রথার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে?

এমনিভাবে জেব জগতে মায়ের স্নেহ কখনও পায় নি। জ্ঞান হবার পর জানে, ধাত্রী মা 'মিয়াবাই'কে। আর যাকে মা বলে পরে জেনেছিলে তার আদবকায়দা, বিলাসিতা, মাতৃত্বহীন দৃষ্টি দেখে ঘৃণাই জেগেছিল।

মোগল হারেমের সবচেয়ে রমণীয় কক্ষে রত্নালঙ্কার ভূষিতা হয়ে স্বর্ণ-পালঙ্কে মখমলের কোমল শয্যায় শুয়ে বহুরমণী পরিবৃতা হয়ে মোগল শাহজাদার বেগম সুরা পান করছেন। সেরাজী সরাবের নেশায় ঢুলু ঢুলু দুটি রক্তিম চোখ মেলে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষার দ্যুতিতে জ্বলছে দয়িতের আগমন প্রত্যাশা। এমনি সময়ে যদি কেউ তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে—তোমার কন্যা।

তাহলে সেই বেগমের সুরাসিক্ত দুটি রক্তিম চাউনির মাঝে হঠাৎ কিসের বিস্ময় জেগে ওঠে?

রমণী পুরুষের শয্যাসঙ্গিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হবার পর আবেশঘোরে আপনমনে পুরুষের ভালবাসাটাকেই আপন করে গ্রহণ করে সঞ্চয়ের ঘরে অনুভূতিটুকু জমিয়ে রাখে তারপর তার ফলোৎপাদন কে মনে রাখে? যে বিশেষ করে সুখের মুহূর্তটুকুকে মনের অনুভূতির তীর্থে ধরে রাখে!

কিন্তু তবু মা। তবু জননীর গর্ভের কোষে কোষে রক্তবীজের বাসা দশ মাসের প্রতিটি দিনের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখে। সে দীনদরিদ্রা হোক বা রাজরাজেশ্বরী হোক। যন্ত্রণার অনুভূতি, গর্ভের ভ্রূণের বৃদ্ধির সাথে সাথে

একই পর্যায়ক্রমে একই অনুভূতির তীর্থ তৈরী করে। তাই জননী, গর্ভধারিণী সব ক্ষেত্রে সেই একই। সে মা, সে গর্ভধারিণী। তার গর্ভের ভেতরে একটি মনুষ্যশিশু দশমাস দশদিন ধরে জীবন পায়।

কিন্তু মাতৃত্বের সেই আকাঙ্ক্ষার চেয়ে যদি রমণীর জীবনে দয়িতের স্পর্শানুভূতি তীব্রতর হয়, তাহলে মনে হয় মাতৃত্বও সেখানে অন্য আকর্ষণে অনুরূপ গ্রহণ করে। মোগল হারেমের বেগমরা তার প্রমাণ। জেবুন্নিসা তাই জ্ঞান হবার পর ব্যথিতা। সে মা পায় নি। আম্মাজান বলত, 'মিয়াবাই' নামে এক নিষ্ঠাচারিণী রমণীকে। যে রমণী মুসলমান ধর্মানুযায়ী রোজা নমাজ পড়ত, কোরাণ পাঠ করত। সেই রমণীর উদাত্তস্বরে কোরাণ পাঠ প্রত্যহ সকালে হারেমের বহুমূল্যবান কক্ষ মুখর করত। জেবুন্নিসা কোরাণ পাঠ করতে শিখেছিল সেই রমণীর কাছ থেকে। সেই রমণীর মাতৃস্নেহে জেবের শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। ঠিক আম্মাজানের মত তার ব্যবহার। জেবের অপূর্ণ হৃদয়ের কিছু ফাঁক এই নিষ্ঠাবতী রমণী মিয়াবাই ভরাট করেছিল। কিন্তু তবু মন ভরে কই? তবু মনে থাকে হাহাকার। আপন জননীর স্নেহে যে জীবন প্রতিপালিত হল না, সে জীবন রক্ষা করে জগতে বেঁচে থাকার মূল্য কোথায়?

তবু মিয়াবাইয়ের মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর পালিত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ছোটবেলা থেকেই জেব ছিল অদ্ভুত বুদ্ধিমতী ও অসম্ভব মেধাসম্পন্না। মিয়াবাই তার একাগ্রমনে কোরাণ পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে একদিন শাহজাদা ঔরঙ্গজেবকে একান্তে কন্যার বুদ্ধির কথা বলেন।

ঔরঙ্গজেব তাঁর দুহিতার এরূপ কোরাণ শোনবার আগ্রহ ধাত্রীর কাছ থেকে জানতে পেরে জেব পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলে তাকে কোরাণ পাঠ শেখাবার জন্যে 'মরিয়ম' নামে একজন স্ত্রী হাফেজকে নিযুক্ত করেন।

আজ সে মরিয়মবিবি বিস্মৃতির কোলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার সুন্দর আকৃতি, কথাবলার সুন্দর মার্জিতরূপ, মিষ্টস্বভাব, কোরাণ পাঠের অপূর্বকণ্ঠ জেবুন্নিসার সেই পঞ্চমোত্তীর্ণ মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল। তার ভাল লেগেছিল মরিয়মবিবিকে। তাই কোরাণ পাঠ শেখার আগ্রহটা দারুণ ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। মাত্র দুবছর তিন মাসের মধ্যে জেব অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে সমস্ত কোরাণ মুখস্ত করে ফেলেছিল। ঔরঙ্গজেব কন্যার কৃতিত্বে

সন্তুষ্ট হয়ে এক মহাসমারোহ উৎসবে সবাইকে আমন্ত্রিত করে কন্যার মুখ দিয়ে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোরাণ মুখস্ত শোনান। জেবুন্নিসা নির্ভয়ে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে সমস্ত কোরাণ আবৃত্তি করে সভাসদকে শোনায়। সেইদিনই ঔরঙ্গজেব কন্যাকে পুরস্কারস্বরূপ 'হাফেজ' উপাধি দান করেন। এবং মনে মনে কন্যার বুদ্ধির তারিফ করে একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন ; ভবিষ্যতে কোন সময়ে কোন বুদ্ধির কৌশলের প্রয়োজন হলে এই কন্যার কাছ থেকেই সে সাহায্য তিনি পাবেন। সেইজন্যে এই চিন্তায় তিনি খুশী হয়ে সেই উপলক্ষ্যে অনেক গরীব দুঃখীকে দান, খয়রাত এবং সর্বসাধারণকে ভোজ ও পারিতোষিক দানে সম্মানিত করেন। এমন কি জেবের কৃতিত্বে জেবের শিক্ষয়িত্রী হাফেজ মরিয়মবিবিও প্রচুর পুরস্কার পেয়ে মোগল রাজকুমারের কাছ থেকে সম্মানিতা হন।

এরপর থেকেই পড়ে পূর্ণ দৃষ্টি কন্যার ওপর। ঔরঙ্গজেব যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন কন্যা জেবুন্নিসার সম্বন্ধে। জেবুন্নিসাও মা-হারার বেদনা নিয়ে পালিতা মায়ের স্নেহের মধ্যে থেকে জীবন অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ পিতৃস্নেহ তাকে নতুন আস্বাদ দান করল। পিতার অতিরিক্ত স্নেহ বাহুপাশে থেকে তার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি মোগল অন্তঃপুরে অদ্ভুত মাদকতার মধ্যে দিয়ে কাটল।

পিতা ঔরঙ্গজেব যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে কন্যাকে উচ্চশিক্ষিতা করতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ জেবুন্নিসা বড় হলে প্রতি পদে পদে পেয়েছে। ধীমতি প্রতিভাশালিনী জেবুন্নিসার অসাধারণ শক্তি ঔরঙ্গজেবকে অভিভূত করেছিল, তাই ঔরঙ্গজেব কন্যার জন্য ভাল ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ফকির ঔরঙ্গজেব ইসলামধর্মকে নিজস্ব সম্পত্তি জেনেই স্বার্থান্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। এবং এরই জন্যে নিজের কাজে কন্যাকে নিয়োজিত করবার জন্যে তাঁর এই আপ্রাণ চেষ্টা। আর তারই জন্যে এলেন ইরাননিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ্ তকী মজলিসীর বংশসম্ভূত মুল্লা আশ্রফ মাজন্দ্রানী। কিন্তু পিতা ঔরঙ্গজেব বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, কন্যাকে উচ্চশিক্ষিতা করে কন্যার জ্ঞানের পরিধি সীমাহীন করে তুলছেন, তাতে কন্যার সামনে কোন কৌশল অবলম্বন করলে সে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

তাই আজকের এই রাজ্যপ্রাপ্তিতে ফকির ঔরঙ্গজেবের আসল মনইচ্ছা যে ধরা পড়ে গেল এই ভেবেই জেবুন্নিসা শোকার্তা হয়ে উঠেছে। জেবুন্নিসা

বুঝতে পারছে, পিতা লোভের তাড়নায় নিজেকে বশ করতে না পেরে সিংহাসন লাভের জন্যে ইসলামের ধর্মমত বিস্মৃত হয়েছেন।

লোভের মিঠেল মায়ায় আবদ্ধ হয়ে মোগল রাজবংশের বংশধররা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হতে পারে ; শাহনসাহ সম্রাট আকবর তাঁদের জন্য কোন আইন করে গেলেন না, যত আইন বাধ্যবাধকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেন মোগল অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে—শাহজাদীদের জন্য। সম্রাট আকবর বিধান রেখে গেলেন, 'তৈমুরের বংশসম্ভূত চাঘতাই বংশের রাজকুমারীদের শাদী হবে না।' তারা রাজ-অন্তঃপুরে যৌবনের বর্ণাঢ্যকে রত্নালঙ্কারের জৌলুষের ছটায় উজ্জ্বল করে—শুষ্ক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ঘুম পাড়িয়ে, বসরাই গোলাপের সৌন্দর্যকে রাজঅন্তঃপুরের মধ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে। সম্রাট আকবর এই বিধানের ভেতর দিয়ে মোগলবংশে অন্যপুরুষের আবির্ভাবকে থামিয়ে মোগলবংশকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর বেঁচে থাকতেই দেখেছিলেন, তাঁর একমাত্র পুত্র শাহজাদা সেলিম সিংহাসনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। শাহজাদা সেলিমের পুত্র খসরু জীবন হারাল ঐ সিংহাসনেরই জন্য।

মোগল রাজবংশের ঐ বহুমূল্যবান সিংহাসনের মোহ লাখো লাখো খাব্‌সুরত ইরানী মেয়ের অপরূপ সৌন্দর্যকেও হার মানায়। শুধু সৌন্দর্য নয়, সিংহাসনের চতুর্দিকে ঘিরে আছে দৌলতের জৌলুষ। সিংহাসনকে লোভনীয় করবার জন্যে সম্রাট আকবরও সিংহাসনকে কোটী কোটী মণিমুক্তা, জহরত, হীরা, চুনিপান্না ও সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে তার ওপর আরও রত্ন চড়িয়ে তাকে আরও মূল্যবান করেছিলেন। এরপর শাহজাহান সিংহাসনে বসে নতুন রূপ দিয়ে তার নাম দিলেন 'ময়ূর সিংহাসন'।

পিতার কাছ থেকে শুনেছে জেবুন্নিসা। জাহাঙ্গীর শা নাম নিয়ে যখন সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম সিংহাসনে বসলেন, তখন তিনি সিংহাসনকে আরও অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় ব্যয়ে সজ্জিত করেছিলেন। অবশ্য ঔরঙ্গজেব বলবার সময় বলেছিলেন,—'এসব গল্পও অবশ্য তিনি তাঁর পিতৃদেব সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে শুনেছেন।' সম্রাট তখন যুবরাজ খুরম নামে অভিহিত। তিনি পিতার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন : জাহাঙ্গীর বাদশাহ নওরোজ উৎসব উপলক্ষ্যে সম্রাট আকবরের আড়ম্বরপূর্ণ সিংহাসনকে

আরও আড়ম্বর দান করলেন। একশত পঞ্চাশ কোটী টাকার মণিমুক্তা, জহরত এবং কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিয়ে সিংহাসন মুড়লেন। স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে সিংহাসনটি এরূপভাবে নির্মিত হল যে, অনায়াসে তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে আবার সংযুক্ত করা যেত। সমুদয় সিংহাসন পঞ্চাশমণ সুগন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল।

শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের কথাও গল্প করতেন। সিংহাসনে বসে যখন জাহাঙ্গীর বাদশাহর মস্তকে রাজমুকুট শোভা পেল, তখন আমীর ও ওমরাহদের সামনে তাঁর সে এক দারুণ গর্ব। জাহাঙ্গীর—পিতা সম্রাট আকবর বেঁচে থাকতেই সিংহাসন ও ঐ মুকুটের জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কারণ তাঁর পুত্র খসরু সিংহাসনের জন্য পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সেই ভয়ে পাছে জাহাঙ্গীর সিংহাসন না পান সেইজন্যে তিনি সম্রাট আকবর বেঁচে থাকতেই সিংহাসনের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শাহনশাহ আকবর নাতি শাহজাদা খসরুকে অতিরিক্ত স্নেহ করলেও নিজের একমাত্র পুত্রকেই সিংহাসন দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই চিরবাঞ্ছিত সিংহাসন পাবার পর মুকুট মস্তকে রেখে জাহাঙ্গীর বাদশাহ একঘণ্টাকাল সিংহাসনে বসেছিলেন। মুকুট মস্তকে ধারণ করে সিংহাসনে আরামে উপবেশন করে উপলব্ধি করেছিলেন রাজ্যপ্রাপ্তির সুখ। সুরা পানের পর ইন্দ্রিয় সুখের আতিশয্যে চোখের ওপর যে নেশার মদির ছোঁয়াচ লাগে, সেইরূপ সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীর বাদশাহ পৃথিবীজয়ী রাজা উপাধি নিয়ে আরামে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ মস্তকে যে মুকুট ধারণ করেছিলেন, সে মুকুট সম্রাট আকবর পারস্যের রাজাদের মুকুটের মত করে তৈরী করিয়েছিলেন। মুকুটের দ্বাদশটি কোণ ছিল, প্রত্যেক কোণে পনের লক্ষ টাকার এক একটি হীরকখণ্ড, মাঝখানে পনের লক্ষ টাকার একটি মুক্তো এবং অন্যান্য অংশে দুশত চুনী। প্রত্যেক চুনীর দাম ছিল ছ'হাজার টাকা।

রাজ্যাভিষেকের শুভ সমাচার চারদিকে ঘোষণা হবার পর চল্লিশ দিন রাজকীয় বাদ্যকরগণ নানা বাদ্যধ্বনিতে রাজধানী মুখর করে রেখেছিল। সিংহাসনের চারদিকে বহু মূল্যবান স্বর্ণখচিত কার্পেট বিছানো হয়েছিল। নানাদিকে সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াবার জন্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহু পাত্র বিতরণ করা হয়েছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বাতিদানে প্রায় তিনহাজার বাতি

সারারাত্রি জ্বলেছিল। বহুসংখ্যক সুশ্রী, তরুণ যুবক স্বর্ণখচিত মূল্যবান রেশমী বস্ত্র ও হীরা, চুনী, পান্না, মরকত মণির নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চ নীচ পদানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সবিশেষ বিনয়সহকারে আদেশের প্রতীক্ষা করেছিল। সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেণীর আমীরগণ জহরত ও স্বর্ণে আপাদমস্তক ভূষিত করে উজ্জ্বলসাজে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে কুর্ণিশ জানিয়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যপ্রাপ্তিতে চল্লিশ দিন ও রাত্রি পৃথিবীর অতুলনীয়, অবর্ণনীয় মদগর্বিত রাজকীয় ঐশ্বর্যের যে আড়ম্বর সৃষ্টি হয়েছিল, ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে আছে।

জাহাঙ্গীর বাদশাহর সেদিনের সে সৌভাগ্যে মোগল রাজবংশের অন্যান্য বংশধররা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই তিথিতে ভাবিকালের রাজবংশধররা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যদি কখনও সুযোগ হয়, তাহলে এই জগতের বহুমূল্যবান সেরা তখ্‌ত অধিকার করবার চেষ্টা করতে হবে।

তারপর এলেন সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সম্রাট শাহজাহান। তাঁকেও সম্রাট জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহানের নাগপাশ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার জন্যে শক্তির পরীক্ষা দিতে হল। শাহজাহানও সিংহাসনের জন্য অনেক অন্যায় করলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরু ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহরিয়াকে হত্যা করে নূরজাহানকে অধিকারচ্যুতা ও দেওয়ানা করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

জেবুন্নিসা আজ ভাবে, দাদু সম্রাট শাহজাহানওঅনেক অন্যায় করেছিলেন। তাঁরও মনের মধ্যে লোভের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ঐশ্বর্যের জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে সিংহাসনের আশায় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে ধর্মের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

সিংহাসন প্রাপ্তির পরই সেইজন্যে তিনি রাজকোষের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে আবার তৈরী করলেন সিংহাসনকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ ও মূল্যবান। তৈরী হল জগতের শ্রেষ্ঠ ময়ূরসিংহাসন। শিল্পী বেবাদল্‌ খাঁ সাতবৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরী করলেন জগতের সেরা আশ্চর্য রত্ন-সিংহাসন। এই রত্নসিংহাসনটি খাঁটি সোনায় নির্মিত হয়েছিল। এবং পারিপাট্য সাধনের জন্যে ষোললক্ষটাকা মূল্যের রত্ন লেগেছিল। উপরের ছাদটি খাঁটী পান্না নির্মিত বারটি স্তম্ভের ওপর অবস্থিত। ঐ ছাদের ওপরই বহুমূল্য রত্নখচিত

দুটি ময়ূরের মূর্ত্তি। ময়ূরদ্বয়ের মধ্যে হীরা-চুনী-পান্না-মুক্তা দিয়ে অলঙ্কৃত একটি বৃক্ষ ছিল।

আজকের সেই ময়ূর সিংহাসনের লোভেই জেবুন্নিসার পিতা ঔরঙ্গজেব আলমগীর পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদোহী হয়ে উঠেছেন।

জেবুন্নিসা ভাবতে চেষ্টা করল, পিতাকে কি কোন অবস্থায়ই এই সিংহাসনের মোহ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ইসলামের মহম্মদের মত, ফকীরী করা যায় না? কিন্তু জীবনের আজ বাইশবছরের জ্ঞানের দিন থেকেই পিতাকে সে দেখে আসছে, যা তিনি মনের মধ্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তা তাঁর একবিন্দু শক্তি থাকা পর্যন্ত সমাধানের চেষ্টা করেন; সুতরাং কান্না ছাড়া, শোক ছাড়া জেবুন্নিসার আর করবার কিছু নেই।

জেবুন্নিসা ঝরোখার ভেতর দিয়ে প্রাসাদ উদ্যানের দিকে নিথর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। শালিমার বাগে অজস্র ফুলের শোভা লাখো লাখো আওরতের সৌন্দর্যের শোভা নিয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। শালিমার বাগের পুষ্প উদ্যানের ভেতরেই রয়েছে সুদৃশ্য পাথরের উষ্ণজলের প্রস্রবণ। প্রস্রবণের অবিরল ধারা থেকে নির্গত হচ্ছে সুগন্ধি নির্যাসের প্রাণমাতানো গন্ধ।

ঐ শালিমার বাগের ভেতরেই রয়েছে বিশ্রামাগার। সুন্দর পুষ্পের নন্দন-অরণ্যে সুগন্ধ নির্যাসের সৌরভে প্রাণ-মন সিঞ্চিত হলে-রক্তকরবীর রক্তস্তবক দেখে রক্ত-আলোর শিখায় রক্তে আগুন জ্বললে বিশ্রামের দরকার। বিশ্রামের স্তিমিত মনে অনুভবের উৎসবকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে পুষ্প-উদ্যানের এই রাজসিক আয়োজন। শুধু দিল্লীর প্রাসাদে না, আছে আগ্রার প্রাসাদেও এমনি অনেক পুষ্প-উদ্যানের সমারোহ। আছে আগ্রা-প্রাসাদের ভেতরও অঙ্গুরীবাগের মত অনেক উদ্যানের পুষ্পহার। এই উদ্যানের বিস্তৃত পুষ্প সৌন্দর্যে মোগল রাজঅন্তঃপুরের যত শোভা। সেই শোভার সঙ্গে শোভার মিল করে সৌন্দর্যময়ী বেগমদের যত্রতত্র বিচরণ।

আজ সে শালিমার বাগে কেউ নেই। শালিমার বাগের অজস্র ফুলের চঞ্চলপ্রাণে কিসের যেন স্তব্ধতার আয়োজন। সূর্যের আলোয় প্রজাপতি রঙের রংবাহারের বিচিত্র ঔজ্জ্বল্যকে যেন ম্রিয়মান করে দিয়েছে। মোগল রাজপ্রাসাদের মাথার উপর সেই ভাগ্যসূর্যের বিস্তৃত তীক্ষ্ণ সূর্যালোকের রশ্মি যেন ম্লান হয়ে এসেছে। শালিমার বাগের সেই পুষ্পের প্রাণে আনন্দের যেন সে প্রাণমাতান আন্দোলন নেই।

জেবুন্নিসার অনুভবের তীর্থে সবচেয়ে বেশী করে জেগে উঠল প্রকৃতির এই বিনম্রভাব। তার পিতা ঔরঙ্গজেব আলমগীর জোর করে সিংহাসনে বসতে মানুষের চেয়ে প্রকৃতিই যেন তাঁর ওপর বেশী করে বিমুখ হয়েছে। মানুষ অবশ্য বিমুখ হলে ঔরঙ্গজেবের রুদ্ধরোষ তার জীবনের অবসান ঘটাবে কিন্তু প্রকৃতির এই আক্রোশে ইসলামধর্মের ফকীর ঔরঙ্গজেব প্রকৃতির ওপর কি প্রতিশোধের ব্যবস্থা আরোপিত করবেন ?

জেবুন্নিসা নিজেকে গোপন অলিন্দের একান্ত থেকে মুক্তকরে বারান্দা থেকে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে নিয়ে এল একেবারে শালিমার বাগের উদ্যানের ভেতর। সেখান থেকে দেখা যায় বাইরে দেওয়ান-ই-আমের দরবার কক্ষের পর সিংহাসনের সেই উঁচু চন্দ্রাতপ। বিরাট চন্দ্রাতপের নীচে দ্বাদশ স্তম্ভ থেকে স্ফুরিত হচ্ছে সহস্র প্রস্তরের উজ্জ্বল আভা। ওখানে কি তার পিতা ঔরঙ্গজেব আলমগীর এখনও সিংহাসনে বসে আছেন ? হয়ত নেই, হয়ত আছে কিম্বা হয়ত হঠাৎ চৈতন্যোদয় হতে তাঁর জ্যেষ্ঠকন্যা জেবুন্নিসাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

পিতা ঔরঙ্গজেব স্বপ্নকল্পনার ঈপ্সিত ইচ্ছাকে হঠাৎ শক্তি ও কৌশলের দৌলতে করায়ত্ত করতে পেরে তিনি আজ দারুণ খুসী। তাই এই খুসীর মৌতাতে পরামর্শদাত্রী পেয়ারী কন্যা জেবুন্নিসাকে খুঁজে কাছে নিয়ে তাঁর খুসীর ভাগ দেবেন। কিন্তু জেবুন্নিসা খুসী হয়েছে কিনা একবারও তিনি কি জানতে চেয়েছিলেন ?

পিতা ঔরঙ্গজেবের রণকৌশল ও যুদ্ধজয়ের শক্তি অদম্য। পিতা যখন যুদ্ধের গোপনতম কৌশল অবলম্বন করেন, তিনি বিশ্বাস করে সে কথা কাউকে বলেন না। পিতা তাঁর জীবনে কখনও কাউকে বিশ্বাস করেন না, এমনকি জেবুন্নিসা তাঁর কাছে অতি আপনার হয়েও উপযুক্ত সময়ে সে পিতা কর্তৃক অবহেলিত হয়।

সেইজন্যে জেবুন্নিসা আগামী ষড়যন্ত্রের বিশেষ কিছু পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারেনি। একদিন পিতা বিজাপুর জয়ের জন্য বিজাপুরী সেনাদের পরাজিত করে তাদের নাস্তানাবুদ করছেন ; এই সময় বিজাপুরী শাসনপরিচালকের কাছে সম্রাটের পাঞ্জা ছাপ অঙ্কিত একটি সন্ধি পত্র গেল। যে রাজ্য ঔরঙ্গজেব নিজের শক্তিপরীক্ষায় জয় করে নিয়ে অধিকার স্থাপনের কল্পনা করছেন, সেই রাজ্যের সঙ্গে সম্রাটের সন্ধির প্রস্তাবে ঔরঙ্গজেব দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এবং তিনি জানতে পারলেন এ কাজ সম্রাটের না, সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার এই

ষড়যন্ত্র। সম্রাট অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর দিন গণনা করছেন। হয়ত তাঁর মৃত্যুই ঘটেছে কিন্তু সম্রাটের সঠিক অবস্থা জানার কোন উপায় নেই। দারা সম্রাটের সমস্ত সংবাদ গোপন রেখে বাইরে নানারকম গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি করছে।

ঔরঙ্গজেব আর স্থির থাকতে পারলেন না। দারা যে এই সুযোগে সিংহাসন অধিকার করে পিতাকে কারারুদ্ধ অথবা বিষপানে শেষ করেছে এইরূপ ধারণা করে নিয়ে তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্য যাত্রা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সুজা ও মুরাদকে আপনদলে টানতে পারলে শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু সুজা সুদূর বঙ্গদেশে থাকার জন্য পত্রবিনিময়ের সুযোগ খুব বেশী হল না, সেইজন্যে তিনজনের ষড়যন্ত্র সন্ধি আদৌ গ্রন্থিবদ্ধ হল না। শুধু স্থূলবুদ্ধি অথচ সাহসী যোদ্ধা মুরাদ আস্তে আস্তে ঔরঙ্গজেবের কবলিত হলেন। ঔরঙ্গজেব দেখালেন বুদ্ধির খেলা। সাপুড়ে যেমন বাঁশীর সুরে সাপ নিয়ে খেলা করে, ঔরঙ্গজেবও তেমনি ধর্মের বাঁশী বাজিয়ে সিংহাসনের খেলা আরম্ভ করলেন।

জেবুন্নিসা তখনই দেখেছে, পিতা স্বয়ং ফকীরের আলখাল্লা পরিধান করলেন। মানুষকে বোঝালেন, তিনি মক্কাযাত্রী ফকির, এই দরবেশের আলখাল্লা মক্কাযাত্রার পূর্বাভাস। সিংহাসনের ওপর তাঁর কোন লোভ নেই। তবে তিনি যথার্থ মুসলমানরূপে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে কাফের বিধর্মী দারাকে প্রতিষ্ঠিত দেখলে মক্কা গিয়ে শান্তি পাবেন না।

মুরাদকে লেখা চিঠিটি স্বর্ণময় পালকের একপাশে রেখে ঔরঙ্গজেব রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন ; কি একটা প্রয়োজনে জেব সেই ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল, কৌতূহল নিবৃত্তি করতে না পেরে পাঠ করেছিল পিতার লিখিত চিঠিটি।

'ভাই মুরাদ, কোরাণ স্পর্শ করে তোমার কাছে শপথ করছি তোমাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে আমি মক্কা যাত্রা করব। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও যে আমার স্ত্রী-পুত্রকে তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তুমি যথার্থ মুসলমান, তুমি বীর ; সিংহাসন তোমারই প্রাপ্য। দারা বিধর্মী। আমার ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তোমার নিকট একলক্ষ মুদ্রা পাঠাচ্ছি।'

সরলবিশ্বাসী মুরাদ বিশ্বাস করলেন ঔরঙ্গজেবের শপথ।

আর আজ সিংহাসন প্রাপ্তির পর সেই মুরাদ সলীমগড় কারাগারে।

মুরাদকে বন্দী করলেন ঔরঙ্গজেব অদ্ভুত কূটনৈতিক কৌশলে। সে কথাও গল্পচ্ছলে জেবুন্নিসা পিতার বিশ্বস্ত সেনার কাছ থেকে শুনেছে।

ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করবার ঠিক পূর্বে। সম্মুখে দারা, পশ্চাতে মুরাদ। উভয়সঙ্কটের মধ্যস্থলে পড়ে মন্ত্রণাকুশল ঔরঙ্গজেব স্থির করলেন, মুরাদ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে হবে। দুদিনের পথে ছাউনী করে ঔরঙ্গজেব মুরাদের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সহোদর এলে তাঁকে দশলক্ষ মুদ্রা ও কটি উৎকৃষ্ট অশ্ব উপহার দিয়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন।

বিশ্বাসঘাতক নূর-উদ্দীন ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে মুরাদকে ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। মুরাদ আর কোন চিন্তা না করে একদিন মৃগয়া থেকে ফিরে সহোদরের শিবিরে উপনীত হলেন। প্রীতি-আলাপনে আহার শেষ হল। ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান, সুরা স্পর্শ করেন না। কিন্তু এদিন ভাইকে অক্ষুন্ন সুখে সুখী দেখবার জন্য তাকে পুনঃ পুনঃ পানে উত্তেজিত করতে লাগলেন। একে সারাদিনের মৃগয়াশ্রান্তি, তার ওপর অপরিমিত পানাহার; মুরাদের তন্দ্রাকর্ষণ হল। সহোদরকে কিছুক্ষণ নিদ্রাসেবা করতে অনুরোধ করে ঔরঙ্গজেব উঠে গেলেন।

এরপরই কূটনৈতিক কৌশলী ঔরঙ্গজেব অসদুপায় অবলম্বন করলেন। মুরাদ ক্লান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করলে তাঁর ভৃত্য বশারৎ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে পদসেবায় বসল। মুরাদের দেহের ক্লান্তি আরামে আরও যেন ঘন হয়ে গেল। মুরাদ অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে ঈষৎ নিদ্রিত হয়ে পড়েছে, এইসময় এক অপরূপ রূপবতী রমনী এসে তাঁর পদসেবা করতে লাগল।

রমণীর কোমল হাতের স্পর্শে নিদ্রিত মুরাদের দেহের কোষে কোষে যেন আরো আরামের সুখানুভব ঘন হয়ে চেপে বসল। মুরাদ আর জাগ্রতাবস্থায় থাকতে পারল না। স্থান, কাল, পাত্র ভুলে ষড়যন্ত্রের কথা বিস্মৃত হয়ে সুরার নেশায় নিঃশেষে তলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই অপরিচিতা রমণী মুরাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অন্তর্হিতা হল। এরপরই এল দ্বাদশজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে শেখ মীর। সহসা মুরাদের নিদ্রাভঙ্গ হল। অস্ত্রের জন্য হাত বাড়িয়ে হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারলেন। ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁর মন জর্জড়িত হয়ে উঠল। কোরাণ স্পর্শ করে ঔরঙ্গজেব মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিলেন বলে মুরাদ—সহোদর, সুহৃদ ও অতিথির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে ভৎসর্না করতে লাগলেন।

ঔরঙ্গজেব কাছেই পর্দার অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, বললেন—তোমার মস্তক সম্প্রতি নিরতিশয় স্পর্দা ও অহমিকায় পরিপূর্ণ হয়েছে। জনকোলাহল-বিরল শান্তির আগারে কিছুদিন চিত্ত-স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন। রাজরাজেশ্বরের চক্ষের আলোক তুমি। খোদার কসম্, তোমার বহুমূল্য জীবনের বিরুদ্ধে আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আল্লাকে ধন্তবাদ! তোমার সঙ্গে যে সত্যবদ্ধ হয়েছি, তা এখনও অনুমাত্র শিথিল হয় নি। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আমার ভ্রাতার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই নির্জনবাস তোমার পক্ষে হিতকর। তুমি এজন্য অনুমাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত হয়ো না।

শিষ্টাচারে সেলাম করে শেখমীর মুরাদের সামনে একজোড়া রৌপ্য-শৃঙ্খল রেখে দাঁড়ালেন। হস্তিপৃষ্ঠে ঘনাচ্ছাদিত শিবিকায় বন্দী রাজপুত্র সলীমগড়ে প্রেরিত হল।

আজ সেই মুরাদ সলীমগড় কারাগারে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে আফশোষ করছেন।

জেবুন্নিসা ভাবতে চেষ্টা করল, পিতা তার কত কঠিন, কত নির্মম—তারই প্রমাণ এই এক একটি দৃষ্টান্ত। পিতার একান্ত স্নেহের ভগ্নী রোশনারা সম্রাট অন্তঃপুরে থেকে পিতার এই ষড়যন্ত্রের পূর্ণ সাহায্যকারিনী। রোশনারাই সম্রাট প্রাসাদের সমস্ত গোপন অবস্থা পত্রান্তরে ভ্রাতার কাছে প্রেরণ করতেন।

আজ ভ্রাতার রাজ্যপ্রাপ্তিতে সেই রোশনারা দিল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে উল্লাসে, আনন্দে সাফল্যের নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। জেবুন্নিসা জানে না, রোশনারার কি স্বার্থ তার ভ্রাতার রাজ্যপ্রাপ্তিতে। সে কি তবে ভ্রাতার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহনের মত রাজ্যশাসন করতে চায়? মনে মনে হাসল জেবুন্নিসা। সে সাধ যদি থাকে তবে রোশনারাকে পৃথিবীর অন্ধকারলোকে ঔরঙ্গজেবের অতিরিক্ত মহব্বতের তাড়নায় হারিয়ে যেতে হবে। পিতাকে খুব ভালভাবেই চিনেছে জেবুন্নিসা।

প্রাসাদের তোরণদ্বার থেকে ঔরঙ্গজেব আলমগীরের রাজ্যপ্রাপ্তিতে কামানের মুহুর্মুহুঃ গর্জন মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। সানাইয়ের মধুর সুর প্রাসাদের গম্ভীর পাথরের বুকে মৃদুস্পর্শ দিয়ে চেতনার সৃষ্টি করছে। জেবুন্নিসা শালিমার বাগের সেই বিশ্রামাগারে বসে সমস্ত প্রাসাদ অন্তঃপুরের

দিকে তাকিয়ে থাকল। চোখ থেকে তার অশ্রুর ধারা অদৃশ্য হয়েছে। শুষ্ক চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে আজকের আকস্মিক উৎসবের দিকে। এই শালিমার বাগে এই ঝরণার প্রস্রবণের ধারে সম্রাটের প্রিয়কন্যা জাহানারা কত গল্প করত। জাহানারা ও চাচাদারা শিকোর কাছ থেকে কত দেশবিদেশের কাহিনী শুনেছে। তার বহিন্ জিনৎ, মিহর, জুবায়েৎ ও ভাই মহম্মদ, আজম, আকবর, দারা চাচার কন্যা জাহনজেব, স্থলেমান ভাই-জানের কন্যা সেলিমা, সবাই এই প্রস্রবণের ধারে জাহানারা ও দারাচাচার কাছে দিনের পর দিন কত শিক্ষণীয় গল্প শুনেছে। জাহানারা ও দারা চাচা কত বই পড়তেন, সেই বইয়ের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তাঁরা বলতেন—কী যে ভাল লাগত? কোথায় গেল সেইসব দিন! কোথায় হারাল সেই সখ্যতা!

আজ জাহানারা বন্দী সম্রাটের কাছে ভ্রাতৃবিরোধের আঘাত নিয়ে নিঃশেষে আত্মমগ্ন হয়ে সম্রাটের কাছে বাস করছে। তার দুঃখ কেউ বোঝে না। তার মমতায় গড়া প্রাণের খবর কে রাখে? জেবুন্নিসার ইচ্ছে করল, সে এখুনি পিতার বিনানুমতিতে আগ্রার প্রাসাদে ছুটে যায়, ছুটে গিয়ে জাহানারাকে বলে: আমি এসেছি তোমার কাছে, তোমার বর্তমানের দুঃখ আমার হৃদয়ের সুরে গাঁথা। আমি তোমার দুঃখের-ভাগিনী। আমাকে ভুল বুঝ না।

দাদু সম্রাট শাহজাহানের কথা ভাবে জেবুন্নিসা। দাদুর কথা ভেবে হৃদয় মথিত হয় তার। দাদু সিংহাসনে বসবার চার বছর পরে প্রিয়মহিষী মমতাজবেগমকে হারালেন। দুঃখের দিনে যে ছিল সাথী, সুখের সময় সে থাকল না। দাদু শাহজাহানের সেদিনের মানসিক অবস্থা চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য তার হয় নি। তবে মহলের অনেকের কাছ থেকেই শুনেছে জেবুন্নিসা। দাদুর প্রিয়মহিষী মমতাজ মারা যাবার পর তিনি বহুদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রাজকার্যের সমস্ত গুরুভার ভুলে বিলাসিতা বর্জন করে সম্পূর্ণ একাকী নির্জনে তাঁর কক্ষে দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

সেদিনের সাক্ষাৎ পরিচয় জেবুন্নিসার নেই কিন্তু আজকের পরিণতবয়সের উপলব্ধি দিয়ে দাদু শাহজাহানের সেদিনের অবস্থা চিন্তা করে জেবুন্নিসা। চোখের সামনে যেন দেখতে পায় দাদু শাহজাহান প্রিয়তমার বিরহে শোকের প্রাবল্যে হঠাৎ যেন কেমন ভূতলশায়ী হয়ে গেলেন। আপেল রঙের সুন্দর গাত্রবর্ণ নিয়ে রাজসিক পোষাক পরে, সুগন্ধ, নির্যাসে দেহ বিমোহিত করে যে

সম্রাট নিজেকে আমোদ-প্রমোদ উৎসব-আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতেন, হঠাৎ যেন তাঁর সমস্ত পরিবর্তন হয়ে গেল। পত্নীশোকসন্তপ্ত ভূপতি চিরদিনের জন্য রঙীন পরিচ্ছদ্, সুগন্ধ ও মণিমুক্তা ব্যবহার ত্যাগ করলেন। তাঁর আমোদ-প্রমোদ উৎসব-আনন্দ সমস্তই পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর সঙ্গে চির-সমাধি লাভ করল। বাৎসরিক অভিষেক-বাসরে ও জন্মদিন-উৎসবে নৃত্য-গীতাদির চিরাগত অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। দাদু শাহজাহানের শ্মশ্রুও যেন পত্নীবিয়োগের অনতিবিলম্বে শুভ্রবেশ ধারণ করল। অকালবৃদ্ধ সম্রাট যখনই পত্নীর সমাধি দেখতে যেতেন, তাঁর চক্ষু দিয়ে অজস্র ধারা প্রবাহিত হত। যে অন্তঃপুর মোগল-বাদশাহগণের ভোগবিলাস নিকেতন, সেখানে এলে সম্রাটের বিধুর হৃদয় অধিকতর অভিভূত হত। হায়, ভূতলে চিরানন্দময়ী ভূস্বর্গ বিরাজ করছে, কিন্তু তার একমাত্র প্রিয়তমা আজ নেই।' সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে উৎসব-ব্যসনে চিরসঙ্গিনী, চিরমমতাময়ী মমতাজ! সম্রাটের কাতর হৃদয় অন্তঃপুরে এলেই সেই চিরানন্দদায়িনীর সম্ভাষণধ্বনি শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠত, এবং সেই বাঞ্ছিত মুখের অদর্শনে তাঁর আশাহত হৃদয়ে যে হাহাকার উঠত, অজস্র অশ্রুপাতেও তা শান্ত হত না। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতেন 'হায়'! 'কারও মুখমণ্ডল আমাকে এখন আর আনন্দ দান করে না।'

সম্রাটের মর্মবিগলিত অশ্রু জমে কালে তুষার-ধবল মর্মর-মন্দিরে পরিণত হল। চিরবিরহিত সম্রাট সেই পবিত্র শোকভবনে প্রাণ-প্রতিমার চির-প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতের রাজভাণ্ডার থেকে বেছে বেছে রত্নের কারুকার্যে 'তাজমহল' খচিত হল। কিন্তু যে দুর্লভ রত্ন এই মর্মর-মন্দিরতলে সম্রাট সমাহিত করলেন, কোন পার্থিব রত্ন তার সমতুল্য?

তবু আজ যমুনার উপকূলে উন্মুক্তপ্রান্তরে শ্বেতপ্রস্তর শোভিত তাজমহল অবলোকন করলে প্রিয়তমা মমতাজকে হারানোর বেদনার স্পর্শ হৃদয়ে হাহাকার তোলে। মনে হয় দাদু শাহজাহানের পত্নীপ্রেম বুঝি দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প দিয়ে গাঁথা এক মহীয়ান শূণ্যতাকে পরিপূর্ণ করেছে।

মমতাজের এই মহব্বতের সার্থকতা—জেবুন্নিসাকে ঈর্ষান্বিত করে। সমস্ত নারীজাতির ঈর্ষার সমাধিক্ষেত্র ঐ আগ্রার তাজমহল। শুধু একজন পুরুষ না, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটকে বশীভূত করে, তাঁকে পাগল করে, তাঁকে মহব্বতের পূজারী করে রাখা...।

জেবুন্নিসা মমতাজকে দেখে নি। সে জন্মাবার কয়েকবছর আগেই মমতাজ এ জগত ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু পরিণত বয়সে যখনই সে আগ্রায় গেছে, তাজমহল দর্শন করেছে, মমতাজের সমাধি দেখে ঠোঁট উলটে বলেছে—'তুমি কি দিয়ে ভারতের সম্রাট শাহজাহানকে বশ করেছিলে বিবি? যার জন্যে তাঁর কাছে মোগল রাজৈশ্বর্য তুচ্ছ হয়ে তুমিই অমূল্য হয়ে রইলে! তোমার সেই গোপন মন্ত্রটি যদি আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে অন্ততঃ মোগলশাহজাদী ভালবেসে ও ভালবাসিয়ে তোমারই মত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। মরতে সবাই ভালবাসে, যদি মৃত্যুর পর কেউ তার স্মৃতি নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকে!'

সেই বিরহকাতর পত্নীশোকার্ত সম্রাট-প্রিয়দয়িতার অন্তিম অনুরোধ রক্ষার জন্যে তাঁর পুত্রকন্যাদের আপন হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছেন। অবশ্য সম্রাট-দুহিতা জাহানারার দান ও সেখানে অনেক সাহায্য করেছে। জাহানারা না থাকলে বোধহয় সম্রাটও নিজেকে শান্ত করতে পারতেন না এবং সিংহাসনে বসে রাজকার্য করাও বোধহয় তাঁর দ্বারা হত না। মাতৃহারা জাহানারা নিজের শোক ভুলে পিতার অসহনীয় বেদনাকে উপলব্ধি করে রাজঅন্তঃপুরের সমস্ত কর্তব্যভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই আজ সম্রাটের পুত্রকন্যারা শক্তি পেয়ে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে বসবার জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

যে সম্রাটের জীবনের দীর্ঘকাল পত্নী-হারার বেদনা নিয়ে কাটল, সেই সম্রাট হঠাৎ আজ নিজের পুত্রের দ্বারা বন্দী হয়ে নিজেরই কক্ষে অবস্থান করছেন। প্রহরায় নিযুক্ত জেবেরই ভাইজান সুলতান মহম্মদ।

হঠাৎ শালিমার বাগের প্রাচীরের ওপাশে একাধিক লোকের চীৎকার ও কোলাহলের শব্দ এপাশে ছুটে এল। জেবুন্নিসা সচকিত হয়ে নিজের চিন্তা থেকে বহির্ভূত হয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। শালিমার বাগের বিশ্রাম-মঞ্চ থেকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরের ধারের ছোট ফোকর দিয়ে দেখল। কিন্তু যা দেখল তা দেখে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। দারার ক'টি বিশ্বস্ত অনুচরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বেত্রাঘাত করতে করতে সিপাইরা নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে সম্ভবতঃ ঘাতকের খড়্গের তলায় বলি দেওয়ার জন্যে। সঙ্গে দুজন ভীমদর্শন ঘাতক, হাতে তাদের চকচকে খড়্গ। সূর্যের রশ্মি পড়ে সে খড়্গ থেকে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে।

দারার দুটি অনুচরকে খুব ছোটবেলা থেকে জেবুন্নিসা চিনত। একজন নুরমহম্মদ ও একজন শেখ আলী। লোক দুটি রাজানুরক্ত এবং খুব বিশ্বাসী ছিল। সম্রাট শাহজাহানও তাদের খুব বিশ্বাস করতেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সেই দুজনকে দেখেও জেবুন্নিসার চোখে জল এল। তারা এই মোগল প্রাসাদে চাকরী করে আজ বৃদ্ধ হতে চলেছে। ভ্রাতৃ-বিরোধের সময়ে ঔরঙ্গজেবের আক্রোশে পড়ে তারা বধ্যভূমিতে চলেছে প্রাণদান করতে। জেবুন্নিসা জানে না, তাদের অপরাধ কি? সম্ভবতঃ তাদের কোন অপরাধই নেই। আজ সিংহাসনের ওপর সম্রাটরূপে ঔরঙ্গজেব আসীন হয়ে পিতার ও ভ্রাতাদের যারাই প্রিয় ছিল তাদেরই উচ্ছেদে মন উৎসর্গ করেছেন। হয়ত এরা সেইজন্যেই বধ্যভূমিতে চলেছে ঔরঙ্গজেবের বিচারে প্রাণ উৎসর্গ করতে। এদের দেহ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাতকের কৃপাণের তলায় পড়ে খণ্ডবিখণ্ড হবে। বধ্যভূমি রক্ত মেখে লাল হয়ে আগামী মোগল সম্রাটের সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করবে। আর জেবুন্নিসা চোখের সামনে সমস্ত অন্যায়কে নিজের চক্ষে দেখে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। কিছু বলবে না, কোন প্রতিবাদ। প্রতিবাদ করলেই বিদ্রোহিনী বলে পিতার কাছ থেকে শাস্তি নিতে হবে। মরতে জেবুন্নিসার ভয় নেই। কিন্তু আগামী সম্রাটের কার্যপদ্ধতি, অত্যাচার, অন্যায়কে অবলোকন না করে মরবে না। পিতা ইসলাম ধর্মের গোঁড়া মুসলমান বলে নিজেকে জাহির করে লোভের কুহকে শেষপর্যন্ত কোথায় পৌঁছন, একবার না দেখে মরেও তার আত্মার মুক্তি হবে না।

চিন্তা হঠাৎ আবার একটি চীৎকারে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। এবার একটি মেয়েলী চীৎকার। জেবুন্নিসার বিস্ময় জাগল, মেয়েটির কণ্ঠ তার চেনা। কৌতুহলী হয়ে আবার সে চোখ রাখল প্রাচীরের ফোকরে। কিন্তু চোখ রেখেই চোখ সরিয়ে নিল। লজ্জায় তার রমণীদেহের মধ্যে কেমন যেন কাঁপন সৃষ্টি হল। বাঙলাদেশ থেকে শাহজাদা সুজা একটি সুন্দরী গ্রাম্য বালিকাকে ধরে নিয়ে এসে দিল্লীর হারেমে রেখেছিলেন। শাহজাদা সুজা ইন্দ্রিয়ের সুখানুভবে মেয়েটির ইজ্জত হরণ করেছেন। এখন সে পরিত্যক্তা। শাহজাদা সুজা অনেকদিনই তাকে বিতাড়িত করেছিলেন কিন্তু সম্রাট শাহজাহান পুত্রের এই ব্যবহারে বীতরাগ হয়ে মেয়েটিকে জনারণ্যে মিশিয়ে না দিয়ে দিল্লীর

হারেমেই রেখে দিয়েছেন। মেয়েটির সবচেয়ে গুণ, বাঙালীর মেয়ে হয়ে অদ্ভুত গাত্রবর্ণ। গোলাপী গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্যটা মোগল হারেমের হীরের দ্যুতির কাছে যেন অম্লান। শাহজাদা সুজা, রূপের পূজারী। বহু খাবসুরত রমনীকে দেশবিদেশ থেকে লুটে নিয়ে এসে নিজের অঙ্কশায়িনী করেছেন, সুতরাং রূপের মর্ম তিনি জানতেন। তাই বাঙ্গালী মেয়ে কুসুমকে গ্রাম্যজীবন থেকে ধরে একেবারে দিল্লীর রমনীয় রমণী হারেমে আনতে তাঁর এতটুকু বাধে নি। চোখ আছে শাহজাদা সুজার। চোখ কার নেই? মোগল রাজবংশের পুরুষদের রমণীদেহের অলিগলি অজানা আছে, এ-কথা বললে তাঁদের সবচেয়ে বেশী অপমানই করা হবে।

কুসুম হয়ত শাহজাদা সুজার পাপচক্ষে ধরা না পড়লে এতদিনে কোন পল্লীর পল্লীবধূ হয়ে সন্ধ্যাবেলায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করত। রাত্রে স্বামীর পাশে শুয়ে বেড়ার ফাঁকে আকাশের পূর্ণচন্দ্রিমাকে দেখে স্বামীর আরো কাছে ঘন হয়ে সরে এসে আদো আদো কণ্ঠে বলত,—ওগো দেখো, কেমন হাঁ করে আকাশ থেকে ঐ লোলুপ রাক্ষসটা আমাকে দেখছে! তুমি কি ওকে কিছু বলবে না?

কুসুমের সীমন্তে থাকত সৌভাগ্যের চিহ্ন। বুকে থাকত গর্ব। সে একটি গৃহের কর্ত্রী হয়ে, একটি পুরুষের হৃদয় অধিকার করে, জননীর পদমর্যাদায় ভূষিত হয়ে—সম্রাজ্ঞী হয়ে পল্লীর শ্যামলিমার মধ্যে নিজের জীবন ও যৌবনকে নিয়ে খুসী থাকত। কিন্তু আল্লা তার ভাগ্যে তা হতে দেন নি। শাহজাদা সুজা দস্যুর মত লুটে নিয়ে এলেন তাকে। একদিনের কয়েক মিনিটের সুখকে চরিতার্থ করতে একটি কুসুম রমণীর রঙীন স্বপ্নকে ছিঁড়ে তার রমণী ঐশ্বর্য কেড়ে নিলেন। এমনি রমণী ঐশ্বর্য কেড়ে নেওয়ার দৃষ্টান্ত মোগল হারেমে সংখ্যাতীত। দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, মালব, রাজপুতানা সমগ্র ভারতের সমস্ত কোণ থেকে মোগলরাজপুরুষরা তাঁদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্যে রমণী-দেহ ছিনিয়ে এনেছেন। শাহনসাহ সম্রাট আকবরও তাঁর বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হৃদয়কেও এদিক থেকে নিবৃত্তি করতে পারেন নি। তাঁরও হারেমে ছিল বহু সুন্দরা রমণীর হাট। তারা সব একদিন করে সম্রাটের স্পর্শ পেয়ে সারাজীবন শুষ্ক হৃদয় নিয়ে রাজভাণ্ডারের খোরপোষে জীবন অতিবাহিত করেছে। যাদের যৌবন সম্রাটের একদিনের স্পর্শে খুসী হয় নি, তারা নিয়েছে সৈনিকের আশ্রয়। সম্রাট জানতে পেরে তাদের বিচার করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু

যৌবনের সেই মাতন তাঁর বিচারে কখনও নিবৃত্তি লাভ করেনি। তাই বেগম হারেম ছিল ব্যভিচারিনীর লীলাক্ষেত্র।

সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরও বহু রমণীকে শাদী করেছিলেন। প্রিয়তমা নূরজাহানকে না পেয়ে তাঁর বেদনা ভোলবার জন্যে একাধিক রমণীকে গ্রহণ করেছিলেন। রাজা মানসিংহের ভগিনী, পিতামহ ভরমলের কন্যা মানবাই শুধু জাহাঙ্গীর মহিষী ছিলেন না। জাহাঙ্গীরের আরো আরো বহু মহিষী ছিল। অবশ্য এই মানবাই ভাগ্যাহত শাহজাদা খসরুর জননী।

কাসোবারের রাজকুমার সুলতান সারঙ্গের পুত্র সৈয়দ খাঁর কন্যার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিয়ে হয়। খসরুর জন্মের পর এর গর্ভে ঔফেৎবানি বেগম বলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই বালিকা মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিল। জেনিখা খোকার ভ্রাতুস্পুত্রী সাহেব জমলের গর্ভে কাবুলনগরে একটি পুত্র হয়। তার নাম পারভিজ। তাকে পরিণত বয়সে জাহাঙ্গীর উদয়পুরে রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। লাহোর পর্বতের পাদদেশস্থ এক শক্তিশালী রাজার কন্যার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিয়ে হয়। এর গর্ভে দৌলতনিসা বেগম বলে একটি কন্যা হয়েছিল। সে সাত মাস বেঁচেছিল। রায়পুর পরিবারের বিবি করমতির গর্ভে আর এক কন্যা হয়, নাম ছিল বাহারবানু বেগম, সে মাত্র দু-মাস বেঁচেছিল। হিন্দুস্তানের মধ্যে প্রধান শক্তিশালী রাজা উদয়সিংহের কন্যার গর্ভে বেগম সুলতান বলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল, সে এক বছর বেঁচে ছিল। এই জগৎ গোঁসাইনীর গর্ভেই শাহজাদা খুরম ওরফে ভারতের শ্রেষ্ঠসম্রাট শাহজাহান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লঘনৌর রাজার এক কন্যার গর্ভে আর কন্যা হয়, সে সাতদিন বেঁচে ছিল। কাশ্মীরের যুবরাজের কন্যাকেও জাহাঙ্গীর শাদী করেছিলেন। তারও গর্ভে একটি কন্যা হয়েছিল কিন্তু এক বৎসর পর সে মারা যায়। এ-ছাড়া ইব্রাহিম হোসেন মির্জার কন্যার গর্ভে যে কন্যাটি হয়েছিল, সেও বেশী দিন বাঁচে নি।

জাহাঙ্গীরের একটি গুণ ছিল তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করতেন। হৃদয়ের প্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে তিনি যে আহত, তাঁর আত্মজীবনীর প্রতি ছত্রে ছত্রে তা ফুটে উঠেছে। জেবুন্নিসা পরিণত বয়সে দিল্লীর মূল্যবান গ্রন্থাগারে রক্ষিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের দীর্ঘ আত্মজীবনী মুগ্ধবিস্ময়ে পড়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীর প্রতি ছত্রে ছত্রে নিজের অমানুষিক প্রবৃত্তির জন্যে আক্ষেপ করেছেন। এবং বলেছেন, 'আমার এই আত্মজীবনীতে

আমার নিজের সমস্ত অন্যায়কে অকপটে স্বীকার করে গেলাম। এইজন্য করলাম, কেউ যদি আমার অন্যায় দেখে নিজের প্রবৃত্তিকে সংযমী করতে পারে তাহলে আমার এই স্বীকারোক্তি সার্থক হবে।'

জেবুন্নিসা কখনও ভোলেনি মোগল সম্রাটের সিংহাসনের এই মহান রাজপুরুষকে। এমন রাজপুরুষের দেখা আজ আর মোগল রাজবংশে পাওয়া যায় না। দারা শিকোর মধ্যে কিছুটা মহানুভবতার ছোঁয়াচ ছিল। কিন্তু তিনি বড় উগ্র, অহঙ্কারী। নিজের মতকেই সামনের সকলের পথ বলে বিবেচনা করতেন। তাছাড়া তার ইন্দ্রিয়ও সংযমী ছিল না। রমণীর প্রেমের আকর্ষণে অভিভূত হয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। নিজের ধর্মকে যে ত্যাগ করল তাঁর মনুষ্যত্ব কোথায়? তাঁর সমস্ত অহঙ্কার, পৌরষত্ব রমণী দেহের রমণীয় গোপনতার মধ্যে আবদ্ধ। সেখানে তিনি বশীভূত। তাই তাঁর কাছ থেকে মোগল রাজপুরুষের পৌরুষ আশা করা বাতুলতা।

জেবুন্নিসা আবার চোখ রাখল প্রাচীরের ফোকরের মধ্যে। শুধু কুসুম নয়, কুসুমের মত অনেক মেয়ে কোমরে একখণ্ড কাপড়ের আড়ালে নিজের রমণী লজ্জাকে ঢাকতে না পেরে একমাথা চুল সামনে এলিয়ে দিয়ে মুখ ঢেকেছে। বুকের অনাবৃত অংশে লোভাতুর পুরুষের চোখ ঢাকবার জন্যে দুটি হাত আড়াআড়ি করে দিয়ে রমণীরা নিজের বক্ষ সৌন্দর্যকে আড়াল করবার প্রয়াস করছে। কিন্তু যা প্রকাশ হয়ে পড়ছে তাকে আড়াল করার চেষ্টা শুধু বেদনারই সামিল। তাই রমণীর বক্ষের অপরূপ সৌন্দর্য সামান্য সিপাইদের চোখের ক্ষুধার ওপর আগুন জ্বালাচ্ছে। উপভোগ করছে তারা প্রাণভরে।

জেবুন্নিসার মুখ দিয়ে হঠাৎ অস্ফুটস্বরে চীৎকার উঠে এল। তাড়াতাড়ি সে সভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে চারদিকে একবার দেখে নিল। মনে তার বিরাট বিস্ময় জেগে উঠল—এমনি করে রমণীর লজ্জা কেড়ে নিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করতে কে আদেশ দিল? তার পিতা ঔরঙ্গজেব, না সম্রাট শাহজাহান দুহিতা রোশনারা! রমণী হয়ে রমণীর ওপর অত্যাচার করার ইচ্ছা রমণীরই হয়। রোশনারা আজ ভ্রাতার সাহায্যকারিণী। ভ্রাতার রাজ্যপ্রাপ্তিতে তার ক্ষমতা কাজ করেছে। সে বিশ্বাসঘাতকী হয়ে ভ্রাতাকে সাহায্য করে ভ্রাতাকে সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছে। আজ দিল্লীর রাজ অন্তঃপুরে তার একাধিপত্য। সেখানে ঔরঙ্গজেব কোন উপায়ে তাকে তার পদমর্যাদা

থেকে সরাতে পারবেন না। সেইজন্যে হয়ত অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব পেয়ে প্রথমেই কতকগুলি সুন্দরীর ওপর তার জাতক্রোধ পড়েছে। হয়ত বিনাপরাধেই তাদের দোস্তাকের ঘৃণ্য পরিবেশে নির্বাসিত করছে। অপরাধ তারা সুন্দরী। অপরাধ, তারা মোগল শাহাজাদাদের সোহাগের স্বপ্নতীর্থে বিলাসের উপকরণস্বরূপ উপাচার; এতদিন তারা রাজঅন্তঃপুরে সরাবের রঙীন নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যৌবনের ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করেছে।

রোশনারার রাগ। সে মোগলবংশে জন্মে শাহাজাদী হল কেন? শাহাজাদীরা শাদী করতে পারবে না। মহব্বত করতে পারবে না। আওরতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোগল হারেমে নিদ্রা যাবে। রমণীর বুকের তলায় কামনার কোমল ইচ্ছাগুলি প্রাসাদের কঠিন পাথর দিয়ে চাপা রাখতে হবে। আশ্চর্য নীতি প্রবর্তন করে শাহনশাহ আকবর মোগল শাহাজাদীদের হত্যা করে গেছেন। তিনি একবারও ভাবেন নি, এদের পরিণতি কি হবে? যারা অসংযমী, যাদের কামনা নিবৃত্তি করার ক্ষমতা নেই, তারা কি শুধু ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য যথেচ্ছাচার করবে? তবু শাদী করতে পারবে না। কিন্তু এতেই কি মোগল রাজবংশের কল্যাণ হবে? মোগল রাজবংশের মেয়েগুলি অশ্রুবর্ষণ করে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে আর পুরুষগুলি রাজতখতে বসে মোগল রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি করবে। অসম্ভব। সম্রাট মহামতি শাহনশাহ আকবর যদি এই অনুমানে মোগল শাহজাদীদের অবহেলা করে থাকেন, তাহলে তাঁর জগদ্বিখ্যাত নাম একদিন ম্লান হয়ে যাবে। রমণীকে তুচ্ছ করে কোন বংশ উন্নতির শিখরে উন্নীত হতে পারে না।

আর এইজন্যেই রোশনারা বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়ের সংযমকে অসংযমী করে মোগল হারেমের বিলাসী কক্ষে নিজেকে সরাবের পেয়ালায় ডুবিয়ে রেখেছে। কূটকৌশলী ভাই ঔরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করে তাকে সিংহাসন প্রাপ্তিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য—শুধু ভালভাবে রাজসিক ঐশ্বর্যের বিলাসের পঙ্কে তার ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা। আজ রোশনারার বিলাসী মনে সবচেয়ে খুসীর লাখো ঝাড়ের তীব্র আলো।

তার জয় সমস্ত মোগল রমণীদের জিঘাংসাকে নিবৃত্তি করেছে। আজ সে ভাইয়ের পাশে থেকে সমস্ত রমণীকুলের প্রতিনিধি হয়ে সেই সম্রাট আকবরের অবিচারকে চাবুক লাগাচ্ছে।

একটি ঘটনা হঠাৎ মনে এল জেবুন্নিসার—গত রাত্রে যখন পিতা ঔরঙ্গজেব দলবল নিয়ে দিল্লী প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন; অন্ধকার প্রাসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশের সময় মেয়েলীকণ্ঠে কে যেন হি-হি করে অট্টহাস্য হেসে প্রাসাদের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছিল। ঐশ্বর্যের ঝলমলে প্রাসাদের সমস্ত কক্ষগুলি তখন আলোর মত উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বলতাকে নিশ্চিহ্ন করে সেই রমণীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ হাসি যেন সমস্ত বিজয়ী ঔরঙ্গজেবের সেনাদের প্রাণের সাহস কেড়ে নিল। দারা তার তিন বেগম, উদিপুরী, রাণাদিল ও নাদিরাকে নিয়ে চলে গেছে। আর যা অবশিষ্ট রাজঅন্তঃপুরে আছে তা শাহজাদাদের উচ্ছিষ্ট কতকগুলি নিষ্পিষ্ট যৌবনোপহার।

তাই ঐ প্রাসাদ অলিন্দে গম্বুজের অন্তরালে মেয়েলী হাসির প্রতিধ্বনি চারদিকে যুদ্ধের অস্ত্রের ঝনঝনানির মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে—ঔরঙ্গজেব হঠাৎ এই আকস্মিক বাধা পেয়ে চীৎকার করে আদেশ দিলেন—কে এই রমণী প্রাসাদের শান্তি হরণ করে ঔরঙ্গজেব আলমগীরকে ব্যঙ্গ করে ভীত করতে চায়, তাকে অবিলম্বে কয়েদ কর!

সৈন্যরা ছুটল প্রাসাদের অন্তঃপুরের সমস্ত মহলে মহলে। সমস্ত ঝাড়ের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে প্রাসাদের চারদিকে আলোয় উদ্ভাসিত করে দিল। কিন্তু কোথায় সে রমণী? যে হেসেছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। অন্তঃপুরের বাঁদীমহল, বেগমমহল, নর্তকীমহল থেকে সমস্ত রমণীদের এনে হাজির করা হল, তাদের হাসি পরীক্ষা করা হল কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, কে সেই রমণী যে হেসে আগামী সম্রাটকে স্পর্দ্ধিতা ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করেছিল?

রোশনারা পিতার কাছ থেকে চলে এসে ভাইজানের সঙ্গে দিল্লীতে মিলেছিল। সে তখন ভাইজানের সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করে বলল—আগামী কল্য ভাইজান সিংহাসনে বসবার পর দেখে নেব কার এত সাহস আমাদের কাজের সমালোচনা করে?

মনে হয়, সেজন্যে কুসুমের মত মেয়েদের আজকে এই শাস্তি ভোগ করতে হল।

আর ভাবতে পারল না জেবুন্নিসা। তার রাজসিক দেহটা এতদিন বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। পড়াশুনা ছাড়া, নিজের যৌবনের সব আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, কবিতার রঙে রাঙা হওয়া ছাড়া এসব চিন্তা তার

মনে কখনও আঘাত সৃষ্টি করে নি। কিন্তু দিল্লীর এই চারদিকে ধ্বংসের স্তূপের ওপর পিতার নারকীয় ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে রাজ্যপ্রাপ্তিতে তার কুসুম মনে যেন বার বার আঘাত সৃষ্টি হতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে স্খলিতপদে টলতে টলতে ক্ষতবিক্ষত দেহভার নিয়ে মহলের একান্তে নিজের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। পালিতা মাতা মিয়াবাই এসে তাকে দেখে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—সম্রাট আলমগীর, দুবার তোমার অন্বেষণে এখানে এসেছিলেন শাহজাদী!

রুদ্ধ কান্নাকে বার বার সংযত করতে গিয়ে জেবুন্নিসার সুন্দর অপরূপ চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। জেবুন্নিসা তার রক্তবর্ণ সজল চোখ দুটি ন্যস্ত করল মিয়াবাইয়ের সস্নেহ দৃষ্টির সামনে। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—কেন? আমার সঙ্গে পিতার কি প্রয়োজন?

মিয়াবাই শিউরে উঠলেন। বুঝতে পারলেন জেবের অভিমান। আরো বুঝতে পারলেন, পিতার নৃশংস কার্যধারাকে জেব সমর্থন করতে পাচ্ছে না, সেজন্যে তার কোমল হৃদয় আহত। কিন্তু এই অসমর্থন যে দারুণ সর্বনাশের হেতু—এই মনে করেই স্নেহসিক্তহৃদয়ে মিয়াবাইয়ের আশঙ্কা জাগল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠের স্বর পরিবর্তন করে আরো কোমলস্বরে সস্নেহে জেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—ছি, ও কথা বলতে নেই শাহজাদী। তোমার পিতা আজ দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। তাঁর হাতে আজ সমস্ত ভারতের শাসনের গুরুভার। তুমি তার একমাত্র পেয়ারী কন্যা। তোমার সঙ্গেই তো তাঁর আজ সবচেয়ে প্রয়োজন!

না, আমার সঙ্গে পিতার আজ কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রয়োজন তাঁর ভগ্নী রোশনারার সঙ্গে। রোশনারাই পারবে আমার পিতার সিংহাসন সুরক্ষিত করতে। মানুষকে বিনাপরাধে ঘাতকের কৃপাণের তলায় তুলে দিতে। আমি পারব না। তাই আমার সঙ্গে পিতার আজ আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। আমি একদিন পিতার প্রয়োজনে লেগেছিলাম, যেদিন তিনি ফকীরী বেশধারণ করে মক্কা যাত্রা করবেন বলে কোরাণের ধর্মসূত্র ব্যাখ্যা করে মহম্মদের মত অবলম্বন করেছিলেন।

মিয়াবাই তাড়াতাড়ি জেবের পাশ থেকে উঠে কানে হাত চাপা দিলেন।

জেবের থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি কি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ শাহজাদী?

জেবুন্নিসা এক নিঃশ্বাসে মনের আগল উন্মুক্ত করে মনের আসল দর্পণটি মেলে ধরেছিল হঠাৎ মিয়াবাইকে কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে যেতে দেখে ও 'মৃত্যুর কথা' বলতে তার মুখে শতদুঃখে ম্লান হাসি জেগে উঠল। বলল—পিতার ভগ্নী রোশনারা যদি আমার মৃত্যু ঘটানোর আয়োজন করেন, আর পিতা যদি তাতে সমর্থন জানান, তাহলে এ জীবন রক্ষা করার ইচ্ছা আমার একদম নেই। তবে তোমাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। আমার শিরায় একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত পিতার ভগ্নী রোশনারার ক্ষমতা হবে না, তোমাদের উপর অত্যাচার করেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার আম্মাজান।

এই সময় এক বাঁদী ছুটে এসে কক্ষে প্রবেশ করে চুপি চুপি জানাল—সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীর! বলেই সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মিয়াবাইও আর কালবিলম্ব না করে গাত্রোত্থান করল। আজ সবার ভয় এই নিষ্ঠুর মানুষটিকে। সামনে অপেক্ষা করলে পাছে কোন গোস্তাখি হয়ে যায়, এইজন্যে সকলেই আড়ালে চলে যেতে চায়। কিন্তু পিতা ঔরঙ্গজেবকে জেবুন্নিসার কোন ভয় নেই। সে যেন পিতার আগমন প্রত্যাশায় আরো সাহস সঞ্চয় করল। মনে মনে বলল—পিতার এই নিষ্ঠুর কার্যনীতিকে যতদূর সম্ভব প্রতিবাদ জানিয়ে মোগল শাহজাদীর মানসিক শক্তিরই পরিচয় দেবে।

ঐশ্বর্য আড়ম্বরে সজ্জিত দিল্লীর অন্তঃপুরের এক কক্ষে জেবুন্নিসা একা বসে বসে পিতার আগমনের পদধ্বনি শুনতে লাগল। বাইরে থেকে অতিক্রত পদধ্বনি কক্ষের মধ্যে ভেসে এল। সামনে এসে উপস্থিত হলেন নবীন সম্রাট শাহনশাহ মহীউদ্দিন ঔরঙ্গজেব আলমগীর পাদিশাহ্ ঘাজী। তার পরনে রাজবেশ, কণ্ঠে মুক্তাহার, মাথায় বহুমূল্য রত্নখচিত মুকুট। কোথায় গেল সে আলখাল্লা পরিহিত মক্কা তীর্থবাসী ফকীর ঔরঙ্গজেব! তার পরিবর্তে এই রাজবেশ দেখে মনে মনে জেবুন্নিসা আহত হল। যে রাজবেশ, কণ্ঠহার ও মুকুট পিতার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে সে বেশ একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠসম্রাট আকবর শাহ, তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ ও বর্তমানের সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পিতা শাহজাহান পরেছিলেন। কিন্তু তারা এই বেশ পরিধান করে

জগতের শ্রেষ্ঠ রাজতখ্‌তে বসে মানুষের কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করে গেছেন। মানুষের হৃদয়ের কোমল তন্ত্রে সম্রাটের সহানুভূতির স্পর্শ সম্রাটের রাজ্য-শাসনের সময় দীর্ঘ করে, বিদ্রোহ কমায়, আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্যে শাহনসা আকবর, জাহাঙ্গীর শাহ, সম্রাট শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে প্রজাদের আশীষ পেয়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন।

জেবুন্নিসা ভাবল, কিন্তু তার পিতা ঔরঙ্গজেব তাঁর শয়তানী মন নিয়ে কতকাল এই সিংহাসনে বসে থাকবেন? সমস্ত ভারতের প্রজারা কি এই নৃশংস নিষ্ঠুর প্রকৃতির সম্রাটের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন? সেই অদূর ভবিষ্যতের মহাকালের ধ্বংসের ছবি মনে এসে জেবুন্নিসার মন শঙ্কাকুল করে তুললো। জেবুন্নিসা তাকিয়ে দেখল, ঐশ্বর্য আড়ম্বরে সজ্জিত সম্রাট পিতা ঔরঙ্গজেবের মুখের ওপর দারুণ খুশীর ঔজ্জ্বল্য। তাঁর চোখের বিদ্যুৎ শাণিত দৃষ্টিতে ঘুরছে অপরূপ এক তৃপ্তির প্রশস্তি।

কথা বলল জেবুন্নিসা, মাথা যত সম্ভব আনত করে—জাঁহাপনা, আমাকে আপনি খুঁজছিলেন?

সম্রাট ঔরঙ্গজেব জেবুন্নিসার 'জাঁহাপনা' সম্বোধনে খুসী হয়ে হঠাৎ উল্লসিতস্বরে বললেন—মুবারক হো, মেরে পিয়ারী বেটি। আজ আমি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছি, রাজ্যের সমস্ত লোক আমার এই অভিষেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। তুমি অভিনন্দন জানাবে না মেরে পিয়ারী বেটি?

জেবুন্নিসা কি বলবে? মনে তার দুঃখের হিমস্রোত। হৃদয়ের অন্তঃস্থল ঠেলে শুধু কান্না ছাড়া কিছু আসে না। আজ এখুনি যদি সম্রাট পিতার সামনে তার আসল মনের পরিচয় পেশ করে—তাহলে নিষ্ঠুর পিতা কখনই আর পেয়ারের ইন্তেজার করবেন না। জল্লাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কন্যার স্নেহের সত্যিকারের বিচার সমাধা করবেন। জগতে আবার আর একটি কলঙ্কের সুতীব্র কালিমা-চিহ্ন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নামের পাশে সজ্জিত হবে। পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, ভগ্নীদ্রোহী, মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজবংশকে উচ্ছেদ করে আবার কন্যা-হত্যার কালিমা লেপন করতে চায় না বলেই জেবুন্নিসা নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করবার প্রয়াস পেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—পিতার এই নিষ্ঠুর নারকীয় কার্যের সমর্থন করেই সে নিজেকে রক্ষা করবে, বাঁচিয়ে রাখবে আগামী দিনের জন্য। দুর্জ্জনকে হুঙ্কার দিয়ে নিজের

বিপদকে ডেকে না এনে শয়তানকে করুণা প্রদর্শন করে তার মন জয়ের চেষ্টা করতে হবে—তবেই রক্ষা হবে সমস্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস। কিন্তু তাতেও সন্দেহ জাগল—পিতা ঔরঙ্গজেব তার চেয়েও আরও বেশী ধূর্ত। তিনি সামান্য কথার ইঙ্গিতেই বুঝতে পারেন, বক্তা কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। তাই জেবুন্নিসা ঠিক করল, খুব সাবধানে পথ পরিক্রমা করতে হবে। পাষাণ হর্ম্যতলে কোমল পায়ের শব্দের অনুরণন যাতে না বাজে তার জন্যে চাই প্রচুর অধ্যবসায়। জেবুন্নিসার প্রতিজ্ঞা হল, আজ থেকে সে সেই অধ্যবসায় প্রাণপণে অভ্যাস করবে।

তাই পিতার কথার প্রত্যুত্তরে সে লজ্জিত হয়ে বলল—মুবারক হো পিতা। মুবারক হো দিল্লীর সম্রাট শাহনশাহ আলমগীর। আস্‌সেলামোআলাইকুম জাঁহাপনা! এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে নামাজের ভঙ্গিতে পিতাকে কুর্ণিশ করল তিনবার। তারপর বলল—আমার গোস্তাখি মাপ হয় পিতা। তবিয়ত আচ্ছা ছিল না বলে আমি যথাসময়ে আপনার সিংহাসনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি।

ঔরঙ্গজেব খুশী হয়ে বললেন—আমি তোমার কক্ষে দুবার তোমায় খুঁজতে এসেছিলাম।

—শুনেছি পিতা। বাইরে প্রাসাদের তোরণদ্বারে কামান গর্জে উঠতে পিতার রাজ্যাভিষেকের সময় এল জানতে পেরে ছুটে শালিমার বাগের পুষ্পোদ্যানে গিয়েছিলাম বাইরের প্রকৃতি অবলোকন করতে। দেখলাম, কামান গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সূর্যের প্রখর দীপ্তি আরও দীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নির্মেঘ নীলাকাশের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক শুভ্র পারাবত দলবদ্ধ রাজসৈন্যের মত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। দেখে বোধ হল, পিতার রাজ্যাভিষেকে মঙ্গল পারাবত আগামীদিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করছে। শালিমার বাগের অজস্র শুভ্রপুষ্পস্তবকে সুস্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ। তারা আনন্দে দোল খাচ্ছে দেখে বড় আনন্দ লাগল। পিতা আমার ইচ্ছা ছিল, হিন্দুরাজার রাজ্যাভিষেকের মত আপনার ললাটে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে শঙ্খ নিনাদ করে আজকের এই শুভদিনটিকে অক্ষয় করে রাখি কিন্তু নসীব আমার, আজকে আমাকে বাইরের মহলে কিছুতে যেতে দিল না। এতক্ষণ দারুণ ক্লান্তিতে শালিমার বাগের বিশ্রামমঞ্চে বসে ক্লান্তিদূর করছিলাম।

ঔরঙ্গজেব কন্যার কথায় খুসী হয়ে বললেন—আমি তাইতো চারদিকে তোমার অন্বেষণে ছিলাম বেটি,—আজকের এই শুভদিনে যে সবচেয়ে বেশী খুসী হবে সে কোথায়? জিনৎ সেই শয়তান বিধর্মীর বেটি জাহনজেবকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার যে কি আছে বুঝি না? জিনৎ আজকাল বড় অধর্মের কাজ করছে, ওকে ওর ভুল বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ইসলামের ধর্ম যে ন্যায়ের ধর্ম সেকি জিনৎ জানে না! তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন—ভগ্নী জাহানারাই জিনতের মাথাটি নষ্ট করেছে। যার পিতা তার তিনবেগমকে নিয়ে পালাতে পারল, কন্যার জন্যে তার এতটুকু মায়া হল না, তার কন্যার জন্যে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? তাই ভগ্নী রোশনারাকে নির্দেশ দিয়েছি, যেন শয়তান দারার কন্যা জাহনজেবের ভার সে নেয়।

জেবুন্নিসা এই কথা শুনে মনে মনে শিউরে উঠল দারুণ,কিন্তু বাইরে প্রকাশ করল না। শুধু বলল—আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছেন বাপজান।

ঔরঙ্গেব বললেন: আরও একটি কথা। ভগ্নী জাহানারা পিতার কাছে থেকে পিতার শুশ্রূষার প্রার্থনা জানিয়ে এত্তেলা পাঠিয়েছে, আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছি। আর সুলতান মহম্মদকে সুজার অন্বেষণে পাঠিয়ে নপুংসক মুতমদ্‌কে পিতার প্রহরাধীনে নিযুক্ত করেছি। তারপর ঔরঙ্গজেব ব্যথিতস্বরে বললেন—পিতার অপত্যস্নেহের ফল্গুধারাকে প্রতিহত করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমার এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হল। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ইসলাম ধর্মের শত্রু জেনেও তিনি হিন্দুস্থানের সিংহাসনে সেই বিধর্মী পুত্রকে বসাতে চান। আমি ইসলামের সমর্থক হয়ে বাধ্য হয়ে এই অন্যায়কে রুদ্ধ করবার জন্যে হানাহানির মাঝে নেমে এসেছি। তারপর বললেন—যাই, হয়ত এতক্ষণে লাহোর থেকে খবর এসেছে সেই বিধর্মী শয়তান আমার বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধের আয়োজন করছে। ধর্মের সিংহাসনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাধ্য হয়ে আমাকে সে যুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে হবে।

জেবুন্নিসার ইচ্ছা করল বলে—পিতা, যা কিছু আপনি করেন—আমার কিছু বলবার নেই তবে ভাইদের কাউকে প্রাণে বধ করবেন না। আর আপনার জন্মদাতা পিতাকে মুক্তি দিয়ে আপনি আপনার সৎসাহসেরই পরিচয় দিন। কিন্তু সে কথা বলতে জেবুন্নিসার মুখে বাধল। যদি সম্রাট পিতা হঠাৎ সন্দেহ করে বসেন? যদি মনে করেন, তাঁর স্নেহের কন্যা পিতার রাজ্যপ্রাপ্তিতে খুসী নয়? তাহলে বিদ্রোহিনী হবার পূর্বে পৃথিবীর আলো চিরতরে কন্যার চোখ

থেকে কেড়ে নেবেন। তাই চুপ করে থেকে বলল—ধর্মের জন্য ন্যায়ের জন্য মমতাকে মনে প্রশয় দিলে চলবে না পিতা। আপনি যা করছেন পবিত্র কোরাণের পবিত্রতাকে আরও পবিত্রতর করছে। ইসলামের ধর্মশ্রেষ্ঠ ও প্রবর্তক মহম্মদের ইচ্ছাকেই কার্যে পরিণত করছেন। পিতা' আপনার নাম কোরাণ শরিফের মত চিরকাল জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ঔরঙ্গজের খুশী হয়ে জেবুন্নিসার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—সেজন্যেই আমার পেয়ারী বেটির এত ইস্তেজার করি। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদিকের গোলযোগ মিটে গেলে এরজন্যে তোমার পুরস্কার প্রাপ্য হল জেব। এই বলে ঔরঙ্গজেব গর্বিতভঙ্গিতে হঠাৎ কক্ষ থেকে দ্রুত অদৃশ্য হলেন। এমন ভাবে গেলেন, যেন তাঁর মৃত্যুবাণটি কোথায় কোন উন্মুক্ত স্থানে ভুলে ফেলে এসেছেন। এখুনি সেটি সযত্নে রক্ষা করতে না পারলে প্রাণের আশঙ্কা গুরুতর।

ঔরঙ্গজেব চলে গেলেন তাঁর বর্তমানের সৌভাগ্যের পসরা নিয়ে ঐশ্বর্যের জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে দীপ্ত পদক্ষেপে গর্বিত ভঙ্গিতে আগামী কর্মব্যস্ততা নিয়ে। হয়ত দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের কারো হঠাৎ জেগে ওঠার সংবাদ তাঁর কর্ণকুহরে অদৃশ্য কোন সঙ্কেত জানিয়েছে, সেজন্যে তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধের আয়োজনের জন্য ছুটলেন। দিল্লীর সিংহাসনের বর্তমানের অধিকারী লুঠেরার মত সিংহাসন লুঠে নিয়ে সর্বদা শঙ্কিত ; যে সে সিংহাসন শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা !

পিতা চলে যাবার পর জেবুন্নিসা আত্মমগ্ন হয়ে চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করল। গভীর চিন্তার সমুদ্রে অগণিত যুদ্ধসাজ পরিহিত সৈন্য যেন তার কোমল হৃদয়ের স্বপ্নস্বর্গে অদ্ভুতভাবে ঢাল সড়কি চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এ সে করল কি? নিজের স্বভাবের আসল দিক্‌টা রুদ্ধ করে সে নকল দিকটাই প্রকাশ করল? মুল্লা আশ্রফ এতদিন কি তাকে তবে এই শিক্ষাই দিলেন? দেশ বিদেশের নানা বিষয়ের ধর্মগ্রন্থ যে তার মনের কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলিকে ধর্মভাবের মধ্যে দিয়ে পবিত্র করে তুলল ; কাব্যের ললিত সুকুমার কলার কোমল স্পর্শে প্রকৃতির অমর সৌন্দর্যের বিভিন্ন রঙে তার মনের অলিগলি রাঙা হয়ে উঠল। সেখানে মানুষের এই হানাহানি, রক্তের এই অনর্গল স্রোত, জীবনের এই

প্রাণদায়িনী সংঘাত কত মর্মন্তুদ—সে একমাত্র সেই জানে। মুল্লা আশ্রফজী থাকলে জিজ্ঞেস করত—আপনি আমাকে জগতের সুন্দর দিকেরই শিক্ষা দিলেন কিন্তু সারা দুনিয়া ভরে যে অসুন্দরের বাস—তার শিক্ষা দিলেন না কেন? কিন্তু তিনি আজ দু-সপ্তাহকাল নিজের স্বদেশে ইরানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফিরে আসবেন কিনা তার কোন ঠিক নেই। সম্ভবতঃ তিনি আসবেন না। যখনই দেখেছেন মোগল শাহাজাদাদের মধ্যে একখণ্ড স্বর্ণ নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগেছে, এবং এর শেষ পরিণতি যে ভীষণ সেই চিন্তা করেই তিনি সুযোগ মত অদৃশ্য হয়েছেন। ভালই করেছেন।

জেবুন্নিসার নিজেরও যদি সেরকম কোন সুযোগ থাকত তাহলে সে অবিলম্বে এই নরক থেকে অসুন্দরের জগত থেকে পালিয়ে যেত। গেলে সে মুক্তি পেত। তার মনের এই ক্ষত নিয়ে এই রাজসিক ঐশ্বর্যের মধ্যে নকল জীবন নিয়ে একদণ্ডও থাকত না। কিন্তু যা হবার নয় তার চিন্তা করে আর নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে কি লাভ? মোগল রাজ অন্তঃপুরের শাহজাদীর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে ঔরঙ্গজেবের কন্যা হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। কি নিদারুণ অভিশাপ? দৌলতবাদের ভূমিতে তার জন্মের দিনটি কোন মাসের তিথি অনুযায়ী ছিল কে জানে? একবার জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলে হত—তার নসীবের ভবিষ্যতে কি লেখা আছে? সম্ভবতঃ দশই শওয়ালের প্রাতে সূর্য যখন তার অপরূপ রশ্মিমালা দাক্ষিণাত্যের আকাশের চতুর্দিকে স্বর্ণরেণু মাখিয়ে দিয়েছিল—সেই সময় তার জন্ম। তবে কি যারা তার জন্মের দিনটি সূর্যের কিরণমালায় বিভূষিত বলে প্রচার করেছিল, তারা কি মিথ্যে কথা বলেছিল? যে দিন তার জন্ম, সেদিন আকাশে ছিল না সূর্যের তীক্ষ্ণ রবিরশ্মিমালা, ছিল মেঘের আড়ালে লুকায়িত সূর্য। আকাশে ছিল প্রলয়ের ঘনঘটা। প্রবল ঝঞ্ঝা ও বারিপাতের মধ্যে পৃথিবী অন্ধকারময় হয়ে প্রলযের রণরঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে ধ্বংসের স্বরূপ বিস্তার করেছিল। তাই আজ জীবন ঘিরে শুধু কান্নার প্রস্রবণ শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই অল্প সুখে বিরাট আনন্দ নিয়ে প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে খুশীর হীরে জহরত ছড়িয়ে ফিরছে, আর সে একান্তে সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে দীনহীনরূপে আহত বন্যহরিণীর মত যন্ত্রণা নিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে আছে।

পিতাকে খুসী করার জন্যে হঠাৎ যে সে অস্ত্র বের করল, সে ত তার

নিজের অস্ত্র নয়? অথচ আত্মরক্ষা করবার জন্যে দারুণভাবে হঠাৎ তার পোষাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আশ্চর্য এক সম্মোহনী হাতিয়ার। পিতা খুসী হয়ে এতটুকু সন্দিগ্ধ না হয়ে তাকে পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষণা করে গেলেন। ভাবতে গিয়েও সে বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়—এ কেমন করে সম্ভব হল? সে কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছে কতকগুলি পুরাতন কর্মচারীকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্যে ঘাতক তার শাণিত কৃপাণ নিয়ে বধ্যভূমিতে এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিল। আজ তারা এই মোগল রাজপ্রাসাদে চাকরী করে বয়সের প্রান্তঃসীমায় এসে পৌঁছেচে। তাদের এই বিশ্বস্ততার শেষ পুরস্কার নবীন মোগল সম্রাট কর্তৃক প্রাণদণ্ডাদেশ!

না, না, না। রাজা, বাদশাহের ঘরে জন্মে মানুষের প্রাণের মূল্যের বিচার করলে হবে না। এখানে কথায় কথায় ঘাতকের কৃপাণের নীচে মানুষের মুণ্ডই দ্বিখণ্ডিত হয়। রক্তের স্রোত প্রাসাদের প্রাচীর গাত্রের নর্দমা দিয়ে দিনরাত অবিরল ধারায় বইছে। তার জন্যে মোগল রাজবংশের কারো প্রাণে আশঙ্কা জাগা নিতান্তই নিন্দনীয়। বরং রক্ত দেখে তার প্রাণে তাণ্ডব জাগাই শ্রেয়। এখানে মোগল সম্রাটের এক্তিয়ারে যাদের দিনরাতের কাজের ব্যস্ততা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত থাকে বধ্যভূমির ঘাতকরা। তারা দিনরাত ঘর্মাক্ত হয়ে সম্রাটের বিচারের শাস্তি দিয়ে চলেছে প্রাণ সংহার। মানুষের প্রাণ হরণ করে তারা মানুষকে তার অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে চলেছে। অথচ শাস্তির পর অপরাধীর আর বোধশক্তি থাকল না যে, সে শাস্তি পেল।

এই শাস্তির প্রসঙ্গে এ বিষয়ে একদিন সে পিতা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আলাপ করেছিল। জেবুন্নিসা বলেছিল, মানুষের অন্যায়ের শেষ বিচার আপনাদের আইনে আছে তার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু ঘাতক তার ধারাল কৃপাণ দিয়ে তার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করবার পর সে কেমন করে জানবে তার শাস্তি হল? শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের মাথায় প্রশ্নটা হঠাৎ বেশ চমক সৃষ্টি করল। তিনি অপরাধীর সর্বতম শেষ বিচারের রায় ঠিক করলেন বিষাক্ত সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটবে। সর্পদংশনের পর নীল বিষের ক্রীড়া সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দেহ নীল হয়ে যাবে সেইসময় অপরাধী যন্ত্রণার মধ্যে স্মরণ করবে তার অন্যায়ের চরমতম শাস্তি। এবং সে সেই মনে করতে করতে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তা থাকাকালীন এই রকম বিচারের শাস্তি প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেই থেকে মোগলরাজ্যে এই ধরনের শাস্তির প্রচলন সুরু হয়।

জেবুন্নিসা নিজের চোখে এইরকম বিষাক্ত সর্পদংশনে মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর একটি অপরাধীর অবস্থা অবলোকন করেছিল। করে সে ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠেছিল। তার কোমল সহৃদয়া কাতর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যন্ত্রণার নীল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মনে হয়েছিল তারই কল্পনায় সৃষ্ট এই অপরাধীর বিচার তারই দেহের ওপর দিয়ে সমাধা করা হয়েছে। বিষাক্ত গোখুরো সাপ যখন অনাহারে খাঁচার ভেতর দিয়ে ফণা তুলে অপরাধীর দেহাংশে দংশন করল—জেবুন্নিসা ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। দুটি খাঁচায় দুটি বন্য গোখুরো সাপ রাখা হত। তারা অনাহারে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকত। খাঁচার বাইরে থেকে অপরাধীর দেহের যে কোন অংশ খাঁচার ছিদ্রপথে ধরা হত। বিষধর সর্প তার ফণা তুলে সমস্ত বিষ অপরাধীর শরীরে ঢেলে দিত। পাছে একটি সর্পের বিষে অপরাধীর মৃত্যু না হয় সেইজন্য দুটি সর্প দিয়ে তাকে দংশন করান হত। মোগলরাজ্যে অনেকরকম বধোপায় প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে মস্তকচ্ছেদ, শূলে-যাওয়া, হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত করার চেয়ে সর্পদংশনে অপরাধীর শাস্তি বড় মর্মান্তিক। আর একটি গোপন মৃত্যুর আয়োজন ছিল, পপীর বিষ দিয়ে সরবৎ পান করিয়ে মৃত্যুর পরিকল্পনা। তবে সর্প দংশনে এই সাংঘাতিক মৃত্যুর আয়োজন ঔরঙ্গজেবের দ্বারাই প্রচলিত হয়েছিল।

আজ জেবুন্নিসার বার বার সেই সর্পদংশনে মৃত্যুর পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে। সে নিজের হাতেই এমনি নৃশংস মৃত্যুর পরিকল্পনা পিতার হাতে তুলে দিয়েছিল। পিতা ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর মনের বিচারে বসে আজ তার বার বার মনে হচ্ছে—সেও তো পিতার মতই এমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির মন নিয়ে ইসলামের এই পৃথিবীতে বাস করছে। তার মুক্তি কোথায়?

কিছুক্ষণ আগে আরো দেখে এসেছে, কুসুমের মত কয়েকটি কুসুম, কোমল ললনা যারা একদিন শাহাজাদাদের চোখের কামনার আকর্ষণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে এসে এই প্রাসাদের রাজ-অন্তঃপুরে শাহজাদাদের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল, তাদের আজ পরিণাম! তারা কি আজ ভেবেছিল, তাদের নসীবে আরো অনেক লাঞ্ছনা জমা ছিল? অপাংক্তেয় সব কমবেতনের

সিপাইদের হেপাজতে তাদের সুগন্ধ নির্যাসের গোলাপের রেণুতে ধোয়ানো দেহ আজ বির্বজিতা হয়ে রমনীয় লজ্জায় আরক্তিম বক্ষসৌন্দর্য আড়াল করবার প্রয়াসে সিপাইদের চোখের ক্ষুধা হয়ে শাস্তি গ্রহণে চলেছে !

সে নিজে রমণী। সে আজ পরিণতা। তার দেহে আজ যৌবনের ঐশ্বর্যের কানাকানি। অপরূপ সুন্দর মাখন তনুটি নিয়ে সে শাহাজাদীর বিলাস-ব্যসনে সুগন্ধ নির্যাসের আঘ্রাণ নিয়ে স্বর্ণপালঙ্কে মখমলের শয্যায় শায়িতা। সে জানে, তাকে যদি কেউ এখুনি বিবস্ত্র করতে আসে তাহলে সে লজ্জায় শিউরে উঠবে। তার দেহের গোপন কৌমার্য একাধিক লোকের সামনে উন্মুক্ত হয়ে সওদাগরদের পণ্য হয়ে দর্শকের চোখে লোভাতুরা হয়ে উঠলে সে তার আগেই আত্মহত্যা করবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সীমানায় অস্ত্র ছিল না বলে তারা সজ্ঞানে এই অত্যাচার সহ্য করেছে। রমণী সব ক্ষেত্রেই সমান। সে আমীর হোক্ বা ফকির হোক্।

আর সে রমণী হয়ে রমণীর ইজ্জত চোখের সামনে বেওয়ারিশভাবে লুণ্ঠিত হতে দেখল—কিন্তু কিছু করতে পারল না। অক্ষম চোখ দুটি দিয়ে সে দেখল, অক্ষম মন দিয়ে অনুভব করল আর অক্ষম দুটি হাত স্বস্থানে রেখে শুধু আহতা হয়ে ফিরে এল চাবুকের আঘাত নিয়ে।

জেবুন্নিসার আজ বড় বিস্ময় লাগছে। এতদিন সে এই মোগল শাহাজাদার ঘরেই বড় হয়ে উঠেছে। অনেক অত্যাচার, অবিচার সে তার এই চোখ দিয়ে সহ্য করেছে, কিন্তু আহতা হচ্ছে যেন আজই বড় বেশী ! আজ যেন তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ সরে গেছে। আজ তার পিতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর নৃশংসতার মধ্যে দিয়ে দিল্লীর রাজ সিংহাসনে বসেছেন। আজ সেইজন্যে তার সমস্ত বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, লয় হয়ে যাচ্ছে। পিতার একই শোণিতের সঙ্গে তার শোণিত প্রবাহিত। অথচ আশ্চর্য, পিতা এক কথা ভাবছে আর সে তার ঠিক বিপরীত !

হঠাৎ তার দারুণ হাসতে ইচ্ছা করল। হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে পৃথিবী চৌচির করে ভেঙে দিতে চাইল। পিতা ঔরঙ্গজেব লোভের সিংহাসনের জন্যে আগ্রার দুর্গে যে অগণিত মানুষের শবের স্তূপ রচনা করে আগ্রা অধিকার করে এলেন সেই শবের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত তার আকাশ ফাটিয়ে হাসতে সাধ জাগল। সে কি ব্যঙ্গের হাসি হাসবে ?

সমস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করে বলবে—নসীবের খেল্।

না বলবে, দুনিয়ার একদিক্ যেমন আল্লা মেহেরবাণী করে আলো জেলে রেখেছেন, তেমনি আর একদিকের অন্ধকারে যত অন্ধকারের দুর্ভাগ্য জমা হয়ে আছে। সেই দুর্ভাগ্যের নসীবের সঙ্গে জড়িত এই অগণিত মানুষ।

জেবুন্নিসা কানে হাত চাপা দিয়ে শুনতে লাগল—লাখো লাখো মানুষের মৃত্যু-চীৎকার। কি সে পরিত্রাহি চীৎকার? এখনও কানের মধ্যে যেন তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর ভয়ার্ত স্বরগুলি গাঁথা হয়ে আছে।

আগ্রানগরের বহিঁভাগে 'নূর-মঞ্জিল' উদ্যানের শিবির থেকে সে শুনেছে। আগ্রা প্রাসাদের মানুষদের সেই মর্মন্তুদ চীৎকার। জেবুন্নিসা সেদিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু দুটি কানে হাত চাপা দিয়ে বসেছিল। কিন্তু কানে হাত চাপা দিলে কি হবে? সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি সমস্ত যমুনার তট প্রচারিত করে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। জেবুন্নিসা কানে হাত চাপা দিয়েও চাপা দিতে পারে নি সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি। বুকের ওপর হাত চাপা দিয়েও অন্তরের দাপানি থামাতে চেয়েছিল। বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল—'তুই না মোগল শাহাজাদী? তোর এ ভীতারূপ যে বাদশাহের অন্তঃপুরে ক্ষমাহীন।' মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বাদশাহর রাজত্বে এ নূতন না। মানুষের হৃদপিণ্ড ছিনিয়ে নেবার মহোৎসব আজ নূতন না। তবে কেন তার মধ্যে এই সংশয়? কেন সে মানুষের মরণ চীৎকার শুনে চোখের জল থামাতে পাচ্ছে না? যার পিতা নিজের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদ্পিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে অট্টহাস্য করছেন! আর তাঁর কন্যা হয়ে সে কিনা তা সহ্য করতে পাচ্ছে না!

'নূর-মঞ্জিল' শিবিরের বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে জেবুন্নিসা তাই আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল—'হে আল্লা, এই রিক্ত, নিঃস্ব মুসলমান আওরতের মনে শক্তি দাও। সে যেন শক্তি সঞ্চয় করে তার পিতার নৃশংসতাকে সহ্য করতে পারে। লক্ষ লক্ষ আওরৎ তার রঙীন মন নিয়ে মোগল হারেমের রাজসিক বিলাসের পঙ্কে শুয়ে সরাবের নেশায় মশগুল হয়ে সুগন্ধ আতরের খসবুর মধ্যে ডুবে থেকে ইন্দ্রিয়ের কামনাকে উপভোগ করছে; আর তার মত এক দীন-রমনী ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্যকে তুচ্ছ করে শুধু বিবেকের দংশনে যন্ত্রণা ভোগ করে অশ্রুর সাগরে ভাসছে আর বলছে—আমার মুক্তি

কোথায়? এ কেন তার জীবনে এল? এ অভিশাপের ধূসরতা তার জীবনে কে এনে দিল? কেন সে তার জীবনের ভাল লাগাটা নিয়েই বেঁচে থাকল না? সাধারণ মেয়ের কামনা বাসনার মত তারও যদি কামনা বাসনা থাকত, আর সেই কামনা বাসনা পূরণ হলে যদি সে নিশ্চিন্ত হতে পারত, তাহলে যে তার জীবনে স্বর্গের সুষমা, বেহেস্তের সৌন্দর্য বাসা বাঁধত। হায়, সে তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকতে চাইল। কেন থাকতে চাইল? কেন তার জীবনে এমনি ভয়াবহ সমস্যা প্রতিভাত হল?'

মনে হয় তার জীবনে এই সমস্যার সৃষ্টি ঘটিয়েছে, তারই নৃশংস পিতা। পিতার কুটিল ষড়যন্ত্র এর মধ্যে কাজ করেছে। পিতাই তাকে শিক্ষিতা করে বিচারবুদ্ধি প্রখর করে তাকে অন্য মানুষে পরিণত করেছেন। পিতা ভীষণ ধূর্ত। তিনি অদূর ভবিষ্যৎকে জ্যোতিষির ছকে এঁকে নিজের ধূর্তস্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জানেন, তার জ্যেষ্ঠকন্যা একদিন মর্মপীড়ায় আত্ম-যন্ত্রণা ভোগ করবে। আর তারই জন্যে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করে কন্যাকে শিক্ষিতা করেছেন। আশ্চর্য এই ব্যক্তি!

মমতাজের গর্ভের সন্তান হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো কী মহান আর তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব কী অদ্ভুত শয়তান! মনে হয় এই অদ্ভুত জন্মের জন্য মমতাজ বেগম কোন অংশে দায়ী নয়, দায়ী যদি কেউ হয় ঐ প্রেমিক সম্রাট শাহজাহান। মনে হয় সম্রাট শাহজাহানের নির্মল হৃদয়ের রাজসিক ঐশ্বর্যের দম্ভ তাঁকে কোন একসময় শয়তানের ভয়ঙ্কর রূপে মহান করেছিল, সেদিন রমজানের চাঁদ আকাশে ছিল না, ছিল ভয়ঙ্কর অমাবস্যার মসীলিপ্ত ধরিত্রী। সেইদিনই শয়তান শাহজাহানের সহবাসে মমতাময়ী প্রিয়তমা মমতাজের গর্ভে পিতা ঔরঙ্গজেবের ভ্রূণ প্রথম অঙ্কুরিত হয়! উঃ সেদিন যদি হঠাৎ প্রলয়ের ঝঞ্ঝা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সমস্ত দুনিয়া লয় করে দিত, তাহলে আজকে আর এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হত না। জগতে শাহজাহানের কীর্তি তাজমহল যেমন বেঁচে থাকবে, তাঁর সুনাম ছড়াবে, ঠিক একই সঙ্গে তাঁর এই অদ্ভুত কীর্তির আর একটি দুর্নাম পাশাপাশি সাজানো থাকবে—সে হল তাঁর এই তৃতীয় পুত্রের সৃষ্টি।

শাহজাহান খুব ছোটবেলায় তাঁর তৃতীয় পুত্রের ভবিষ্যৎ জানতে পেরেছিলেন। তখন যদি সেই সন্তানকে তিনি ঘাতকের ক্রোড়ে তুলে দিতেন! কিম্বা বিষ খাইয়ে পৃথিবীর অন্ধকারলোকে পাঠিয়ে দিতেন!

রাজজ্যোতিষির সেই নিভুর্ল ভবিষ্যৎ গণনা শুনেও শাহজাহান সন্তানের মমতা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু মনে মনে স্মরণ করে রেখেছিলেন সেই দারুণ ধ্বংসমূলক ভবিষ্যৎ লিপিটি। তাই ঔরঙ্গজেব উপযুক্ত হলে তাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে সুদূর দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তার পদ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অতিরিক্ত সন্তান স্নেহ আজ তাঁকে তীব্র অনুশোচনার দগ্ধ আগুনে পুড়িয়ে মারছে।

'নূর-মঞ্জিলে' পিতা ঔরঙ্গজেব তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে শিবির সংস্থাপিত করলে আগ্রার সম্রাট-সভা থেকে অনেক মহা মহা রথীরাই এই ভাবী বিজয়ী সম্রাটকে অভিবাদন জানাতে গিয়েছিল। মানে তারা গোপনে পিতা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিত্রতা করে তাঁরা ভাগ্যহীন সম্রাট শাহজাহানের বিপক্ষে গিয়েছিল। পিতার শিবিরের মধ্যে গভীর মন্ত্রণার সময় মাঝে মাঝে অনেকের উত্তেজিত কণ্ঠ তার কানে গেছে। সে শুনে শিউরে উঠেছে। গতকাল যাঁদের বেতন দিয়ে সম্রাট শাহজাহান তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তাঁদের রাজসিক জীবনের উন্নতির জন্য ইন্তেজার করেছেন, আজ তাঁরা আশ্চর্যভাবে বেইমান হয়ে সম্পূর্ণ ভুলে গেল নিমকের আস্বাদ! সেই দেখে তার কষ্ট হয়েছে। তখুনিই তার ইচ্ছা হয়েছিল, ছুটে গিয়ে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে ঐ কুক্কুটগুলোর মস্তক দেহচ্যুত করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়। কিন্তু পিতার কথা মনে হতে সে দাঁতে দাঁত চেপে, কানে হাত চাপা দিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করেছিল।

খলিলুল্লা খাঁকে পিতার কাছে মহা উৎসাহে কথা বলতে শুনে বিস্মিত হয় নি। কারণ সে কেন, আগ্রা ও দিল্লীর সমস্ত লোকই জানে, যে খলিলুল্লার স্ত্রী সম্রাট শাহজাহানের শয্যার অংশভাগিনী।

শাহজাহান প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পারেন নি। মৃত্যুর সময় প্রিয়তমা মমতাজের সামনে যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার প্রায় সবগুলি রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন শুধু একটি ছাড়া। এই একটি তার জীবনে দারুণভাবে মমতাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আর তারই জন্য খলিলুল্লার স্ত্রী নয়, শায়েস্তার বেগমও মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সম্রাট শাহজাহানের শূন্য শয়ন ঘরে নিঃশব্দে এসে অভিসারিকা হত। সম্রাট শাহজাহান রাত্রিগুলিকে মমতাজের বিরহে অতিবাহিত না করতে পেরে এদের পাশে শুইয়ে রাত্রির গভীর রহস্যে

নিজেকে নিয়ে বাদশাহের রাজসিক ক্রীড়া সম্পন্ন করতেন। সম্রাট শাহজাহানের স্বভাবের এইদিকের আওরতের প্রতি আকাঙ্খায় তাঁকে বহু মূল্যবান সিংহাসনের রোশনাই থেকে একেবারে নীচে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামিয়ে দিয়েছিল। মমতাজ বিবি যে পুরুষের নৈতিক চরিত্রকে তাঁর কোমল বাহু দিয়ে আঁকড়ে রেখেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সম্রাট শাহজাহানের যেন সেই বন্ধন শতছিন্ন হয়ে বহুমুখী হয়ে উঠল। বাদশাহের রঙমহলে এল বহু নতুন নতুন খাবসুরত আওরৎ, তারা হল বাদশাহের মানসিক সান্ত্বনার উপকরণ। কিন্তু বাইরের আওরতে সম্রাট শাহজাহান খুসী থাকলে ক্ষতি ছিল না, তিনি বহুদিন ধরে যাঁদের দেখছেন, রাজকর্মচারীর বহু শাদী করা আওরৎ, তাঁদের দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।—যারা নিম্নতম কর্মচারী, তাদের ঘরের আগুন তারা নিভতে পারল না কিন্তু তারা মনে মনে আল্লার কাছে সম্রাট শাহজাহানের বিচার চাইল। তবে যারা উচ্চতম কর্মচারী, তারা মনে মনে বিদ্রোহী হবার জন্যে বলসঞ্চয় করতে লাগল। তেমনি শায়েস্তা খাঁ, খলিলুল্লা খাঁ, মহম্মদ ইকবাল প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

শায়েস্তা খাঁ নিজে বাদশাহের নিকট আত্মীয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের ভাই আসফ খাঁর পুত্র, সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা মমতাজমহলের ভ্রাতা। সেই শায়েস্তা খাঁর শাদী করা বেগমকে সম্রাট শাহজাহান তাঁর বিলাসের শয়নমন্দিরে বাদশাহী স্পর্শে আকর্ষণ করেছিলেন।

রমণীর দেহগত কামনায় মোগল রাজপুরুষরা জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু তার জন্যে জগতের কোন অভিশাপ তাঁদের স্পর্শ করে নি। এক ধরনের আওরৎ মোগলের রাজ অন্তঃপুরে রাজসিক বিলাসের মধ্যে বাস করবার জন্যে স্বেচ্ছায় এসেছে, হাসিমুখে নিজেদের কৌমার্য নিবেদন করেছে, নিজেদের ভবিষ্যতের রঙিন নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্যে নিজেদের অভিভূত করেছে, তারপর হারেমের বিলাসী পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শায়িত হয়ে সুখস্বপ্নে হারিয়ে গেছে। তারা অভিসম্পাত দেয়নি, অভিশাপের তীব্রবিষে মোগল পুরুষদের কামনাকে কণ্টকিত করে নি, কিন্তু যারা এসব চায় নি!

যারা এ সব চায় নি তারা মোগল রাজ অন্তঃপুরে বাস করে অশ্রুজলে

ঐশ্বর্যের জৌলুষ ম্লান করে বার বার অভিসম্পাতে মোগল রাজপুরুষদের ধ্বংস করতে চেয়েছে।

সেইজন্যে সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজত্বে সংখ্যাতীত শত্রু তৈরী করেছিলেন। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাই নবশক্তি আহবানে ঔরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করতে এতটুকু দ্বিধা করল না।

জেবুন্নিসা সেদিন সেই মুহূর্তে দাদু শাহজাহানের এতদিনকার অন্যায়ের প্রতিশোধ সংঘটিত হবার আশু চিন্তায় নিজেকে প্রবোধ দিল—'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' পাপের শাস্তি দুনিয়াতে আল্লা ঠিক সময়েই সমাপ্ত করেন। এর জন্যে অপরাধীর প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করলে আল্লা কখনও ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু দাদু শাহজাহানের জন্য জেবুন্নিসার দুঃখ হ'ল, যখন তিনি তাঁর অবাধ্য পুত্রকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। জেবুন্নিসা দেখেছে, বাদশাহী দূত ঔরঙ্গজেবের শিবিরে প্রবেশ করে ঔরঙ্গজেবকে বাদশাহের পত্র ও বহুমূল্য নজরানা দিয়ে সম্মান জানাল। সম্রাট শাহজাহান দুষ্টগ্রহ শয়তান সন্তানকে বশে আনার জন্যে ভীত-ত্রস্ত হয়ে তাকে পূজা নিবেদন করেছেন। পত্রের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুত্রকে পাঠিয়েছেন বহুমূল্য রত্নোপহার আলমগীর (বিশ্ববিজয়ী) নামে একটি সুতীক্ষ্ণ তরবারী। পিতার দেওয়া এই আশীর্বাদী-পূত উপাধিই ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

পিতার কাছ থেকে চিরকাল অবহেলা পেয়েই ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ের মধ্যে অভিমান জমেছিল, হঠাৎ সম্রাট পিতা তাঁর স্নেহের আকরে পুত্রকে আমন্ত্রণ জানাতে ঔরঙ্গজেবের রুদ্ধ অভিমান ঝরে গিয়ে পিতার কাছে যাবার জন্যে মন আকুলিত হয়ে উঠল। তখন যদি ঔরঙ্গজেব যেতেন, হয়ত পরবর্তী ঘটনা এমনি নৃশংসতার মধ্যে সম্পন্ন হত না। কিন্তু ভবিতব্য মোগল সাম্রাজ্যের আকাশে তখন ধ্বংসের রূপ সৃষ্টি করেছে। সম্রাট শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করে নতুন সম্রাটকে সিংহাসনে আসীন করবার জন্যে দুনিয়ার মালিক সেই সর্বশক্তিমান আল্লাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই সন্দিগ্ধ-হৃদয় ঔরঙ্গজেব স্বার্থপর আমীর, ওমরাহ, সৈনিকপুরুষদের কু-মন্ত্রণায় বিশ্বাস করে পিতার সঙ্গে সাক্ষাতে গেলেন না। মন্ত্রণাকারীরা বলল—'বৃদ্ধ নরপতির মৌখিক প্রীতি ও সাক্ষাৎ-প্রয়াস সদ্ভাব-প্রণোদিত নয়;—কোন প্রকারে পুত্রকে করায়ত্ত করে কারারুদ্ধ করবার ষড়যন্ত্র মাত্র।'

যেটুকু সৌজন্যের মুখোস পরে ঔরঙ্গজেব যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তা সম্পূর্ণ খসে পড়ল। তিনি আর অপেক্ষা না করে আগ্রাদুর্গ হস্তগত করবার জন্যে পিতার বিরুদ্ধে লেগে পড়লেন।

জেবুন্নিসা আজ ভাবে, পিতা যদি একবার এইসময় তাঁর জ্যেষ্ঠকন্যার সঙ্গে পরামর্শে আসতেন, তাহলে হয়ত তাঁর রুদ্ধরোষ কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে ভিন্নগামী হত।

সন্ধ্যার আকাশে সেদিন কিসের যেন অব্যক্ত যাতনা কালো মসীলিপ্ত দুনিয়ার চারদিকে নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে কি যেন অপেক্ষায় আছে। কবরের ভেতর থেকে মৃত মানুষের হঠাৎ জীবন্ত প্রতীক্ষায় আগ্রার আকাশ-বাতাস হাঃ হাঃ রবে অট্টহাস্যে চারদিক মুখরিত করবার জন্যে রুদ্ধাবেগে উদ্‌গ্রীব। তৈমুরের বংশের ক্রমবর্ধমান ভাগ্যবিধাতা হঠাৎ বুঝি হেসে উঠলেন। সম্রাট আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব যেন একদিনের এইসময়ে তাঁকে ধূলি-ধূসরিত করল। মোগল হারেমের শালীনতা সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নূরজাহানের বহিষ্কারের পর আজ যেন লুণ্ঠিতা হল। আগ্রার প্রাসাদের রক্তপাথরের কৌলিন্য যেন অপবিত্র হয়ে রক্তের ধারায় স্নান করে কালিবর্ণ ধারণ করল। আগ্রানগরের সেই রাজসিক বিলাস ব্যসন হঠাৎ পিতা ও পুত্রের মালিন্যে পরিত্যক্ত যমুনার কূলে কূলে কেঁদে বেড়াতে লাগল। জেবুন্নিসা দেখল, পিতা সেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে অসংখ্যবাহিনী নিয়ে আগ্রা দুর্গ অবরোধ করবার জন্যে গমন করলেন।

জেবুন্নিসার ইচ্ছা করেছিল, পিতার সঙ্গে সেও আগ্রার দুর্গে যায়, তবে যুদ্ধের জন্য নয়। ওখানে আছে, সম্রাট দুহিতা অপরূপা জাহানারা। তাঁর স্নেহের আন্তরিকতা হৃদয়ের কুসুম কোমল রন্ধ্রে গিয়ে অনুভব জাগায়, তাঁর স্নেহপাশে আবদ্ধা হয়ে কিছুকাল থাকতে। দাদু শাহজাহানের আপেল রাঙা সুগন্ধ নির্যাসে মুখরিত বাহুর আলিঙ্গন পেতে। দাদু যে কতকাল তাকে কাছে টেনে নিয়ে আকর্ষণ করেন নি। দাদুকে দেখে তার এই পরিণতা বয়সে ঈর্ষা হয়। দাদুর মত কোন সুন্দর পুরুষ যদি সে জীবনে পায় তাহলে সে তার কৌমার্য সেইমুহূর্তে বিলিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। কিন্তু সব চিন্তাই তার নিদ্রার স্বপ্ন বলে হৃদয়কে থামিয়ে রাখতে হল। আর শিবিরের আকাশের দিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনতে হল, আগ্রা দুর্গ থেকে

কোন দুঃসংবাদ আকাশের এই কালিবর্ণকে হঠাৎ প্রজ্বলিত করে ছুটে আসে কিনা!

আগ্রার রাজদুর্গের সমস্ত রাজকর্মচারীকে ঔরঙ্গজেব তাঁর ভাবী সিংহাসন প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে বশ করেছিল। তা ছাড়া প্রত্যেকেই দেখছিল, আগামী দিনে সিংহাসনে কেউ যদি বসে তাহলে সে হল এই অমিত পরাক্রম, সমরবিশারদ, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে সদাসতর্ক, দুর্গম রণ সঙ্কটে ধীর, সাহসে অটল, কূটচক্রে নির্ভীক, দুরাকাঙ্ক্ষায় দৃঢ়পণ এই ঔরঙ্গজেব। সেইজন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত সম্রাট শাহজাহান সম্পূর্ণ বাহিনী শূন্য হয়ে দুর্গের মধ্যে বসে ভীত ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। আর ঔরঙ্গজেব তাঁর অসংখ্য বাহিনী নিয়ে আগ্রার দুর্গের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে দুর্গ অধিকারে ব্যাপৃত রইলেন।

সমস্ত সৈন্য ও রাজকর্মচারীদের বশীভূত করে ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি দুর্গ তাঁর দখলে আসবে কিন্তু আশ্চর্যভাবে হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলেন সম্রাট শাহজাহানের সহস্রাধিক কল্‌মক, হাবশী ও তাতারজাতীয় ক্রীতদাসের দ্বারা। দৃঢ়ব্রত ঔরঙ্গজেবও ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এরকম হঠাৎ হবে তিনি আশা করেন নি। ভেবেছিলেন, বিনা লোকক্ষয়ে আগ্রাদুর্গ অবলীলাক্রমে করায়ত্ত করবেন। কিন্তু তা না করতে পেরে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং দুর্জয় আগ্রাদুর্গের পরিখার চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সৈন্যদের আদেশ দিলেন—'যাকে সামনে পাও তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দাও।'

দুর্গের অভ্যন্তর থেকে যারাই বাইরে আসতে গেছে ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদের তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে দুর্গের বহির্ভাগ। হাবশী, তাতার ক্রীতদাসের রক্তাক্ত মুণ্ড গড়াগড়ি দিয়ে পড়েছে ভূমিতে। কত রমণী হারেমের সুখ-ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে তরবারী হাতে সিংহদ্বারের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তারপর তাদের বেশীক্ষণ আর প্রাণ নিয়ে দুর্গরক্ষা করতে হয় নি, খণ্ডবিখণ্ড হয়ে লুটিয়ে পড়েছে সিংহদ্বারের হর্ম্যতলে। সৌন্দর্যের বর্ণাঢ্যে সম্রাট শাহজাহানের হারেম জগতের সেরা হারেম বলে খ্যাতি পেয়েছিল, এখন সম্রাটের জন্য সেইসব সেরা সুন্দরীরা দুর্গরক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করে সম্রাট হারেমের অন্যকীর্তিও প্রতিষ্ঠা করল।

এইজন্যে ঔরঙ্গজেব বারবার বিব্রত হয়ে পড়তে লাগলেন। দুর্গরক্ষার এই চেষ্টা দেখে তিনি বারবার অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলেন। তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত কৌশলের কথা তাঁর মাথায় খেলে গেল। চিরদিন কূটনৈতিক ঔরঙ্গজেব কৌশলের চেষ্টায় সমর পরিচালনা করেছেন, আজও তাই করলেন।

সাধারণ-কার্যোপযোগী কয়েকটি কূপ ছাড়া আগ্রাদুর্গে পেয়জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। যমুনা নীররূপে ক্ষীরধারাদানে আগ্রাদুর্গবাসীদের জীবন-রক্ষা করত। নদীতীরবর্তী যে দ্বার বারি-আনয়নের পথ ছিল, ঔরঙ্গজেব তা অধিকার করে নিলেন। জীবনদায়িনীর ক্রোড়ে জলকষ্ট অসম্ভব মনে করে সেদিন ঔরঙ্গজেব তাঁর বাহিনী দুর্গদ্বারে রক্ষা করে শিবিরে ফিরলেন।

জেবুন্নিসা আগেই শুনেছিল আগ্রার দুর্গের বৃত্তান্ত। সেইজন্যে পিতাকে চোখের সামনে শিবিরে প্রবেশ করতে দেখে শিউরে উঠল। সে ভাবতে লাগল, মনুষ্যজীবনে মানুষের ছদ্মবেশে এমনি পশুসম কোন নরখাদক জন্মাতে পারে? পিতার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে আড়াল থেকে তাকিয়ে জেবুন্নিসা লক্ষ্য করতে লাগল শুধু পিতার মুখে কোন বেদনার ছায়া পড়েছে কিনা! তিনি ব্যথিত কিনা শুধু এইটুকু দেখবার জন্যে জেবুন্নিসা বহুচেষ্টা করল কিন্তু নিপুণভাবে পরীক্ষা করে এই বুঝল যে, সে মুখ আক্রোশে কুটিল, ক্রোধে রক্তবর্ণ, কৌশলে ক্ষুরধার হয়ে আছে। এতটুকু অনুকম্পা বা অনুশোচনা নেই, বরং বিজয়ের আনন্দে উজ্জ্বল প্রতিভাত সূর্যের মত দেখাচ্ছে।

বেদনায় নীল হয়ে গেল জেবুন্নিসার মুখমণ্ডল। আগ্রার দুর্গের মানুষগুলোর জন্যে তাঁর সেদিনের রাত্রি হল নিঘুর্ম। কেবলই তার মনে হল, পাশের ছাউনিতে পিতা তাঁর ইউরোপীয়ান প্রেয়সীর বাহুলগ্ন হয়ে যুদ্ধের ক্লান্তি দূর করছেন; তাঁকে গিয়ে ডেকে সে বলে—'পিতা, আপনি আর যা কিছু করুন, কতকগুলি মানুষকে জলকষ্টের মধ্যে মেরে ফেলবেন না। ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রার্থনাই হল মানুষের জীবনের কষ্ট লাঘব করা। যারা আজ তৃষ্ণাতুর হয়ে শুষ্ককণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি রব করতে করতে মৃত্যুর পথে চলে যাচ্ছে, তারা যাবার সময় যে অভিসম্পাত দিয়ে দুনিয়া বিষাক্ত করে যাচ্ছে, আপনার জীবন তা থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না জেবুন্নিসা। শুধু আগ্রার অন্ধকার আকাশে আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইদিকে তাকিয়ে জেবুন্নিসা গভীরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল।

একবার সে ভাববার চেষ্টা করল—কী প্রয়োজন তার এসব চিন্তা করার ? সে শাহজাদী। সে আজকের বিজয়ীবীরের অপরূপ সৌন্দর্যময়ী জ্যেষ্ঠকন্যা। সে সম্পূর্ণ কোরাণ মুখস্ত আবৃত্তি করতে পারে। সে মুল্লা আশ্রফের শিক্ষায় বহু সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সে আরবী, ফারসী ভাষায় কসীদা (একশ্রেণীর কবিতা) রচনা করতে পারে। সে এখন পরিণতা। অপরূপ সৌন্দর্যময়ী। মোগলহারেমের হাজারো মণিমুক্তার জৌলুসকে হার মানায় তার সেরা রূপ। তার রূপের চমক আছে। রূপের আগুনকে মেলে ধরলে অনেকেই পুড়ে মরতে পারে। কিন্তু সেসব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে কেন যে পিতার কার্যনীতিকে লক্ষ্য করে বার বার তার বিবেক দংশনে নিঃশেস হয়ে যাচ্ছে! পিতা যদি কোনসময় জানতে পারেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠকন্যা পিতার নৃশংসতায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হারেমের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, তাহলে তিনি ঠিক ক্ষিপ্ত হয়ে জেবুন্নিসার সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাবেন।

তাই জেবুন্নিসা শুধু অতীতের ঘটনার পিছে একবার, বর্তমানের মাঝখানে একবার, ভবিষ্যতের সামনের পথ পরিক্রমা করে শিউরে উঠতে লাগল। আগামীকল্য সূর্যের প্রখরতাপে যখন দিগন্তের চারদিক দগ্ধ হতে থাকবে, তখন আগ্রার দুর্গের অভ্যন্তরভাগে দুর্গের মানুষদের অবস্থা চিন্তা করে জেবুন্নিসার নিঃশ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল। সারারাত সে ঘুমতে পারল না। কেবল তার কান চলে যেতে লাগল আগ্রার দুর্গের অভ্যন্তরভাগে। সেখানে আজ ঐশ্বর্যের জৌলুষে রাঙানো বাদশাহী মহলের চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ ঝাড়ের আলোর রোশনাই নেই। নেই কোন বাদশাহের খুসীকে ইন্তেজার করবার জন্যে নর্তকীর চটুলভঙ্গি, তার কোমল-পায়ের ঘুঙুরধ্বনি, কামনামদির দৃষ্টির ইঙ্গিত। অন্তঃপুরের মহলে মহলে বাঁদী, বেগমদের রূপালী, সোনালী রঙদার পোষাকের ঝক্‌মক্ নেই। নেই রত্নালঙ্কারের অহেতুক বেঁহুসী আওয়াজ।

বোধহয় সমস্ত প্রাসাদ—অন্ধকারের গহ্বরে সমাসীন হয়ে আগামী প্রত্যূষের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে। প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কা তাকে সেই অন্ধকারে কুরে কুরে খাচ্ছে। আর বোধহয় জাহানারা জেসমিন প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে—'তার ভাইজান হয়ে সে কেমন করে এমনি নিষ্ঠুর হতে পারল ?' আর ভাবছে নিজের কক্ষের হর্ম্যতলে পায়চারী

করতে করতে চিরকালের ব্যথাতুর মোগলসম্রাট শাহনশাহ শাহজাহান। তিনি সিংহাসন রক্ষার জন্যে ভাবছেন না, ভাবছেন তাঁর তৃতীয়পুত্রের এই নিষ্ঠুরতার কথা। আরও ভাবছেন, তিনিও তো একদিন তাঁর পিতৃদেব সম্রাট জাহাঙ্গীরকে এই আগ্রাদুর্গেই বন্দী করেছিলেন। সেদিনও মনে হয় তাঁর পিতার মানসিক অবস্থা এই পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল।

আজ অতীতের সেই বিরাট অন্যায়গুলি মনে এসে বারবার তাকে অনুশোচনার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। সম্রাট শাহজাহান তাই পুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি না চেয়ে চাইলেন, চিরজীবনের মুক্তি। মনে মনে বললেন, আগামীকল্য পুত্রকে তিনি লিখে পাঠাবেন, তিনি মৃত্যু চান। তাঁর মৃত্যুই যেন আল্লা তাকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর অসম্পূর্ণ সমাধি শেষ করে তাতে কবর দেওয়া হয়। প্রিয়তমা মমতাজের তাজমহলের সামনে শুয়ে তিনি যেন সারাজীবন তাকে দেখে শান্তি পেতে পারেন—এই তাঁর প্রার্থনা।'

কিন্তু রাত্রের চিন্তা দিনে অন্যরূপ নিল। আগ্রা প্রাসাদের ভেতরে পরদিন প্রত্যুষের পর থেকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ নিয়ে হাহাকারে দিকবিদিকে চীৎকার উঠল। তুষার-শীতল সুধাসম যমুনার নির্মল সলিল যাঁর পিপাসা শান্তি করত, সেই বিলাস-লালিত সম্রাট কূপের ক্ষারজলে শুষ্ক-অধর সিক্ত করতেও শিউরে উঠলেন। কিন্তু তৃষ্ণাতুর আত্মীয়স্বজনের যন্ত্রণা সহৃদয় সম্রাটকে দুঃসহ পীড়া দিতে লাগল। তিনি বাধ্য হয়ে পুত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখলেন—'পুত্র, কাল যে নয়লক্ষ সেনার অধিপতি ছিল, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে আজ সে একপাত্র জলের ভিখারী! ধন্য হিন্দুজাতি! —যারা মৃতপিতাকে তর্পণে জলদান করে; আর পুত্র! তুমি অদ্ভুত মুসলমান,—আমার জীবদ্দশায় একবিন্দু জলের জন্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিচ্ছ!'

বিষাক্ত তীরের মত জ্বালা-যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে ঔরঙ্গজেবের প্রত্যুত্তর সম্রাট সমীপে পৌঁছল—'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' হতভাগ্য সম্রাট তিনদিন দুঃসহ যাতনার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু যাঁর চারদিকে কেবল হতাশার হাহাকার আর কৃতঘ্নতার নিষ্ঠুরদৃষ্টি—বার্দ্ধক্যের দুর্বল হৃদয় নিয়ে তিনি আর কত যুঝবেন? দুর্দান্ত পুত্রকে শেষপর্যন্ত দুর্গদ্বার মুক্ত করে দিয়ে হতভাগ্য বাদশাহ নিজের প্রাসাদে বন্দী হলেন। একদিন যিনি ভারতশাসন করতেন, যাঁর ইঙ্গিতে, অঙ্গুলী-সঙ্কেতে রাজা-মহারাজা ত্রাসে নতশির হতেন; যাঁকে সশস্ত্র-

সমরে অগ্রসর হতে দেখলে অসমসাহসী বীরহৃদয়ও বিকম্পিত হত ;—রণে দুর্মদ, শাসনে দুর্বার, সেই শাহনশাহ বাদশাহ শাহজাহান আজ ভাগ্যবিপর্যয়ে, নিয়তির বিচিত্র বিধানে, অদৃষ্টের পরিহাসে বন্দী! বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যার অবাধ লীলাক্ষেত্র ছিল—আজ তাঁর দ্বারে সশস্ত্র কারা-প্রহরী!

জেবুন্নিসার চোখ দিয়ে মুক্তাবিন্দু ঝরছিল। মুক্তাবিন্দু নয়, হীরে, জহরত, পান্না, চুনি হাজারো বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের জৌলুষ জেবুন্নিসার আপেল-গাল বেয়ে নেমে চলেছে। তার চিন্তাধারা মোগলসাম্রাজ্যের দিল্লীর রাজপ্রাসাদের রাজঅন্তঃপুরের শাহজাদীর ঘরে আবদ্ধ নেই, সমস্ত দুনিয়ার চতুর্দিকে তার চিন্তাধারা পরিক্রমা করে কোন অতলান্তের গভীরে গিয়ে প্রবালের জৌলুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ তার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। জেবুন্নিসা চম্‌কে উঠল। তার মনে হল, সে এতক্ষণ দোস্তাকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে শয়তানদের সঙ্গে ঢাল, সড়কি, তরয়ালের খেলা খেলছিল। সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হয়ে যন্ত্রণায় মুখ থুবড়ে কোন পচা, গলিত, দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তুপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। নাকের মধ্যে অদ্ভুত এক গন্ধের মাতন তাকে দুনিয়া ভুলিয়ে আশ্চর্য এক গন্ধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। উঃ কী বিশ্রী সে গন্ধ? শরীরের সমস্ত ছিদ্রপথে সে গন্ধের অনুভব তাকে অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছিল। এইসময় আশ্চর্যভাবে তার মুক্তি ঘটল। মনে হল, অপ্সরলোক থেকে বেহেস্তের হুরীরা লাখো রূপের রোশনাই নিয়ে অপরূপসাজে সেজে তার চোখের অন্ধকার দূর করল। তাই পরম আশ্চর্য হয়ে জেবুন্নিসা বাহ্যজগতে ফিরে এসে সামনে দণ্ডায়মান দুই হুরীর দিকে দৃষ্টিস্থাপন করল।

কিন্তু এ কি? এ যে তার দুই কনিষ্ঠভগ্নী, মিহর ও জুবয়েৎ! তাদের পরনে অদ্ভুত পোষাক। তারা সেজেছে সবচেয়ে সুন্দর রক্তবর্ণের উজ্জ্বল মলমলের পোষাকে। হীরে, মুক্তোর চকমকি দিয়ে শালোয়ার, কামিজের গাত্রবর্ণ অপরূপ জৌলুষের ছটায় উদ্ভাসিত। তাদের চোখে সুরমা, তাম্বুলরাঙা অধরের কোণে রক্তরসের মিঠে প্রলেপ। কিন্তু ওকি? তাদের দৃষ্টিতে যেন মনে হচ্ছে হাজারো ক্লান্তির ছায়া আঁকা! কিন্তু ও-তো ক্লান্তি নয়! ও-যে মরদের সাথে আনন্দের পরিশ্রমের ক্লান্তির ছায়া। রসাক্ত অধরে যে গোলাপী-রঙের উঁকিঝুঁকি, ওখানে মনে হচ্ছে উন্মত্তসরাবপ্যায়ী সৈনিকদের কঠিন অধরের নিষ্পেষণের রেখা সুস্পষ্ট। মিহর ও জুবয়েৎ দুজনেই সুন্দরী। শুধু

সুন্দরী নয়, তাদের গাত্রবর্ণ অপরূপ গোলাপী আভায় আচ্ছাদিত। মোগল শাহজাদীরা যে কোন দুর্নামের অংশভাগিণী হোক্, কুরূপা বলে কখনও দুর্নাম পাবে না। এর কারণ তাদের জননীরা জগতের সেরা সুন্দরী ছিল।

তাই মিহর ও জুবয়েৎ সবচেয়ে কম বয়সের দুটি রমণী। তাদের জীবনের এই যৌবনের লীলাচাপল্য তারা সংযমের বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে পারে নি। তাদের শ্যামলিমার মত স্নিগ্ধ দুটি তারুণ্যে গঠিত জীবন মাঝে মাঝে যৌবনের অস্বাভাবিক চঞ্চলতায় মোগল-হারেম থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ত। আকাশের নীচে তারা তাদের যৌবনের পসরা মেলে ধরে মোগল সৈনিকদের প্রলুব্ধ করে আনন্দ লুটত। আনন্দের সময় তাদের মনে হত, এই সুখানুভবের কাছে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যই যেন ম্লান সুতরাং ঐশ্বর্যের অহঙ্কার নিজেদের মর্যাদাকে চন্দ্রাতপের অলঙ্কারের আড়ালে স্থান দিয়ে সুখানুভবের রাজ্যে বিলিয়ে দেওয়া ভাল। তাই ঔরঙ্গজেবের এই দুটি কন্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

তারা যখন যৌবনের পেখম তুলে ময়ূরীর মত সমস্তরঙের পসরা নিয়ে মোগল-হারেমের ঝকমকে মহলের হর্ম্যতলে নৃত্য করত—তখন মনে হত তাদের আপেল টুক্‌টুকে দুধেআলতা-গোলা নরম তুলতুলে স্বৈরিণী তনুদুটি যেন অবিকল মোমের পুতুল। পুরুষ লোভাতুর চোখে দেখত—টিকালো নাক, ঘন-কৃষ্ণ ধনু-বঙ্কিম সংযুক্ত ভ্রূভঙ্গ বিলাস ; পলাশ-রাঙা আঙুর টসটসে চন্দ্রপুলি ওষ্ঠ-অধর ; ক্ষীণ কটি মেখলার নিম্নে বীণা-যন্ত্রের নিম্নাংশনিন্দিত নিতম্ব বিন্যাস ; কদলীকাণ্ড সদৃশ জঙ্ঘা-যুগল, নিতম্ব-লম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ ঘনপুচ্ছ দোলায়িত বেনী, পীনোদ্ধত নজরবন্দী কাঁচুলিবদ্ধ, যুগান্তের পুঞ্জীভূত বিদ্রোহী যৌবন।

সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় তাদের দুটি দীঘল-ছায়া পটলচেরা সুর্মা-লাঞ্ছিত কাজল কালো চোখ। চোখ নয় যেন আসমানের তারা। জেবুন্নিসা মনে মনে ভগ্নীদের রূপের প্রশংসা করল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে কোন একটি কথা স্মরণ হতে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে তাদের দিকে তাকিয়ে তার মন ঘৃণায় আচ্ছাদিত হয়ে উঠল। এই দুটি কন্যাই এতক্ষণ পিতার রাজ্যপ্রাপ্তির আনন্দ প্রাণভরে গ্রহণের জন্য সরাবপ্যায়ী উন্মত্ত সৈনিকদের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ জেবুন্নিসা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল—কি চাও? কেন তোমরা বিনা হুকুমে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছ?

মিহর, জুবয়েৎ দুজনেই খুশীর আনন্দ জানাতে এসেছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর ক্ষিপ্তস্বরে তাদের মনের সমস্ত আনন্দ লয় হয়ে গেল। তারা এসেছিল আজকের আকস্মিক উৎসবের সমস্ত ঘটনা বহিনের কাছে গল্প করতে এবং জিজ্ঞেস করতে—বহিন্ কেন এ উৎসবে যোগদান করলে না? কিন্তু পরিবর্তে হঠাৎ বহিনের ক্ষুব্ধস্বরে—তারা হতচকিত হয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজতে লাগল।

জেবুন্নিসা আবার বলল—বল, বল, তাড়াতাড়ি করে তোমাদের আর্জি পেশ কর। আমি এখন সম্পূর্ণ একা থাকতে চাই।

মিহর ও জুবয়েৎ ভীতকণ্ঠে যা বলল তার সারমর্ম এই: পিতা শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছেন। এতদিন তাঁকে নগণ্য বলে উপেক্ষা করেছিলেন, তার জন্যে সুজা সেই সুযোগে নিজেকে 'আবুল্ ফৌজ নসির-উদ্দীন্ মুহম্মদ, তৃতীয় তৈমুর, দ্বিতীয় আলেকজান্দার, শাহ্ সুজা বাহাদুর ঘাজী' উপাধি ধারণ করে মনে মনে রাজ-সিংহাসন আকাঙ্খা করে ভেরী নিনাদে তাঁর বাহিনী নিয়ে 'ইয়া তখ্ত ইয়া তবুত্' (হয় সিংহাসন নয় সমাধি) বলে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যার সুষুপ্তি ত্যাগ করে চুণার, রোহ্তাস, বারাণসী, প্রয়াগ অধিকার করেছেন। সেইজন্যে তাঁর বিরুদ্ধে এলাহাবাদের দিকে পিতা ঔরঙ্গজেব বাহিনী নিয়ে ছুটেছেন। তা ছাড়া রাঠোরপতি যশোবন্ত সিং দারার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। দারা শিকো এখন গুজরাটের পথে।

হঠাৎ জেবুন্নিসা চীৎকার করে উন্মত্তস্বরে বলল—না, না এ অসম্ভব। কখনই এ সত্য নয়। এখনও কি আল্লার এই দুনিয়ায় ইনসাফ্ নেই? দারা, সুজা চাচার এই ভাগ্যলিপি যতই মন্দগামী হোক্ কখনই পিতা ঔরঙ্গজেব তাঁদের পদদলিত করতে পারবে না। পারবে না! যদি করে, তাহলে মোগল সাম্রাজ্যের আকাশে আর কখনও দিনের আলো প্রতিভাত হবে না। সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে হিন্দুস্তানের সমস্ত শৃঙ্খলা।

জেবুন্নিসার অত্যাধিক চীৎকারে দুই তাতার ক্রীতদাসী দৌড়ে এল। তাদের ইসারায় সরে যেতে বলে মিহর ও জুবয়েৎ কক্ষ ত্যাগ করল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে জেবুন্নিসার সন্ন্যাসিনী ভগিনী জিনৎ ও আম্মাজান মিয়াবাই ছুটে ঘরে প্রবেশ করলেন।

তখন জেবুন্নিসা চীৎকার করে ক্ষিপ্তস্বরে বলছে—আমি কি এখনও জিন্দা

আছি ? আমার কলিজায় কি এখনও পিতার শোণিত প্রবাহিত ? হে আল্লা, আমি কেন দীনা এক দরিদ্রার ঘরে জন্ম নিলাম না ? এ যে রাজার ঘরে জন্মে আমি দিওয়ানা হয়ে গেলাম ! আমি যে আর ভাবতে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত ভাবনাগুলো যে খানার মত পাক্ হয়ে দুর্গন্ধ স্বাদে পরিণত হয়েছে। '..........' হঠাৎ বলতে বলতে জেবুন্নিসা মুখমণ্ডলে তার দুই করতল স্থাপন করে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল।

মিয়াবাই ও জিনৎ তাড়াতাড়ি জেবুন্নিসার কাছে এসে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে চীৎকার থেকে নিবৃত্তি করল। জিনৎ ফিস ফিস করে বলল—এ কি করছ বহিন ? বাপজানের রোষনয়নে পড়ে বৃথা আল্লার দেওয়া শরীরকে লুপ্ত করে দিচ্ছ ! তুমি কি জান না ? আমরা শাহজাদী হয়ে মোগল রাজ্যের সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধিনী হয়ে জন্মেছি ? চোখ আছে দেখো, কান আছে শোনো, সেই কানে যদি কামানের তীব্র গর্জন প্রবেশ করে, তবু বিচলিত হয়ো না। আর অনুভবের তীর্থে যে বিচার তোমাকে দংশন করে—আল্লার কাছে প্রার্থনা কর—যেন তিনি তোমার দিলের ওপর মোগল প্রাসাদের একখণ্ড পাথর চাপা দিয়ে দেন। এখানে কান্না না, এখানে অনুশোচনা না, এখানে শুধু ষড়যন্ত্র, হত্যা আর রক্তের স্রোতে নিজের দেহ রুধিরাক্ত করে নারকীয় যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেওয়া। তুমি কি ভুলে গেলে মেরে বহিন্ ? আমার আজ আল্লা ছাড়া, খোদাতাল্লার মেহেরবাণী ছাড়া সারা দুনিয়াতে আমার আর 'আমার বলে' কিছু তো নেই। তাই কোরাণের পবিত্র ধর্মবাণী উচ্চারণ করে দিনরাত নমাজের ভঙ্গিতে আল্লাকে নিজের মনের দুঃখ জানাই। সম্রাট দুহিতা জাহানারা বেগমসাহিবার সাক্ষাৎ পেলে তাকে ধরে আমি তাঁর জুম্মা মসজিদে স্থান করে নেব। আমার সমস্ত মনের ক্লেদ সেখানে নিবেদন করে আমি শুধু দেবতাকে প্রাণভরে ডাকব। বলবো—'হে আল্লা খোদাতাল্লা, দুনিয়ার মালিক, আমার পশ্চাতের সমস্ত চিন্তাধারা তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। চিন্তাশূন্য করে দাও।'

মনে হল যেন সমস্ত অশান্তির শেষ হয়ে সমস্ত অন্ধকারের জটিল কালিমা অপসারিত হয়ে আলোর বন্যা মোগল সাম্রাজের প্রাসাদের সেই ঐশ্বর্যময় কক্ষকে অমৃতরূপ দান করল। জিনতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জেবুন্নিসা লজ্জিত হল। নিজের অসংযমী মনের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। আক্ষেপ করল। আক্ষেপের ঠাণ্ডা মিষ্টি প্রলেপ তার জ্বালাময় হৃদয়ে প্রশান্তি দিল।

তার পরের বহিন্ তার বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও যদি সংযম রক্ষা করতে পারল ; আর সে কেন অসংযমী হয়ে পড়ল ?

মিয়াবাই জেবুন্নিসার মেঘের মত সুগন্ধময় চুলের গভীরে তাঁর করপুটের আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হাত বুলোচ্ছিলেন। তিনি এবার বললেন—সারাদিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে জানের ওপর গোঁসা করে শুধু নিজেই তক্‌লিফ পেলে। এবার একটু খানা-পিনা করে নিয়ে শুয়ে নিদ্রা যাও বেটি।

জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে বলল—না, আম্মাজান। আমার তবিয়ৎ ভাল আছে। খানা-পিনার জন্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

মিয়াবাই জিভ কেটে বললেন—ছি ছি বেটি, খানা-পিনা করবে না কেন ? খানা-পিনা না করলে কি তবিয়ৎ ঠিক থাকে ? সারাদিন চলে গেল। সন্ধ্যা ভি যায় যায়। এখন খানা-পিনা সেরে একটু নিদ্ যাও। তাহলে তবিয়ৎ ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে ?

অবাক হয়ে জেবুন্নিসা নিজের কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে ঝরোখার প্রতিবন্ধকে কাটিয়ে বাইরের আকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন করল। হ্যাঁ, সেখানে অন্ধকারের হিমেল হাত পা গুলো হিল হিল করে সমস্ত দিগন্তকে ছেয়ে যেন দেহ বিস্তার করেছে। আজকের সন্ধ্যার আকাশের সেই শান্ত প্রবহমান মৃদুমন্দ বাতাসের স্নিগ্ধভাব চারদিকে তার পাখা মেলে নি—যেন মনে হচ্ছে নিবীড় কালো আলখাল্লায় ঢাকা কোন দৈত্য তার বিরাট দেহ মেলে দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলেছে। নীলাভ আকাশের সমস্ত দিক ব্যেপে সেই কালোর রূপ যেন কোন এক ধ্বংসের রূপকে ইঙ্গিত করছে। প্রকৃতির এই গম্ভীর থমথমে দৃষ্টির সামনে কোন রাজসিকতা নেই। যেন রিক্তাধরিত্রী তার দুর্ভাগ্যের কপালে কালির প্রলেপ দিয়ে নিজের কপালেই করাঘাত করেছে।

ঝরোখার ভেতর দিয়ে জেবুন্নিসা সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত নগর শাহজানাবাদের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দৃষ্টি অতদূর প্রসারলাভ করল না। সামনেই পরিখা। পরিখার পাশে গম্বুজের মিনারের তোরণদ্বারে সঙ্গীন হাতে খোজা প্রহরী। খোজা প্রহরীর পায়ের শব্দ যেন তোরণদ্বারের হর্ম্যতল ভেদ করে জেবুন্নিসার কানে আসছে। প্রাসাদের সম্মুখভাগ থেকে আর কোন শব্দ আসছে না। মনে হচ্ছে মৃতের স্তব্ধতা সেখানে। এতক্ষণ যেখানে উৎসবের ঘনঘটা ছিল, সৈনিকদের বিজয়োল্লাসের আনন্দোৎসব

চারদিকে মুখর হয়েছিল, সেখানে আর কিছু নেই। পিতা ঔরঙ্গজেব আবার তাঁর বলিষ্ঠ অশ্বারোহী, পদাতিক মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করেছেন। দিল্লী ও আগ্রার সিংহাসনকে সুরক্ষিত করবার জন্য তাঁর চিন্তার অবধি নেই। দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। তৈমুরের বংশোদ্ভূত মোগল রাজবংশের একজন শাহজাদা বেঁচে থাকা পর্যন্ত বিজয়ী ঔরঙ্গজেব আলমগীরের চোখে ঘুম আসবে না। তাই সিংহাসনে সাময়িক বসার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করতে না পেরে বসে গেলেন। সন্দেহ, যদি তাঁর পরাজয় ঘটে! যদি তাঁর মনের ঈপ্সিত ইচ্ছার পূরণ না হয়! যদি তাঁর অন্যান্য ভাইরা তাঁকে পরাজিত করে তাঁরই চোখের সামনে সিংহাসনে বসে তাঁর ঈর্ষার অলঙ্কার হয়?

মোগল সিংহাসনের এই রাজসিক বৈভবকে তুচ্ছ করে কেউ তার আকর্ষণ কাটাতে পারে নি, ঔরঙ্গজেব আবাল্য লোভের কুহক জালে পড়ে ছটফট করেছেন। তাঁর এই সিংহাসনের প্রতি.লোভ হঠাৎ নয়, সুতরাং আজকের এই নৃশংসতা বহুদিন ধরে তাঁর মনে স্তরে স্তরে বাসা বেঁধে উঠেছে।

হঠাৎ দারুণ বেগে জেবুন্নিসা মাথাটা আন্দোলিত করে পিতার চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। না, পিতার চিন্তা আর নয়। যদি তাকে বাঁচতে হয়, যদি তাকে পিতার রাজত্বে তাঁর কন্যা হয়ে থাকতে হয়, তাহলে মনের এই রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিতে হবে। মনের ওপর শিক্ষার সংস্কারে যে বিচার তাকে সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আহত করে যায়—তাকে সম্পূর্ণ হত্যা করে—সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে?

তাই হঠাৎ সে নিজের কক্ষের মধ্যে ঢুকে হাততালি দিয়ে বাঁদীকে আহ্বান করে তাকে আদেশ দিল—সরাব লে আও। আসূলি তাজা সরাব। যে সরাব পান করলে মুহূর্তে বেঁহুসী এসে চোখের দৃষ্টিতে রঙিন মৌতাতের মিঠেল খুসী এসে খেলা করে; দুঃখের সমস্ত নিঃশ্বাস তরল হয়ে শুধু বেহেস্তের হীরা, জহরত, চুনি, পান্না, রাজসিক বৈভবের কথা মনে আসে। মনে হয় পায়ের মধ্যে রক্তের সেই দুর্দমনীয় নাচের ছন্দ যেন নাচ ছাড়া কিছু জানে না। বেঁহুসী খাব্সুরত হাল্কা দেহটা বাতাসের বুকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণভরে নৃত্য করে খুসীর সপ্তমার্গে আরোহণ করতে চায়। সেইজন্যে জেবুন্নিসা হঠাৎ সরাবের কথা বলে নিজের শান্ত দেহটা গড়িয়ে দিল সুকোমল জাফরাণী মখমলের সুখস্বপ্নের গহ্বরে।

জবুন্নিসা অনেকক্ষণ চোখ বুজে সমস্ত চিন্তা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে ঘুমের ভাণ করে শুয়েছিল। মিয়াবাই ও জিনৎ কক্ষ থেকে অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। হঠাৎ কে যেন কক্ষে প্রবেশ করল। জেবুন্নিসা ভাবল, যাকে সে সরাবের স্বর্ণভৃঙ্গার আনতে বলেছিল সে বুঝি এল। সেই বাঁদীর নাম ইখ্‌তিয়ার বানু। তাই জেবুন্নিসা চোখ নিমীলিত না করে বলল—ইখ্‌তি, পাত্রে ঢেলে আমাকে সরাব পি-আও!

কিন্তু যে এসেছিল, সে ভীষণ অসোয়াস্তিতে পড়ে গেল। বাঁদী নিয়ে এসেছিল কিছু খাদ্য ও পানীয়। হাতে তার বড় স্বর্ণময় বৃহৎ রেকাব। তার ওপর স্বর্ণময় বাটিগুলিতে সুখাদ্য সব থরে থরে সাজানো। বাদশাহী খানাঘরে দিনরাত দুনিয়ার সেরা সেরা মুখরোচক সব খাদ্য বানানো হচ্ছে। বানাচ্ছে সেরা সেরা সব খান্‌দানী বাবুর্চি। তাদেরই হাতের খানার চেহারা দেখলে রসনা তীব্র হয়ে যায়। জেবুন্নিসার জন্যে সে সব রাজসিক আহারের এক অংশও আসে নি, এসেছে সামান্য লঘু আহার। মিয়াবাই সন্তানের স্নেহে আপ্লুত হয়ে খানাঘরে আদেশ দিয়েছেন সামান্য লঘু আহার জেবুন্নিসার আহারের জন্য পাঠিয়ে দিতে। তাই নিয়ে এসেছে বাঁদী। বাঁদীর অসোয়াস্তি সে জন্যে নয়, সে এসেছে হঠাৎ আচমকা শাহজাদীর কক্ষে। বাইরে থেকে কোন এত্তেলা না দিয়ে আসার জন্য জেবুন্নিসা ক্ষুব্ধ হতে পারে—এই তার ভাবনা! তা ছাড়া শাহজাদীর দুধের মত শুভ্র রাজসিক সালোয়ার-গোলাপী বর্ণ তুলতুলে পায়ের কিছু অংশ অনাবৃত করেছে, দেখা যাচ্ছে সুন্দর দুটি পায়ের মৃণাল বাহু ভঙ্গিমা। হয়ত কোন পুরুষের চোখ পড়লে সে লোভাতুর হয়ে উঠত, কিন্তু বাঁদী পুরুষ না হয়েও সে চোখ রাখতে পাচ্ছে না শাহজাদীর অপরূপ সুন্দর গোলাপীবর্ণ নরম পায়ের সৌন্দর্যে। বাঁদীর আরো ভয় শাহজাদী যদি বুঝতে পারে যে বাঁদী এতক্ষণ তার অঙ্গের অনাবৃত অংশে দৃষ্টি স্থাপন করে লোভাতুরা চোখের রসনাকে ধারাল করেছে, তাহলে তার গোঁসা হবে—হয়ত এইজন্যে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উজীরকে তলব করে বাঁদীকে তার হাতে সঁপে দিতে পারে; কিম্বা ঘাতককে আদেশ প্রদান করতে পারে—এখুনি এই মুহূর্তে এই বেয়াদপ বেতমিজ বাঁদীর চক্ষু দুটি উৎপাটিত করে নেও।

বাঁদীর যখন শরীরে থর থর করে কাঁপুনি শুরু হয়েছে সেই সময় ইখ্‌তি-বাঁদী এক নিম্নশ্রেণীর তাতার নারীর সাহায্যে বৃহৎ এক স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ সরাবের পাত্র ও তার সঙ্গে পানপাত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হল। ইখ্‌তি

শাহজাদী জেবুন্নিসাকে খুব বেশী ভয় করে না। কারণ জেবুন্নিসার অনেক গোপন ব্যাপার ইখ্‌তি জানতো এবং সেইজন্যে ইখ্‌তির বেয়াদপি একটু জেবুন্নিসা সহ্য করত।

বাঁদীর অবস্থা ইখ্‌তি, জেবুন্নিসার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে মুচ্‌কি হাসল। হাজারো বাতির অপরূপ জোরালো আলোর অসামান্য দ্যুতির মাঝে জেবুন্নিসার দুটি অনাবৃত সুন্দর মৃণাল বাহু যেন কি এক অপরূপ রত্নের শোভা করেছে। ইখ্‌তি বাঁদীর হাত থেকে স্বর্ণময় রেকাবটি নিয়ে তাকেও তাতার রমণীকে কক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে বলল। তারা চলে যাবার পর জেবুন্নিসার পালঙ্কের সামনে একটি সুদৃশ্য টেবিল নিয়ে এসে ইখ্‌তি তার ওপর খাদ্য ও পানীয়ের রেকাব ও রক্তবর্ণের তাজা খুসবাই সরাবপূর্ণ স্বর্ণময়ভৃঙ্গার রাখল। স্বর্ণপাত্রে সরাব ঢেলে ইখ্‌তি তার সৌরভের আঘ্রাণ গ্রহণ করে চোখ বুজিয়ে তার মৌতাত নিল, তারপর আস্তে আস্তে জেবুন্নিসার মৃণাল বাহুতে আলতো ছোঁয়া দিয়ে ডাকল : 'মালেকা, সরাবপূর্ণ পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছি, মেহেরবাণী করে তকলিফ্‌ না করে পান করুন!'

জেবুন্নিসা হঠাৎ উঠে বসল, চোখ দুটো ভাল করে মর্দন করে তারপর সামনে তাকিয়ে খুসী হয়ে ইখ্‌তিকে বলল—'মালেকার দিলের মধ্যে যে সব দ্রব্য চাইছিল, তুই তার আয়োজন করেছিস্‌ বলে তোকে আমি ইনাম দেব। কী ইনাম ফরমাইস্‌ ইখ্‌তি?'

ইখ্‌তি খুসী হয়ে মাথা নেড়ে বলল : কিছু না। তারপর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক্‌ এনে বলল : মালেকার পেয়ারের গুলাবী আতরের খস্‌বু পেলেই বাঁদী খুসী!

জেবুন্নিসা সরাবপূর্ণ স্বর্ণপাত্রটা মুখে তুলে চোখে অসামান্য খুসীর বাদশাহী চমকতুলে বলল : আচ্ছা। বহুৎ খোদার মেহেরবাণী ইখ্‌তি। তোকে ইনাম আমি দেব, আমার কণ্ঠের মুক্তহার। যেটা পিতা আমায় তাঁর হারজিতের খেলায় দান করেছিলেন। এই বলে খুসী হয়ে জেবুন্নিসা সরাবপূর্ণ স্বর্ণপাত্র মুখে তুলে নিঃশেষ করল। তারপর আরো পাঁচ, ছ'বার পাত্র নিঃশেষ করে নেশায় জেবুন্নিসার সুন্দর ডাগর চোখ দুটি রক্তিম হয়ে উঠলে জড়িতকণ্ঠে বলল : ইখ্‌তি, বলতে পারিস্‌ এমন তাজা বেঁহুসী পানীয় থাকতে আমরা দিল্‌ বিগড়ানো দুশ্চিন্তার নাগপাশে হারিয়ে যাই কেন?

ইখ্‌তি কোন উত্তর দিল না। সে জানে তার মালেকা এইরকম

বাতচিজ আওড়ায় যখন সরাবের মৌতাত চোখের তিমিরে রঙের বেঁহুশী ছড়ায়।

জেবুন্নিসা আরো কয়েকপাত্র সরাব পান করে ফিস ফিস করে ইখ্‌তিকে বলল: 'বাঁদী, পিতা কি একটিও মরদ প্রাসাদের কোন জায়গায় আরামের জন্য রেখে যান্‌নি?'

ইখ্‌ত্রি মৃদু হেসে বলল: আছে, কিন্তু মালেকা সে সব মরদ সম্রাট ভগিনী রোশোনারার হেফাজতে।

: কি বললি? রোশোনারার হেফাজতে? জেবুন্নিসা হঠাৎ বিদ্যুৎপিষ্টের মত পালঙ্ক থেকে নেমে এসে কক্ষের হর্ম্যতলে দাঁড়াল। কিন্তু সরাবের নেশায় তখন তার সমস্ত শরীর টলমল। বিশ্বসংসার যেন শাহজাদীর চোখের সামনে দুলছে। চোখ দুটি নেশার ঝোঁকে অর্ধনিমীলিত। অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে হঠাৎ সে আবার চীৎকার করে উঠল: রোশোনারা! আমার পিতার ভগিনী। সে চায়, ঔরঙ্গজেব আলমগীরকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজঅন্তঃপুরের একাধিপত্য? তাই সে সম্রাট শাহজাহানের হাত থেকে হিন্দুস্তানের ন্যায়দণ্ড কেড়ে নিয়ে, বেগমসাহিবা জাহানারার খেতাবে ঈর্ষান্বিতা হয়ে তার শয়তান ভাইকে ভর করে নিজের ভাগ্য তৈরী করে নিয়েছে! জেবুন্নিসা আবার দম নিয়ে বলল—'আচ্ছা, তোমার পেয়ারী ভাই ঔরঙ্গজেব তোমাকে কতদিন ইন্তেজার করে দেখব। দেখব, রোশেনারা তোমার শক্তি কত?' হঠাৎ জেবুন্নিসা হি-হি করে পাগলিনীর মত হেসে উঠল। তারপর ধপাস্‌ করে হর্ম্যতলে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে গেল।

ইখ্‌তি-বাঁদীর সাহায্যে তার মালেকাকে পালঙ্কে শুইয়ে সমস্ত পাত্র কক্ষ থেকে বের করে দিতে বলে দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করল।

পড়ে রইল জেবুন্নিসা একা সেই কক্ষে। রাত্রি এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। নিঃঝুম রাত্রি। তিমির বিভাবরী। কাকপক্ষী অবধি ঘুমে অচেতন। কালো আবলুষ রাত্রি। আকাশের দিকচক্রবালে অসংখ্য তারার মেলা। হীরা, জহরতের ঔজ্জ্বল্যের মত নক্ষত্ররাশি জ্বলছে দিল্লীর রাজপ্রাসাদের মাথার ওপর। যেন জলদ-গম্ভীর অট্টহাস্য দূরে বহুদূরে উৎকট ধাতব ঝঙ্কারের মত বেজে বেজে বাদুড়ডানা কালো আবলুষ নৈশ-দিল্লীর প্রাসাদের নীরবতা খান্‌ খান্‌ করে দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে দিল দিক্‌চক্রবালে।

আজকের বিশেষ রাত্রিটি সম্বন্ধে নবীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীর বিশেষ

ব্যবস্থা করে গেছেন। রাত্রির অন্ধকারের কালো মসীলিপ্ত গহ্বরের মধ্যে গোপনস্থানে কয়েক সহস্র সৈন্য তরবারী তুলে প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে। কারণ ঔরঙ্গজেব জানেন, তিনি দিল্লী ত্যাগ করলেই তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাসাদ অবরোধ করে তাঁর পরাজয় ডেকে আনতে পারে ; সেইজন্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রাসাদের বাইরে গোপনস্থানে অপেক্ষায় রেখে রোশেনারাকে দিয়েছেন প্রাসাদ রক্ষার ভার। তবে ভগিনী রোশেনারা জানেন না, যে প্রাসাদের বাইরে প্রাসাদ রক্ষার ভার আর এক শক্তিশালা বাহিনীর। এমন কি সে বিদ্রোহিনী হলেও এই বাহিনী তার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। নবীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব সেই আদেশই এই বাহিনীকে দিয়ে গেছেন। ঔরঙ্গজেব কাউকেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন না।

ঔরঙ্গজেবের ভয় সবদিকে। কিন্তু আল্লার অভিপ্রেত তাঁকে সিংহাসনে বসাবার। তাই শত অমঙ্গল অশরীরি প্রেতাত্মা দিল্লী ও আগ্রার প্রাসাদের অলিন্দের অন্ধকার গলির মধ্যে ঘুরে ঘুরে জীবিত মানুষের প্রাণহানি করবার চেষ্টা করলেও তারা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। জগতের অনেকদূরে যে মানুষের শক্তিনিয়ন্তা হয়ে বসে সমস্ত কৌশল নিজের হাতে ধারণ করে মানুষকে চালাচ্ছেন, সেই আল্লা নিষ্ঠুর, নৃশংস, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড-হত্যাকারী মোগল সাম্রাজ্যের দম্ভের সিংহাসনের ধ্বংসের ধ্বংসীকে অপরূপ এক শয়তান বেশে মোগল শাহজাদারূপে পাঠিয়ে দিল্লী ও আগ্রার প্রাসাদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে আরম্ভ করেছেন।

কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ঘন কৃষ্ণ ছায়ারাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে রাতের অন্ধকারে যেখানে প্রাসাদের অত্যুজ্জ্বল আলো পড়েনি, সেখানে পাষাণ প্রস্তরের হর্ম্যতলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও সেই কুণ্ডলী ছায়ারাশির মধ্যে স্পষ্ট কালো ছায়া মূর্তি। কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ। একটি ছায়ামূর্তি নয়, এমনি অনেক। ছায়ামূর্তি-গুলির একমাথা কালো ঘনকৃষ্ণবর্ণ চুলের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভাঁটার মত অগ্নিময় ক্ষুধিত চোখ। রক্তের দৃষ্টি সেই ছায়ামূর্তিগুলির চোখে। রাতের অন্ধকারে তারা ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে এসে প্রাসাদ অলিন্দের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ওৎ পেতে থাকে, তারপর দিনের আলো পূবগগনে আস্তে আস্তে রঙের তুলি বুলোলে তারা চলে যায়। চলে যায় ঐ আকাশে মেঘের সমারোহে। মেঘের মধ্যে তারা ঢুকে ডেকে আনে ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ চমকায়, অগ্নির লেলিহান শিখা

জেগে ওঠে, সমস্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্যে প্রবল ঝটিকাপ্রবাহ আকাশ বাতাস মথিত করে জেগে ওঠে। ভীষণ ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সম্রাট আকবরের স্বপ্ন—তৈমুর বংশের ছত্রাধীনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বিলীন করে দেবার চেষ্টা করে।

না, এ-সব চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতে গিয়ে আজকের নবীন সম্রাট তাঁর পেয়ারী ভগিনী রোশোনারার মহলে যেতে হবে। আজকে সেই শাহজাদী রোশোনারা দ্বিতীয় সম্রাট। রাজঅন্তঃপুরে একাধিপত্যের সিংহাসনে শ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী। পিতা তাঁকে যে আসন দেন নি, ভ্রাতা তাঁকে সে আসনে বসিয়েছেন। ভ্রাতা দিয়েছেন সম্মান, মর্যাদা তাই তার আজকে খুসীর শেষ নেই।

পিতা শাহজাহান বন্দী হবার পর, জ্যেষ্ঠা ভগিনী জাহানারা পিতার স্নেহ-পাশেই থেকে গেছেন। রোশোনারা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, শিবিকায় চেপে একেবারে ঔরঙ্গজেবের কাছে। ঔরঙ্গজেব বহিন্‌কে সমাদর করেছেন। তার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন। এবং সসম্মানে নিয়ে গিয়ে তুলেছেন দিল্লীর প্রাসাদে। আজ সেই দিল্লীর রাজঅন্তঃপুরের সমস্ত দরজার চাবী নিজের হাতে নিয়ে রোশোনারা দিল্লীর তোষাখানার সমস্ত দৌলতের বাহারের ছটার মধ্যে সবচেয়ে চমকদারী এক মহলে নিজেকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করেছেন।

জগতে যে দিল্লীর বেগমমহলের বাহার অপরূপ বলে প্রসিদ্ধ—তেমনি একটি কক্ষের মধ্যে ডিভানে নগ্ন দেহের ওপর একটি পাতলা মসলীনের রেশমী ওড়না ঢাকা দিয়ে অর্ধশায়িতভাবে বাঁদীর হাত থেকে সরাবের পাত্র মুখে তুলে চলেছেন রোশোনারা। গোলাপীদেহের সমস্ত নগ্নতার সৌন্দর্য ঐ পাতলা মসলীনের রেশমী ওড়নার আড়ালে ঢাকা না পড়ে আরো ভয়ঙ্কর ও চক্ষুপীড়া-দায়ক হয়ে উঠেছে। সামনে কয়েকটি অর্ধনগ্ন নর্তকী। তাদের কোমরে এক খণ্ড করে স্বর্ণময় পীতবর্ণ ও লোহিতবর্ণের ঘেরাটোপ্। বক্ষবাস তাদের উন্মুক্ত। শুধু একখণ্ড করে গোলাপী মসলীনের টুক্‌রো দিয়ে কাঁচুলির মত বক্ষের উত্তালতাকে গোপন করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গোপন না হয়ে আরো সমুদ্রউত্তাল হয়ে উঠেছে। মাসুম লেড়কীর বক্ষ-সৌন্দর্যের হাট যদি কেউ দেখতে চান তাহলে এই মুহূর্তে রোশোনারার মহলে গিয়ে দেখে এলে চমৎকৃত হবেন।

আর রোশোনারার কথা না বলাই বাহুল্য। কারণ সম্রাট শাহজাহান

নিজে সুন্দর, তাঁর মমতাজবিবি ছিলেন একটি সুন্দরের প্রতীক। তাঁর কন্যাদের মধ্যে চার কন্যাই ছিল অপরূপ সুন্দরী। আর্জ্জুমান-আরা, গেইতি-আরা, জাহানারা, রোশোনারা। প্রথম দুটির জীবন বেশীদিন মোগল রাজ-পরিবারের আদরযত্ন ভোগ করেনি তবে তারাও অদ্ভুত সুন্দরী ছিল। অবশ্য বর্তমানে দুটিকে দেখে তাঁদের জননীর গর্ভের প্রশংসা করতে হয়।

পৃথিবীর সেরা সেরা ঐশ্বর্যের দ্যুতির মধ্যে রত্নালঙ্কারে ভুষিত ডিভানে রোশোনারা অর্ধশয়ন করেছিলেন, তাঁর নগ্ন দেহের ওপর পড়েছে হাজারো ঝাড়ের অপরূপ আলো। সেই আলোর দ্যুতি দর্পণে পড়ে আলোর বাহার কক্ষের চারদিকে হলুদবর্ণের এক সোনার রঙ দান করেছে। নতকীরা তাদের মৃণাল বাহু উত্থোলন করে নাচছে। তাদের যৌবনের সমস্ত বর্ণাঢ্য সেই নাচের তালে তালে মোগল হারেমের পাষাণ হর্ম্যতলে মৌতাতের সুর ছড়িয়ে চলেছে। কক্ষের মধ্যে বহুমিশ্রিত গন্ধের মাতন। লোবান ও গুলাবের মিশ্র-গন্ধে কক্ষটি সুগন্ধিত ও আকুলিত। তা ছাড়া আছে, কক্ষের খিলানে খিলানে পুষ্পস্তবক। বেলা, চামেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ—নানাজাতের ফুলের সুগন্ধ ও বাহার।

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ। দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। রাজপ্রাসাদমালার অপরূপ কারুকার্য সারা পৃথিবীতে ছিল না। তার ওপর অন্তঃপুর ও রংমহল। যেন ঠিক কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য। গৃহ সব বিচিত্র। গৃহসজ্জা বিচিত্র। অন্তঃপুরবাসিনী সব বিচিত্র। এমন রত্নখচিত, ধবলপ্রস্তর নির্মিত কক্ষরাজি আর কোঁথাও নেই। উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভার গর্বখর্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নেই। এত ভোগ-বিলাসও কোথাও দেখা যায় না। এত মহাপাপও।

তাই আজকে রোশোনারার বিলাসকক্ষের মনোহর আনন্দ অবগাহনের মত বুঝি পৃথিবীতে আর কোনদিন এমনি আনন্দের শুভক্ষণ আসেনি। ডিভানের পাশে বিবিধপাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর-গোলাপ, সুগন্ধি যত্নেপ্রস্তুত তাম্বুলের রাশি। এই তাম্বুলের রক্তরসে অধর রাঙানো মোগল আওরতদের একটি বিলাস। রোশোনারার চোখের মেদুর দৃষ্টিতে সরাবের মৌতাত। অর্ধশায়িতভাবে ডিভানে আড় হয়ে বাঁদীর হাত থেকে স্বর্ণপাত্র গ্রহণ করে মুখে ঢেলে চলেছেন। মাঝে মাঝে মুখে রক্তাক্ত

কাশ্মীরের রক্ত আঙ্গুরের এক একটি গুবক ধরা হচ্ছে, রোশোনারা তাঁর দম্ভের রাজসিক দেহ এতটুকু না নড়িয়ে বাঁদীর হস্তস্থিত ঝুলন্ত আঙ্গুরের গুবকের এক একটি রসাক্ত রক্ত-আঙ্গুর তাঁর শুভ্রদাঁতের পংক্তি দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছেন। যখন পাচ্ছেন না, তখন চীৎকার করে বাঁদীকে অশ্রাব্যভাষায় তিরস্কার করছেন—বেসরম, বেল্লিক ; নিকালো হিঁয়াসে ! আবার মুখে ঠিকমত পড়লে খুসী হয়ে বলছেন—বহুৎ সুকৃরিয়া !

হাজারো ঐশ্বর্যের চমক লাগানো রোশনাই রোশোনারার বিলাসকক্ষে। রোশোনারা যে বহুদিন ধরে দিল্লীর রংমহলের এই কক্ষটি নির্বাচন করে রেখে-ছিলেন আজকের হঠাৎ তাঁর এই কক্ষের মধ্যে নিজের বিলাসকক্ষ তৈরীর ব্যবস্থাই তার প্রমাণ। এমন আশ্চর্য কারুকার্যময় কক্ষ আর দুটি নেই এই দিল্লীর রাজসিক প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সম্রাট শাহজাহান বহু অর্থ ব্যয় করে এই কক্ষের সৌন্দর্য বর্ধিত করেছেন। সোনার চকমকি দিয়ে মুড়ে হীরের টিপ বসিয়ে পান্না, চুনির নক্সা গেঁথে স্থানে স্থানে স্বর্ণপাত্রে দীপাবলীর বাহার দিয়ে সহস্র রঙের তুলি বুলিয়ে বিলাস কক্ষের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন।

যেন মনে হয় মাসুম, আওরতের দেহে প্রথম পুরুষের ছোঁয়াচের সুখানুভব দিয়ে এই কক্ষের সৌন্দর্য বর্ধিত করা হয়েছে।

সারেঙ্গীতে মধুর সুরের মধ্যে নর্তকীর পায়ের মৃদুল ছন্দ হৃদয়ের কুসুম-তীর্থে রক্তের মধ্যে আগুন জ্বালায়। উপস্থিত রমণীরা নিঃশব্দে যে যার কাজ করে চলেছে। প্রত্যেকের মুখেই শঙ্কার ছাপ। কারণ গর্দান যাওয়ার আশঙ্কা। নবীনা কর্ত্রী নতুন ক্ষমতা কখন প্রকাশ করে বসবেন তার, ঠিক কি ? মেজাজের যে দারুণ বুদ্বুদ চারদিকে তার রেশ ছড়িয়ে চলেছে তাতে নবীনা কর্ত্রী যে কোন সময় ফেটে পড়তে পারে বলে মনে হয়। এর মধ্যেই একটু বানচাল হলে চীৎকার করে মুখভঙ্গি যা করছেন, তাতে শাহজাদী না হয়ে যদি খানাঘরের কোন পাচিকা হত, তাহলে তাকে অবিলম্বে দোস্তাকের পথে পাঠিয়ে দিলে তবে রাগ যেত। কিন্তু উপায় নেই। ইনি রোশোনারা। এঁরই চক্রান্তে সম্রাট শাহজাহান নিজের কক্ষে বন্দী হয়েছেন। এঁরই চক্রান্তে শাহজাদা দারা, সুজা, মুরাদ, মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজপুরুষরা মাটির গহ্বরে চলে যাবে। তারই সঙ্কেত বাতাসে বাতাসে। দিল্লী ও আগ্রার সমস্ত আকাশে বাতাসে। সমস্ত হিন্দুস্তানের হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা, রাজপুত সমস্ত জাতি এই রমণীর অদ্ভুত মনের পরিচয়ে স্তম্ভিত। তাঁকে ভয় করবে না

সামান্য বাঁদী? পাখীর মত ছোট্ট এতটুকু কলিজা নির্ভর করে যারা রাজঅন্তঃপুরে ভয়ে ভয়ে বাস করে!

শাহজাদীরা সরাবের নেশায় চিরঅভ্যস্তা। তার চেয়ে রোশোনারা একটু বেশী অভ্যস্তা ছিল। রক্তের মত গোলাবী তাজা, আগুনের মত বুকের কোমল আস্তরণ পুড়িয়ে খাক্ করে দেয় এমনি জ্বলন্ত সরাবের পাত্র দিনরাত নিঃশেষ করে নিজেকে প্রকৃতস্থ রাখা রোশোনারার ক্ষমতায় ছিল। তাই একনাগারি স্বর্ণপাত্রপূর্ণ করে বহু সরাবের পাত্র নিঃশেষ করে যখন বেশ একটু নেশার মত হয়েছে। রোশোনারার রোশনাই জ্বালা চোখে নেশার মিঠে খসবু, তাঁকে আজকের বিশেষ উপলক্ষ্যে আরও খুসীর সপ্তমার্গে পৌঁছে দিয়েছে। সেই সময় হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণকণ্ঠে—খাঁমোশ! জুতি মারকে সব নিকালিয়ে!

সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল নর্তকীর দল। সারেঙ্গী থেমে গেল। এসরাজের মৃদু ঝঙ্কার তখনও তারের বুকে সুরের রেশ ধরে রেখেছিল, শুধু তার শেষ-সুরের রেশটি নিস্তব্ধ কক্ষে ঘুরতে লাগল কিছুক্ষণ। ভীত ত্রস্ত মেয়েগুলি নাচতে নাচতে থমকে গিয়েছিল, এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। তারা তাকিয়েছিল নবীনা কর্ত্রীর মুখের ওপর—পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় কক্ষের সমস্ত প্রাণী।

রোশোনারা দেহের ওপর থেকে দামী মসলীনের ওড়নাটা নীচে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আরো দুপাত্র সরাব পান করলেন। তারপর আবার মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে ডাকলেন—কুলসম, মরদ লে আও!

কুলসম রোশোনারার খাস-বাঁদী। পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোশোনারার পরবর্তী হুকুমের প্রত্যাশা করেছিল। তা ছাড়া, ও জানে শাহজাদী রোশোনারা এর পর কি বলবেন? তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে শাহজাদীর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিল।

কিন্তু শাহজাদী রোশোনারা নেশার খেয়ালে কুলসমকে দেখতে পেলেন না। কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে আবার নেশার ঝোঁকে চীৎকার করে বললেন—ওরে হারামজাদী কুলসম, শূওর কা বাচ্ছা, কানের মাথা খেয়েছিস্? হাম্‌রা মরদ কাঁহা?

আর বিশেষ উপাদেয় খানার প্রয়োজন নেই। বদহজম হবার সম্ভাবনা। তাই কুলসম রোশোনারার সামনে গিয়ে কুর্ণিশ করে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুমিষ্টস্বরে বলল—'মালেকা, মরদ লে আনে গা!

রোশোনারা চোখের কোণ দিয়ে কুলসমকে দেখে বললেন—আমার ভাইজান আমার জন্যে প্রাসাদে খাব্‌সুরত মরদ মজুত রেখে গেছে, সেগুলি নিয়ে আয়!

কুলসম 'যো হুকুম' বলে কুর্ণিশ জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

পরক্ষণেই আবার চীৎকার করে রোশোনারা বললেন—আরে আরে বুদ্ধুর দল! আমার 'মু' দেখে তোদের কি হবে? ভাগ্‌ হিঁয়াসে।

হুড়মুড় করে কক্ষের সমস্ত মেয়েগুলি এক নিমেষে অন্তর্হিত হল। শুধু যে রোশোনারাকে সরাব বিতরণ করছিল সে তার কার্য একই নিয়মে চালিয়ে গেল।

সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষ। স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে ধরা সুন্দর সুন্দর আলোর বর্তিকা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কক্ষের চারদিকে দর্পণের সারি। তার ওপর আলোর ছায়া পড়ে আরো আলোর প্রকাশ চারদিকে ঝক্‌মক্‌ করছিল। তাছাড়া দর্পণের আশেপাশে স্ফাটিকাধারে অসংখ্য চঞ্চুলোজ্জ্বল আলোক-রাশি। লোবান ও গুলাবের মিশ্রিত সুগন্ধ, তার ওপর আতরের খসবু।

রোশোনারা হঠাৎ স্বর্ণপাত্র বাঁদীর হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে হর্ম্যতলের ফরাসের ওপর ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—সেই আহাম্মক, বেল্লিক কুলসম আর কত দেরী করবে বলতে পারিস? মরদ আনতে কি তাকে আগ্রায় পিতা শাহজাহানের বন্দীকক্ষ পর্যন্ত যেতে হয়েছে?

এই সময় কক্ষের মধ্যে নিঃশব্দ কুলসম প্রবেশ করল, তার পিছু পিছু পাঁচ ছজন সৈনিকপুরুষ। কুলসম তাদের নিয়ে একেবারে রোশোনারার ডিভানের সামনে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করল। রোশোনারা ভাল করে চোখ টেনে কতকগুলি পুরুষমুখ অবলোকন করে লজ্জায় রক্তিম হয়ে তাড়াতাড়ি কুলসমকে বললেন—এই বাঁদী, আমার কাপড় কই!

কুলসম বুঝতে পেরে মুচকি হেসে তাড়াতাড়ি পাশে রক্ষিত রোশোনারার পোষাকের এক অংশ রোশোনারার দেহের ওপর চাপিয়ে দিল। রোশোনারা খুসী হয়ে বাঁদীর হাত থেকে স্বর্ণপাত্রপূর্ণ সরাবী গ্রহণ করে পান করে নওজোয়ান সৈনিক পুরুষগুলির দিকে তাকালেন। তারপর কুলসমকে বললেন—ওদের এক এক করে আমার চোখের সামনে নিয়ে আয়।

মরদগুলি সবই সৈনিক। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধ করতে যাবার সময় প্রাসাদ

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকটি নওজোয়ান সৈনিক রেখে গেছেন। কুলসম তাদের' মধ্যে কটিকে ভাওতা দিয়ে শাহজাদী রোশোনারার কক্ষে নিয়ে এসেছেন। প্রথমে তারা কিছু বুঝতে পারে নি। হতবুদ্ধি হয়ে রোশোনারাকে দেখছিল। হঠাৎ তাদের এক এক করে রোশোনারার সামনে হাজির হতে বলতে তারা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কিন্তু উপায় নেই, তারা এও জানে যে তারা যাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টিতে সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে, সুতরাং তাদের মত কটি নগণ্য সৈনিকের জীবন তো ছার!

রোশোনারা তাঁর সরাবী ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে সব কটি মরদ সৈনিকের মুখ এক এক করে পরীক্ষা করলেন, তারপর চীৎকার করে কুলসমকে বললেন—বিলকুল ঝুটি হ্যায়। এ লোককো লাথ্ মারকে নিকাল দেও!

বলার সঙ্গে সঙ্গে কুলসম সেই সৈনিকদের ইসারা করল, সঙ্গে সঙ্গে তারা দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারা চলে যেতেই হঠাৎ রোশোনারা টলতে টলতে ডিভোনের ওপর উঠে বসে চীৎকার করে বললেন—কুলসম, আমাকে পোষাক পরিয়ে দে। শয়তান দারাশিকোর বেটি জানীকে আনতে বল্। তার সঙ্গে একখানা আসলি চাবুক নিয়ে আসবি।

কুলসম বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বুঝে তার মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে বাঁদী,—হুকুম তামিল করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। তাই সে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটল প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য।

মিনিট কয়েকের বিলম্ব। তারপর দেখা গেল দিল্লীর প্রাসাদের নিস্তব্ধতা রমণী-আর্তনাদে খান্ খান্ হয়ে প্রাসাদের বাইরে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে অন্ধকার দিল্লী নগরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাদশাহী রংমহলের সবচেয়ে রাজসিক কক্ষে ভারতসম্রাট শাহজাহানের সরাবী মাতাল বেহুঁশী কন্যা শাহজাদী রোশোনারা তাঁর মনের আক্রোশে নিজের হাতে শক্তচামড়ার চাবুক ধরে তাঁরই জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাগ্যাহত দারাশিকোর কন্যা জাহনজেব বানু ওরফে জানীকে কক্ষের হর্ম্যতলে লাথি মেরে ভূতলশায়ী করে হাওয়ার বুকে চাবুক ঘুরিয়ে কোমল মেয়েটার বুক, পিঠ রক্তাক্ত করছেন। কেউ ধরবার নেই, সবাই আছে কিন্তু সবাই স্থবির। যেই ধরতে যাবে তারই সর্বশরীর চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যাবে।

সরাবী মাতাল বেহুঁসী শাহজাদী রোশোনারার গোলাপীবর্ণের সুকোমল দেহের খাঁজে খাঁজে চিকচিকে ঘামের বিন্দু জেগে উঠেছে। পরিশ্রমে তিনি হাঁফাচ্ছেন। আর দারার কন্যা জানী হর্ম্যতলে ভূতলশায়ী হয়ে এতক্ষণ চিল চীৎকার করছিল কিন্তু অনেক প্রহারের পর তার দেহ অচেতন হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। গোলাপীদেহে নীলের সমারোহ। চাবুকের রক্ত-আকর দেহের খাঁজে খাঁজে। সদ্য পাওয়া যৌবনের পুষ্পকোরকে নিষ্পেষণের জ্বালা। উঃ সে যে কি সাংঘাতিক!

রোশোনারা রক্তাক্ত চাবুকটা সপাৎ করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ডিভানে বসে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—এমনি করে যদি তিন বেগম, খৃষ্টানিউদিপুরি, বিধর্মী হিন্দু রাণাদিল ও শয়তানি আত্মীয়া নাদীরাকে প্রহার করতে পারতুম তাহলে আমার রাগ যেত। তা না পেরে নাদিরার বেটিটার ওপরই সমস্ত আক্রোশের জ্বালা নিঃশেষ করে দিলাম। আল্লা যদি মেহেরবান হয় নিশ্চয় তাদেরও তিনি উপযুক্ত সাজা দেবেন।

কেউ কোন বাধা দেয়নি। কেউ রোশোনারার কর্তৃত্বের সমালোচনা করেনি। কিন্তু রাতের গোপন নিস্তব্ধ নিথর মহলে মহলে অভিসারিকা শাহজাদীদের কানে কানে সংবাদ পৌঁছতে আর বেশী বিলম্ব হয় নি। রাতের এই নিস্তব্ধ প্রহর রজনীতে আকাশের নক্ষত্রের মায়ামোহ বিস্তারের মধ্যে সরাবের হলাহল অন্তঃপুরের মধ্যে শুধু বেহুঁসী জীবনের উৎসবকেই উপলক্ষ্য করে; তাই এরাত্রে রমণী যাঁরা দিল্লীর হারেমে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে মখমলের সুকোমল শয্যায় তাদের দেহ এলিয়ে রেখেছেন, তাঁদের ঠোঁটে আছে গোলাবী সরাবী পানপাত্র। তাঁরা শুনলেন, শুনে তাম্বুলরাঙা অধর শুভ্র দন্ত-পংক্তি দিয়ে চেপে ধরলেন। আর চীৎকার করে বিজাতীয় স্বরে বাঁদীকে বললেন—'আউর সরাব লে আও।' সরাবের রঙীন খসবুর নেশায় তাঁরা ভুলে যেতে চান সমস্ত অত্যাচারের পৈশাচিক তাণ্ডব।

জুম্মা মসজিদের গম্ভীর চূড়ায় অন্ধকারের বীভৎসতাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়ে পেঁচা চিঁ চিঁ করে চীৎকার করে অমঙ্গল প্রতিবাদ দিল্লীর নিস্তব্ধ প্রান্তরে ছড়িয়ে দিল। কারা প্রাচীরের বাইরে অশরীরি আত্মা মরণ যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে চলল নিঃশব্দে। তাদের কান্না চাপা পড়ে যায়, চাপা পড়ে যায় রংমহলের আনন্দের হট্টগোলে। রংমহলের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীতের ঐক্যতান মহলের ঐশ্বর্যের রোশনাইয়ের মাঝে আরো জমাট হয়ে আরো

খুসীর স্রোত বইয়ে দেয়। রক্তের সুপ্ত স্রোতে হঠাৎ আলোড়ন উঠে দারুণ ক্ষিপ্ত করে তোলে। নর্তকীরা হঠাৎ মাতাল হয়ে চটুল হয়ে ওঠে; তখন তারা নাচের মুদ্রা ভুলে গিয়ে যৌবনের উপাচার মেলে ধরে উত্তাল হয়ে ওঠে। লাখো লাখো মাসুম লেড়কির মনের আকুতি এই রাতের তিমিরে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ইচ্ছার আগুনে পুড়ে মরে। কেউ কেউ এমনি সময় তার কুমারী মনের সমস্ত গোপনতা উন্মোচন করে হাতছানি দিয়ে দয়িতকে আহ্বান করে।

মোগল অন্তঃপুরের বেগম মহলের মধ্যেই এই যৌবনের লীলাচাপল্য সারারাত তার খুসীর সঙ্গীতের তান ছড়ায়; অন্যমহলে এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। মোগল হারেমের জেনানা মহলেই যত আগুন।

ঔরঙ্গজেব এখন চলে গেছেন যুদ্ধে। নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে তাঁর শক্তিশালী বাহিনা। এমন কি সম্রাট শাহজাহানের যে বাদশাহী ফৌজ তাঁর রক্ষার্থে সর্বদা নিযুক্ত থাকত আজ নবীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব করায়ত্ত করেছেন। সবই গেছে নবীন সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধার্থে। এখন আছে শুধু জানানা মহল। বাঁদী, নর্তকী, বেগম ও ফুস্‌লে আনা খাব্‌সুরত আওরৎ। আর আছে ঔরঙ্গজেবের কন্যারা। সেই সবেরই প্রধান কর্ত্রী শাহজাদী রোশোনারা। তাই রোশোনারার দোর্দণ্ড প্রতাপ। তিনি ভাবেন, তিনি এখন যা করবেন তারই নাম আইন, তারই নাম বিচার।

জেবুন্নিসা সরাবী নেশায় বুঁদ হয়ে নিজের কক্ষে পালঙ্কের ওপর অচেতন হয়ে বেহুঁস হয়েছিল। রাত্রি যখন অনেক, তখন হঠাৎ তার বেহুঁশী ভাব কেটে গেল। সে শুয়েছিল শারীরিক অবসাদের জন্য। চিন্তা আর সে করবে না বলে ঠিক করেছে। শাহজাদীর জীবন অভিশপ্ত জীবন। সে জীবনের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কোন সান্ত্বনাও নেই। শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া। মহলের চারদিকে থরে থরে ভোগ বিলাসের জন্য প্রচুর রাজসিক ভোগ্যবস্তু। সাধারণ লোকেরা যা পায় না, তাদের জীবনে সেই দুর্লভবস্তু আয়াস-লভ্য। আছে আনন্দ বস্তু। দৌলতের রোশনাই। হীরা, জহরত, চুনি, পান্নার ছড়াছড়ি। প্রচুর ভাল ভাল খানা। কোপ্তা, কাবাবের রসালো রঙ দেখলে জিবের রসনা তীব্র হয়ে ওঠে। আর আছে কাশ্মীরী আঙ্গুর, রক্তাক্ত আপেল, ঠিক যেন যৌবন পাওয়া মেয়ের গালের মত জৌলুষে ভরা।

পোষাকের চমকদারীতে পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যও ম্লান। মসলীন ও মখমলের চেকনাইয়ের ওপর সোনা ও রূপার জরির বুটি। হীরা, জহরতের ঔজ্জ্বল্যে দিল্লী ও আগ্রার বেগম মহল, বাঁদীমহল, বিবিমহল, নর্তকীমহল, জেনানামহল ঝকমকে।

কি নেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রাসাদের অভ্যন্তরে! সব আছে, আনন্দ আছে, খুসী আছে, নাচ আছে, গান আছে, সরাবের অঢেল প্রাচুর্য আছে, মরদ আছে, আওরৎ আছে পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনে যা লাগে তাও আছে, প্রয়োজন যা নেই তাও আছে। শুধু নেই শান্তি।

কেউই ভাল করে হাফ ছেড়ে বলতে পারে না—'বহুৎ খুঁস।' অথচ মানুষের প্রয়োজনের ও অপ্রয়োজনের সমস্ত বস্তুই সারা ভারতের চারদিক থেকে এখানে এনে জমা করা হয়।

বাদশাহ, তাঁর মনে সর্বদা সংশয়—এই বুঝি কেউ বিদ্রোহী হল? বেগম মহলে বেগমের মানসিক ধৈর্য সর্বদা ওঠানামা করছে; বাদশাহ্ কাকে ভালবাসল, কার কক্ষে বাদশাহ কাল রাত্রির অনেকটা সময় বিশ্রাম নিয়েছেন, কার সৌভাগ্য হল বাদশাহের পাশে সিংহাসনে বসবার। কে অপরাধ করেছে, কার বিচার হবে?

জেবুন্নিসা এইসব আবোল তাবোলই সুকোমল শয্যার গহ্বরে শুয়ে ভাবছিল। হঠাৎ তার কানে গেল নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার,—অনেকবার আর্তনাদটা তার মনে হল অনেকদূর থেকে আসছে। কিন্তু অনেকদূর হলেও এ যে প্রাসাদের এই অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে জেবুন্নিসা আবার বাতাসের বুকে কান পাতল। আবারও সেই আর্তনাদ। এবার সেই আর্তনাদের সাথে মনে হল কে যেন কাকে প্রহার করছে, আর সেই প্রহারের যন্ত্রণায় যেন কোন রমণীকণ্ঠ চিরেচিরে আর্তস্বর বেরিয়ে আসছে। আর্তনাদের স্বর যেন খুব পরিচিত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না বহুদূর বলে। অনেকগুলি পাথরের বেষ্টনি ভেদ করে মহলের এই কক্ষে কারও স্বর আসা খুব কষ্টকর। তবু আসছে, শুধু রাত্রির নিস্তব্ধতার জন্যে। কিন্তু কে কাকে প্রহার করছে? বিস্ময়ের রেখা ফুটল জেবুন্নিসার কপালে। সুমসৃণ কপালটা সে তার চম্পাকলির মত আঙুলের পেষনে টিপে ধরল। চিন্তাটা একেবারে দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরের চারদিকে ঘুরতেই হঠাৎ চমকে

উঠল সে,—'রোশোনারা।' পিতার ভগিনী সেই শয়তানী রোশোনারা। সে আজ এ প্রাসাদের আওরৎ মহলের সর্বময়ী কর্ত্রী। পিতা শাহজাহানের স্নেহপাশ ছেড়ে এসেছে ভ্রাতার সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতে। আর কাকে সে প্রহার করছে, তাও বুঝতে পারল জেবুন্নিসা। পরক্ষণে সে আর বিলম্ব না করে হাতের তালি দিয়ে প্রহরিণীকে ডাকল। এক তাতার রমণী এসে দাঁড়াতে জেবুন্নিসা দ্রুত বলল—জলদি ইখ্‌তি!

ইখ্‌তি কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছল। ইখ্‌তিকে দেখে জেবুন্নিসা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বলল—কে কাকে প্রহার করছে রে?

ইখ্‌তি বেগম রোশোনারার নাম বলে মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে সভয়ে পিছন দিকে তাকাল।

জেবুন্নিসা ইখ্‌তির রকম দেখে সাহস দিয়ে বলল—তুই ডর করছিস্ কেন? তুই আমার খাসবাঁদী। কেউ তোকে শাস্তি দিতে সাহস করবে না। বল্ কি হয়েছে?

ইখ্‌তি তখন সাহস পেয়ে বলল—বেগম রোশোনারা বেধড়ক্ সরাব পান করে শাহজাদা দারার বেটি জানী বিবিকে চাবুক দিয়ে মারছে।

অপরাধ!

সে শয়তান বিধর্মী দারা শিকোর বেটি বলে।

শুধু এই অপরাধে? জেবুন্নিসা আবার জিজ্ঞেস করল—আমার পিতা ঔরঙ্গজেব কি জানীকে প্রহার করতে তাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন?

না, সে সব কিছু শুনি নি।

কেউ বাধা দেয় নি?

ইখ্‌তি বলল: কে দেবে? বেগম রোশোনারার সামনে দাঁড়ানো কারও সাহসে কুলোয় না, তো বাধা!

জিনৎ কোথায়?

মালেকা জিনৎ অনেক আগেই আপনাকে খবর দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আপনি আরাম করছিলেন বলে সাহস করি নি।

তাই বলে একটি নিরপরাধ কিশোরী শুধু শুধু অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে—আর তোরা আমার আরাম দেখলি?

ইখ্‌তি লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে বলল: আমি বুঝতে পারি নি মালেকা!

জেবুন্নিসা আলাপ আলোচনা করে আর সময় অপব্যয় করল না, তাড়াতাড়ি ওড়নাটা বুকের ওপর তুলে দিয়ে ইখ্‌তিকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল।

সামনেই বৃহৎ সোপানশ্রেণী। সোপানশ্রেণীর কোণে কোণে স্ফটিকাধারে ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল আলোর মালা। সোপানশ্রেণী শেষ হবার পর সামনে একটি মৃত্তিকাময় পুষ্পোদ্যান। রাতের নিশীথে প্রস্ফুটিত ফুলের সুবাস চারদিককে আমোদিত করেছে। সেখানে রক্তবর্ণের সব গোলাপ ফুটে চারদিকে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। পুষ্পোদ্যানের পরেই একটি সুবাসিত গোলাপজলের প্রস্রবণ। প্রস্রবণ থেকে ধারাবিগলিতভাবে গোলাপজল নিঃসৃত হয়ে নীচে শ্বেতপ্রস্তরের গহ্বরে আছড়ে পড়ছে। গোলাপজলের সুবাসে চারদিক আমোদিত। সেখানে জেবুন্নিসা শুধু একবার থেমে সুবাসিত প্রস্রবণের আঘ্রাণ নিল। তারপর মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার আকাশ। কটি নক্ষত্র আকাশের বুকে জোনাকির মত টিপ্‌ টিপ্‌ করে জ্বলছে।

জেবুন্নিসা আবার পা চালাল। এবার একটি কারুকার্য করা দালান। দালানের পাশে পাশে বিচিত্র খিলান। খিলানের নীচে রঞ্জিত স্ফটিকপাত্রে, সদ্যচয়িত সুবাসপাত্র সরস পুষ্পসমূহ অতি সযত্নে সুরক্ষিত। গন্ধরাজ, বেলা, মল্লিকা, চম্পা, চামেলি প্রভৃতি সুগন্ধভরা ফুল্লকুসুমবাসে দালানের অলিন্দগুলি মনোমদ সুগন্ধে আকুলিত। এই বারান্দার মধ্যস্থলে একটি স্বর্ণময় বেষ্টনীর মধ্যে শ্বেতমর্মরময় আধারের ওপর এখানেও এক স্বর্ণনির্মিত গোলাপজলের প্রস্রবণ। তা থেকে অনবরত গোলাপজল উৎসারিত হয়ে সদ্যপ্রস্ফুটিত নৈশ-কুসুমবাসের সঙ্গে মিশে সেই স্থানকে বেহেস্তের সুগন্ধে পূর্ণ করেছে।

তারপরে আরও কটি মর্মরময় দালান। দালানের পাশে পাশে লাল, নীল, পীত, শ্বেতবর্ণের স্ফটিক-দীপাবলী জ্বলছে। স্থানে স্থানে খোজা প্রহরীরা কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত। তারা এদের দেখে কুর্নিশ করে সরে দাঁড়াল। তারপর আর কটি মহলের দালান টপ্‌কানোর পর বেগম মহলের রঙ্‌মহলের দরজা পাওয়া গেল।

দরজার মুখেই দুজন তাতার প্রহরিণী। তারা জেবুন্নিসাকে পথ ছেড়ে দিল।

জেবুন্নিসা তীরবেগে ঢুকল শাহজাদী রোশেনারার রঙ্‌মহলে। তখন

রোশোনারা জানীকে প্রহার করে ডিভানে বসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পাশে একজন তাকে স্বর্ণময় টানা পাখায় বাতাস করছে। মেঝের রক্তবর্ণ ফরাসের ওপর চর্মময় চাবুকটি অবহেলা ভরে পড়ে রয়েছে। জানী ফরাসের ওপর অচৈতন্য কুণ্ডলী দেহ গুটিয়ে নিয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে যাবার তখনও আদেশ হয় নি বলে কেউ নিয়ে যেতে সাহস করে নি।

কুলসম জেবুন্নিসাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে কুর্নিশ করল। রোশোনারা জেবকে দেখতে পান নি, তিনি তখন সরাবের নেশায় ও পরিশ্রমে চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ কুলসম রোশোনারার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জেবুন্নিসার আগমন সংবাদ জানাল।

নবীনা কর্ত্রী রোশোনারা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি রক্তাভ সুন্দর আয়ত চোখদুটি ফিরিয়ে জেবুন্নিসাকে দেখলেন, কিন্তু পরক্ষণে তাঁর চোখে ক্রোধের আভাস ফুটে উঠল। তিনি ক্ষিপ্তস্বরে মুখ বিকৃত করে বললেন—কি চাই এখানে? কিছু যদি আর্জি থাকে তাহলে আগামীকাল প্রত্যুষে জানালেই বাধিত হব!

জেবুন্নিসাও সঙ্গে সঙ্গে সেই মেজাজে উত্তর দিল—সম্রাট শাহজাহান দুহিতা, মমতাময়ী মমতাজমহল কন্যা শাহজাদী অপরূপ সুন্দরী রোশোনারার কাছে নবীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীরের কন্যা জেবুন্নিসার কোন আর্জি নেই। আর্জি যদি কিছু থাকে, তাহলে সে তার পিতার কাছে পেশ করবে। এখন আমি জানতে এসেছি, জানীকে প্রহার করবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? যদি পিতা যুদ্ধে যাবার সময় দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে কিছু বলার নেই তবে আমার মনে হয় সে অধিকার অন্ততঃ বিশ্বাস করে পিতা তাঁর প্রিয়তমা ভগিনী রোশোনারাকে দিয়ে যাবেন না।

তবে কাকে দিয়ে যাবেন? শাহজাদী রোশোনারা হঠাৎ মুখভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলেন।

জেবুন্নিসা সংযম রক্ষা করে উত্তর দিল—সে উত্তর এখন সঠিকভাবে দেওয়া যাচ্ছে না, যতক্ষণ না পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে।

তবে তখন এসে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিলেই সুখী হব।

না, জেবুন্নিসা রুখে দাঁড়াল। এই প্রাসাদের মধ্যে একজন নিরপরাধ লেড়কির ওপর অত্যাচার হবে, আমরা জীবিত থাকতে তা কিছুতে হবে না।

সে শয়তান দারার বেটি!

হোক্ সে দারার বেটি। তবু সে আমার ছোট বহিন্। তার শরীরেও যে শোণিত আছে, আমার শরীরেও সেই শোণিত আছে। তার এই প্রহার, আমার গায়েও বাজে। যাক্‌গে আমি আর বেশী কথা বলতে চাই না, আমার কাজের যদি সমালোচনা দরকার হয়, পিতা যুদ্ধশেষে ফিরে এলে তার কাছেই এর বিচার হবে। এই বলে হঠাৎ জেবুন্নিসা হাতে তালি দিল। বাইরে থেকে দুটি তাতারপ্রহরিণী এসে জেবুন্নিসার সামনে দাঁড়াল। জেবুন্নিসা 'জানী'র অচৈতন্য দেহ তুলে তার কক্ষে পাঠিয়ে দেবার জন্যে নির্দেশ দিল।

কিন্তু তাতারপ্রহরিণীরা 'জানী'কে তুলতে যেতেই রোশোনারা গর্জে উঠলেন—খবরদার, জানীকে নিয়ে যাবার চেষ্টা যে করবে—সে কোতল হয়ে যাবে।

প্রহরিণীরা স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকায় জেবুন্নিসা তাদের ক্রুদ্ধস্বরে বলল—আমি জেবুন্নিসা। নবীনসম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীরের জ্যেষ্ঠকন্যা, আমি বলছি জানীকে আমার কক্ষে নিয়ে চল। জেবুন্নিসার স্বরে এমন একটা স্পর্দ্ধার ভাব ছিল, যা শুনে রোশোনারা আর কণ্ঠ চড়াতে পারলেন না। তাতার প্রহরিণীরা জানীর অচৈতন্য দেহ তুলে নিয়ে যখন প্রস্থানোদ্যতা হয়েছে সেই সময় রোশোনারা শুধু মুখ বিকৃত করে বললেন—আচ্ছা, এর প্রতিশোধ আমি নেব। দেখব, ভাইজান ঔরঙ্গ তার বেটিকে দুনিয়া থেকে সরায় কি তার বহিন্‌কে সরায়?

জেবুন্নিসা রোশোনারার দিকে ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্পর্ধিতা ভঙ্গিতে ইখ্‌তিকে সঙ্গে করে রোশোনারার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

আসতে আসতে শুনতে পেল রোশোনারা কুলসমকে বলছেন—আর একটু জোরালো সরাব নিয়ে আয় কুলসম, মাথাটা বড় ঝিম্ ঝিম্ করছে।

জেবুন্নিসা মনে মনে শুধু একচোট হাসল। পাথরের কাছেই যে পাথর তার কঠিন দেহের শক্তির পরীক্ষার প্রমাণ পায়, এই রোশোনারাই তার প্রমাণ। পিতা ঔরঙ্গজেব ফিরে এলে এর যে একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হবে তারই আভাস রোশোনারা তাঁর ব্যবহারে দিলেন।

মনে মনে জেবুন্নিসা তাই আর একবার বলল—দেখা যাক্, ঔরঙ্গজেব তাঁর বহিনের পেয়ার বেশী পছন্দ করেন না, তাঁর বেটির······!

দিন কয়েক পরে।

এই কদিনের মধ্যে দিল্লীর রাজ অন্তঃপুরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে নিত্য নতুন ঘটনা ঘটবে এতে অবশ্য বিচিত্র কিছু নেই। কিছু নতুন ঘটনার সৃষ্টির জন্যে বাদশাহ নিত্য নতুন মানুষের আমদানী করতেন। দিন রাত্রির সমস্ত সময়টা রাজকার্যে ব্যাপৃত করবার জন্য মনের যে আগ্রহ ও উৎসাহের প্রয়োজন, তার জন্যেই বাদশাহ চাইতেন নিত্য নতুন আনকোরা ঘটনা। যার মধ্যে আছে চিন্তা, আছে রোমাঞ্চ। রক্তের মধ্যে একটা সমস্যার সমাধানে দুনিয়ার কৌতূহল। সেই কৌতূহল শেষে কৌতুকে পরিণত হলে আরও মজা। বাদশাহ দিনরাত মজার মধ্যে থেকে মজাই লুটতে চান। তবে মাঝে মাঝে যে শেষ পরিণতিটা নিতান্ত দুঃখের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হত তার জন্যে খানিকটা শোকের ছায়াও প্রাসাদ পরিবেশকে ম্লান করে দিত। তবে এই শোকের ছায়া মোগল রাজপরিবারে খুব কম।

দিনরাত মানুষের বিচার হচ্ছে, দিনরাত মানুষ সাজা পেয়ে প্রাণ দিচ্ছে। মানুষের এই প্রাণ সংঘাতের আয়োজন বাদশাহের পরিবারের একটা ক্রীড়া-চাপল্য। তারা হাসে, কৌতুক করে কিন্তু শিউরে ওঠে না। রক্ত দেখে চীৎকার করে না। হাতি যখন শুঁড়ে করে অপরাধীকে আকাশমুখী তুলে ভূমিতে বার বার আছাড় মারে তখন বাদশাহ ও বাদশাহপরিবারের জেনানা, ওমরাহ ও ওমরাহ পরিবারের জেনানা, মনসবদার ও তাঁদের বিবিরা গ্যালারিতে বসে উল্লাসে চীৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করেন। আনন্দ প্রকাশ করেন তাঁরা হাতির শুঁড়ে অপরাধীর অবস্থা দেখে। হাতি তার শুঁড়ে তুলে নিয়েছে একটি বিশাল পুরুষদেহ, তারপর তাকে ছোট শিশুর মত শূন্যে তুলে নিয়ে মাটিতে বারবার আছড়ে আছড়ে দেহটি থেঁতলে একেবারে চ্যাপটা করে দেয়। থেঁতলানো সেই রক্তাক্ত দেহ দেখে গ্যালারির দর্শকদের উল্লাস আকাশমুখী হয়। একেই বলে রাজসিকতা, একেই বলে ঐশ্বর্যের চমকদারী দাম্ভিকতা।

অন্তরের যে সূক্ষ্ম তারে কোমল অনুভূতিটুকু ধরা থাকে, যার জন্যে মানুষ হাসে, কাঁদে, দুঃখে-শোকে আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়। মোগল হারেমের এই বিশাল ঐশ্বর্যের ঝকমকের মধ্যে সেই মনুষ্যত্বের অনুভূতিটুকু আর সূক্ষ্মতর ছিল না, সেখানে মানুষ ছিল, মানুষের রকম ছিল, চেকনাই ছিল, রোশনাই ছিল, শুধু ছিল না প্রাণ। সে প্রাণ ছিল আকবরের, সে প্রাণ ছিল জাহাঙ্গীরের। জাহাঙ্গীর সরাব পান করতেন, অত্যধিক সরাব পান করে বেঁহুস হয়ে থাকতেন। বহু রমণীকে তিনি শাদী করেছিলেন। বহু

রমণীর কোমল বাহুবন্ধনে তাঁর সুখময় রাত্রিগুলি রাজসিক শৈথিল্যের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তিনি সর্বদা নিজের এই দুর্বলতার জন্য আক্ষেপ করতেন। দিনে তিনি কুড়ি পেয়ালা মদ্য পান করতেন। প্রত্যেক পেয়ালায় আধসেরের ওপর মদ্য থাকত। তিনি তাঁর এই দুর্বলতার জন্য ঈশ্বরের কাছে বার বার নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতেন।

তাঁর এই ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতিতে তাঁর মনের আন্তরিকতাই পরিস্ফুট হয়েছে। এমনি বাদশাহ কজন দেখা যায়? শাহনশাহ আকবরও এইরূপ মনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের মধ্যে এই আন্তরিকতার অভাব খুব বেশী মাত্রায় ছিল।

মনে হয় তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য তাঁকে যে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল সেই ক্লেশের জন্যই তাঁর আন্তরিকতার ওপর মোটা পরদা চাপা পড়েছিল। আরও একটি কারণ—সিংহাসনে বসবার চার বছর পরে সুখের স্বপ্নশিখরে যখন তিনি আরোহণ করেছেন তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহল তাঁকে ছেড়ে মাটির তলায় চলে গেলেন। পত্নী বিধুর শোকাতুর সেই নরপতির মনে তাই আর মায়া, দয়া, স্নেহ মমতা থাকল না। তবে তিনি তাঁর আগে তারই বিমাতা নুরজাহানের ওপর যথেষ্ট মন্দ ব্যবহার করেছিলেন। দিল্লীর রাজ-পরিবারের রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা সেই রমণী স্বামীহারা হয়ে একা মোগলহারেমে নিজেকে সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে বসেছিলেন ; শাহজাহানের তাও সহ্য হল না, বিমাতার বিগত শত্রুতার প্রতিশোধকল্পে একেবারে তাঁকে দেওয়ানা করে সমস্ত কর্ত্রীত্ব কেড়ে নিলেন। তিনি স্বীকার করেন নি তাঁর বিমাতা তাঁর পিতার ধর্মপত্নী ছিল বলে।

সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সেই চোখের নীরব অশ্রুপাতে মোগল হারেমের শান্তি সেই থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যদিও সম্রাট শাহজাহান পত্নী বিয়োগের পর নিজের পুত্র-কন্যাদের ওপর যথেষ্ট অন্তর স্থাপন করে-ছিলেন কিন্তু পূর্বের অত্যাচারের শাস্তি তার জীবনের আলোকময় পথকে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছিল। তাঁর জীবনে পরবর্তী সংঘাতগুলি তাঁরই পাপের ফল।

সেজন্য মোগল রাজপরিবার থেকে অন্তর ও আন্তরিকতা অনেকদিন বিদায় নিয়েছিল।

জেবুন্নিসা নিজের কক্ষে জানীকে এনে কদিন ধরে শুশ্রূষা করল। রাজ পরিবারের হাকিম এসে ওষুধ দিয়ে গেল। বুকে পিঠে মালিশ করবার জন্যে ঠাণ্ডা মলম দাওয়াই দিল। জানীর যন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি দেখে জেবুন্নিসা বাঁদীর ওপর জানীর শুশ্রূষার ভার না দিয়ে নিজেই বসে গেল সেবা করতে। জানীর নরম সুন্দর কিশোরী দেহের গোলাপী খোলস থেকে সবুজবর্ণের ভেলভেট সাটিনের রক্তাক্ত কামিজটা দুহাত দিয়ে শক্তি প্রয়োগে ফেঁড়ে ফেলল। বেরিয়ে এল একটা চাবুক খাওয়া রক্তাক্ত দেহ। পাখীর মত সেই দেহের ভেতরের ধুক্‌ধুকুনিটা তখনও থর থর করে কাঁপছে, সারা দেহ যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছে। বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে, মুখের সুন্দর আদলে রক্তের দঁড়ি ফুলে উঠেছে।

অচৈতন্য দেহটা জেবুন্নিসা তার পালঙ্কের ওপর ফেলে উল্‌টে পাল্‌টে সমস্ত দেখল। কক্ষের চারদিকে স্বর্ণপাত্রের বাতিদানে জোরালো আলোর বর্ণ-ছটায় আরও দেখল জানীর অপুষ্ট বক্ষসৌন্দর্য। সবে মাত্র জানী তার কৈশোরের ধাপ থেকে আস্তে আস্তে রমণীর ধাপে পা দিয়েছে। তবে তার বক্ষের কুসুমাস্তীর্ণে রক্তের প্রবহমান স্রোত আস্ত আস্তে জমে মাতৃত্ব সৃজনের আবির্ভাব ঘোষণা করেছে। যুগল গোলাপের স্ফুটন সবে তার কোরকে কোরকে রক্তের সমারোহ জাগিয়ে রমণী ঐশ্বর্যে তাকে মহীয়ান করবার জন্যে আয়োজন করেছে; হয়তো জানীর মনে কত স্বপ্ন। জানী হয়তো দিনরাত তার দেহের অপরূপ পরিবর্তন মনের খুসীর ঐশ্বর্য দিয়ে অনুভব করে; মহলের চারদিকে বেলজিয়াম আয়নার ওপর নিজের প্রতিবিম্বের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আবার যে সব চিন্তা জেবুন্নিসার মনের মধ্যে জাগছে হয়ত সে এসব চিন্তা কিছুই করে না। তার হয়তো দেখবারই সময় হয় নি।

পিতার ভাগ্যলিপি হঠাৎ অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হতে তার মনের আকস্মিক আশঙ্কা তাকে আহত করে ভীরু করে দিয়েছে। না হলে এই জানীকেই সম্রাট শাহজাহান বেশী পেয়ার করতেন। বলতেন: 'ও হবে আমার জাহানারার মত মোগল রাজ অন্তঃপুরের গৌরবের লক্ষ্মী।' সেই জানী আবাল্য বাদশাহের স্নেহপাশে থেকে নিজের কিশোরী মনকে সম্পূর্ণ বাদশাহী মেজাজের রাজসিক ঐশ্বর্যের তুঙ্গে অধিষ্ঠিতা না করে সে পিতা দারা শিকোর মত জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমতী, সহজ কাতর অন্তরমনা রূপ পেয়েছিল। মোগল হারেমে যে সব কিশোরীরা বেড়ে উঠছিল তাদের মধ্যে জানী ছিল

অদ্ভুত বুদ্ধিমতী। সেজন্যে দারা শিকো তার শিক্ষার কিছুটা আমেজ এই কন্যার মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহান পত্নী বিয়োগ বেদনা কোনদিনই বিস্মৃত হননি; কিন্তু জানীর কিশোরী লীলা চাপল্য মাঝে মাঝে মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করে বলতেন—'মমতাজ আমার জানীর ভিতর দিযে আমাকে আবার দেখা দিয়েছেন।'

আশ্চর্য এই কিশোরীটির ভাগ্যে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দিল। অবশ্য যার পিতার ভাগ্যলিপি অদ্ভুত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে তার কন্যার ভাগ্যে আর নতুন কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু রোশোনারা প্রহার করে মেয়েটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে প্রাণসংহার করবে—এও কি কল্পনা করা গিয়েছিল?

মোগল হারেমের নিষ্ঠুর এই রমণী রোশোনারা যে কিরূপে আবির্ভূতা হলেন, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। অথচ মমতাজ এই কন্যাকে প্রসব করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, এই কন্যার জন্যে তাঁর দেহের যন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। মনে হয় অদ্ভুত কন্যার জন্ম স্বপ্নাদেশে সাবধান করে ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবী থেকে টেনে নিয়েছেন। মমতাময়ী, অপরূপা সেই রমণীর দান মোগল রাজপরিবারের অনেক উপহার। তিনি দিয়ে গেছেন যেমন দারার মত পরম কাতর দয়ালু, বিদ্বান সন্তান, আবার দিয়ে গেছেন শয়তান, মন্দস্বভাবের অদ্ভুত কৌশলী, স্বার্থপর ধূর্ত, ঔরঙ্গজেবের মত সন্তান। একদিকে যেমন স্নেহশীলা, কাতরা মমতাময়ী কন্যা জাহানারা, অপরদিকে দিয়েছেন তেমনি কুটিল কলঙ্কে মলিন, ইন্দ্রিয়পরায়ণা, দুর্বল চরিত্রবতী অদ্ভুত স্বার্থান্বেষী কন্যা রোশোনারা।

আশ্চর্য এই রমণী। জেবুন্নিসা অবসর পেলেই বারবার তার পিতার জননী মমতাজ মহলকে স্মরণ করে। আগ্রার যমুনাধারে আছে শ্বেতপ্রস্তরে গাঁথা সেই মমতাময়ী অপরূপ সুন্দরী সাধ্বী পত্নী মমতাজ মহলের সমাধির অপরূপ স্মৃতি। তিরিশ বৎসরের আপ্রাণ পরিশ্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য সম্রাট শাহাজাহানের রাজকোষের ৩,১৭,৪৮,০২৪ টাকা ব্যয়ে হীরা, জহরত, চুনি, পান্নার রোশনাইতে গড়ে উঠেছিল এই তাজমহল। জেবুন্নিসা দেখেছে সেই তাজমহল। আগ্রার রাজপ্রাসাদে গেলেই সে শিবিকায় চড়ে যমুনার প্রবাহকে বেষ্টন করে উন্মুক্ত আকাশের তলায় সেই সৌন্দর্যের অমরস্মৃতিকে নিজের হৃদয় কুসুম দিয়ে তিল তিল করে অনুভব করে—শ্রদ্ধার সঙ্গে কুর্নিশ জানিয়ে স্বীকার করেছে—'হ্যাঁ মমতাজ, আওরৎজীবনের সার্থকতার উচ্চস্তম্ভে উন্নীতা হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে।'

জেবুন্নিসা চিন্তা থেকে সরে এসে জানীর সেবায় নিজেকে লিপ্ত করল। মেয়েটি তখনও অচৈতন্য। তাড়াতাড়ি সামনে দণ্ডায়মান ইখতির কাছ থেকে একটি মখমলের টুকরো চেয়ে নিয়ে জানীর বক্ষের ওপর স্থাপন করল। হয়তো মেয়েটি জেগে উঠে লজ্জা পাবে। কিম্বা ভাববে, এও বোধহয় একধরনের অত্যাচার। তার ওপর পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে তার লজ্জার ভূষণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রোশোনারা এদিকটা চিন্তা করেননি, যদি চিন্তা করতেন, তাহলে জোর করে কোন মরদ নিয়ে এসে জানীর পবিত্র মাসুম গৌরবটি নিঃশেষে কেড়ে নিতেন। জানীকে প্রহার করে অত্যাচার করার চেয়ে এই ধরনের অত্যাচার তার আওরত জীবনে সবচেয়ে বেশী কলঙ্ক আরোপ করত। হয়ত জানী এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করত। জানীর সহজ সরল মনে জীবন আহুতির প্রশ্নই প্রথম জেগে উঠত।

তারপর জানীর জ্ঞান ফিরে এল তিনদিন পর। হাকিমের দাওয়াই ও জেবুন্নিসার সেবা ও তার গায়ে মলমের প্রলেপ পড়তে যন্ত্রণার অনেক উপশম হল। আরও যন্ত্রণা তার লাঘব হল, যখন সে দেখল জেবুন্নিসার বাহু ক্রোড়ে সে শুয়ে আছে। তার ব্যথাতুরা চোখদুটি দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গাল বেয়ে বুকে গিয়ে নামছে। মুখে তার কথা নেই। শুধু যন্ত্রণার বেদনায় দেহটা মোচড় দিয়ে উঠছে। ভেতর থেকে একটা দারুণ চীৎকার উঠে চারদিকে মুখর করে দিচ্ছে। আর দুটি হরিণের মত ভীতা চোখে যেন অশ্রুর মুক্তাবিন্দু।

জেবুন্নিসাও কথা বলে না, কোন সান্ত্বনাও দেয় না। শুধু নীরবে জানীকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যায়। ইখ্তিও জেবুন্নিসার সঙ্গে জানীর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করে। সে অবশ্য নোকর। সে হুকুমের দাসী। তবু তার প্রাণে আছে মমতা, আছে দরদ ও আন্তরিকতা। সে তার সেই অন্তর নিগড়ে সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

আস্তে আস্তে একদিন জানী ভাল হয়ে উঠল; উঠে দাঁড়াতে সুরু করল। তারপর চলতে সুরু করল, কিন্তু আগের মত সে সহজ হতে পারল না। জানী ভাল হয়ে যাবার পর জেবুন্নিসা ঠিক করল—তাকে সে নিজের কাছেই রাখবে। যতদিন না বাপজান ফিরে আসেন ততদিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখাই সবচেয়ে সাবধানতা। রোশোনারা যে সহজে জানীকে রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। পিতা ফিরে এলে পিতার কাছে সে আর্জি পেশ করে বলবে—

'পিতা দোষী হলে তার জন্যে কন্যার ওপর শাস্তির কঠোরদণ্ড আরোপিত হবে কেন জাঁহাপনা।' পিতার কাছে সে নিজের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও জানীর প্রাণভিক্ষা চাইবে। সেজন্যে পিতা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না ফেরা পর্যন্ত জানীকে নিজের কাছে রাখাই ঠিক করল জেবুন্নিসা।

একথা কীভাবে রাজঅন্তঃপুরের চারদিকে প্রচারিত হ'ল, হঠাৎ একদিন নিশুতি রাত্রে জেবুন্নিসা নিজের কক্ষে নিদ্রা গেছে, পাশে শুয়ে আছে জানী। রাত্রে কক্ষের দরজা এমনিই উন্মুক্ত থাকে, বাইরের লোকের আসার কোন সম্ভাবনা নেই বলে অন্তঃপুরের বিভিন্ন কক্ষের দরজা উন্মুক্তই থাকত। তবে দরজার মুখে দুপাশে দুজন করে তাতার প্রহরিণী নির্ঘুম অবস্থায় পাহারা দিন। এদিনও পাহারা দিচ্ছিল। হয়তো তারা শেষরাত্রের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাপখোলা তরবারী হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কক্ষের কয়েকটি বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু যা ছিল তা পর্যাপ্ত না হলেও অপ্রচুর নয়। মৃদুমন্দ আলো, অন্ধকার ঘেরা পরিবেশের মধ্যে দুটি আওরৎ তারা সুকোমল রেশমী বিছানার গহ্বরে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ সেই কক্ষের মধ্যে একজন খোজা ও দুজন তাতার প্রহরিণী মুখে কালো কাপড়ের ঢাক্না দিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করল।

এসে তারা অল্পক্ষণ একদৃষ্টে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হয়ে জেবুন্নিসার পাশ থেকে জানীকে তুলে নিতে গেল। কিন্তু তারা দ্রুত কার্য সমাধা করে পালাবে বলে দেখতে পায় নি, জেবুন্নিসার একটি সুকোমল হাত জানীর দেহকে বেষ্টন করেছিল। যেই তারা অসাবধানে জানীকে আকর্ষণ করে নিতে গেল, জেবুন্নিসার হাতে টান পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল। উঠে বসেই সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—কে? কে?

কিন্তু তিনটি মূর্তি এক দৌড়ে ছুটে কক্ষ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জেবুন্নিসা হাতের তালি দিয়ে বাইরের দরজার প্রহরিণীদের ডাকল। প্রহরিণী দুজন ঘুম-চোখে ছুটে আসতে জেবুন্নিসা দ্রুত বলল—আমার কক্ষে তিনজন কে এসেছিল তাদের এখুনি পাকড়াও করে নিয়ে এস। তারা কুর্নিশ জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে জেবুন্নিসা তাকিয়ে দেখল ইখ্তি কক্ষের স্বর্ণময় বর্তিকাগুলি পর পর প্রজ্বলিত করে চলেছে। জেবুন্নিসা তার দিকে তাকিয়ে বলল—ইখ্তি শুনেছিস্, আমার কক্ষে কারা যেন জানীকে অপহরণ করতে এসেছিল!

ইখতি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল—গোলমাল শুনেই তো ঘুম ভেঙে গেল, তাইতো চলে এলাম।

কারা জানীকে নিয়ে যেতে এসেছিল তোর অনুমান হয়!

নির্ভয়ে বলতে ডর লাগে মালেকা। আমরা বাঁদী, আপনাদের শত্রুতায় আমাদের কান না দেওয়া উচিত।

তুই কি তবে সম্রাট শাহজাহান দুহিতা বেগম রোশোনারার কথা বলছিস্?

আমার এই বাঁদীর মুখ দিয়ে নাইবা শুনলেন মালেকা।

জেবুন্নিসা গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবতে লাগল, পিতা না ফেরা পর্যন্ত এই রমণীর অত্যাচার থেকে মোগলের জেনানামহল কি করে বাঁচানো যায়? বিশেষ করে জানীকে। জানীর ওপর সমস্ত আক্রোশ যে কেন বোঝা যায় না? তার পিতার ওপর যদি নিষ্ঠুর হওয়ার প্রয়োজন হয় তার জন্যে তাঁর কন্যার ওপর কেন শাস্তি আরোপিত হবে? রোশোনারা যে কি জাতের আওরৎ—ভেবেও তার স্বভাবের কুলকিনারা পাওয়া যায় না।

তাতার প্রহরিণী দুজন ফিরে এসে বলল—তাদের দেখতে পাওয়া গেল না।

জেবুন্নিসা তাদের দরজার সামনে ভালভাবে পাহারা দিতে বলে ইখ্‌তিকে বলল—তুই আর তোর কক্ষে শুতে যাস্‌নি। এই ঘরেই থাক্। আজ রাত্রি প্রভাত হবার পর আমি উজীরকে সংবাদ দিয়ে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করব।

জানী কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গ জানলো না। সে তখন পরম নিশ্চিন্তে এক-টুকরো ফুলের মত জেবুন্নিসার নরম, কোমল মখমলের বিছানায় শয়ন করে অঘোরে নিদ্রার কোলে সমাহিতা। জেবুন্নিসা প্রজ্বলিত আলোকমালার মধ্যে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে গেল, বেচারী!

তারপর রাত্রি আরও গভীরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে নেমে এল দারুণ সুষুপ্তির আমেজ। প্রহরীরা আর চাকরীর মায়ায় ঘুমের কবল থেকে রেহাই পেল না! রাত্রি শেষের যামে ঢলে পড়তে শীতল বাতাসের মৃদুমন্দ পরশ চারদিকে তার বেহুঁসের ছোঁয়াচ পরিয়ে দিল! চন্দ্রিমা পুব থেকে পশ্চিম দিগন্তে তার রূপালী বর্ণাঢ্য ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেবদারু গাছের দীর্ঘ ছায়ার ফাঁকে তার বিলীয়মান প্রকাশ ধরণীর বুকে জেগে উঠে আবার হারিয়ে যেতে লাগল।

তারপর নিবিড় অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্রও প্রায় বিলীন। যা দু-পাঁচটা উপরে আছে সে যে কত যোজন দূরে বোঝা যায় না। শুধু তার উপস্থিতি। সামান্য আলোর টিপ কে কপালে পরিয়ে দিয়ে উপহাস করেছে বলে মনে হয়! যেখানে দিনের বেলায় এই প্রাসাদের চত্বরে চত্বরে অলিন্দের খিলানে খিলানে মানুষের মুখর কলোচ্ছাস; আমদরবারের রাজসিকতার মধ্যে ব্রোকেটের ঔজ্জ্বল্যের রোশনাইতে নিজেদের মহীয়ান করে রাখে আমীর ও ওমরাহরা; এই গভীর রাত্রির শেষে প্রাসাদের সেসব স্থানে শুধু অল্প আলোর রোশনাই ছাড়া সব স্তব্ধ দেখে কেমন যেন বিস্ময় জাগে। আছে পাকশালায় বড় বড় উনুন জ্বালা, বাবুর্চিরা নেই কিন্তু খানা পাকাবার সমস্ত সরঞ্জাম তৈরী, ভোরের আলো ফুটবার আগেই থরে থরে খানা তৈরী শেষ হয়ে যাবে। ঘাতক বধ্যভূমির পাশে ধড় ও মুণ্ডের সমারোহের মাঝে কৃপাণ হাতে ঘুমিয়ে আছে, হয়তো প্রত্যুষেই সতেরো জনের মুণ্ড তাকে ধড় থেকে নামিয়ে দিতে হবে। হাতিশালে লক্ষ লক্ষ হাতি পাগুলি মুড়ে বিশাল দেহ মাটিতে ঝুলিয়ে সারারাত বিচিত্র শব্দের মধ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে থাকে। তাদের প্রভু মাহুতরা তাদেরই পাশের কুঠরীতে ঝিমিয়ে আছে প্রভাত হবার অপেক্ষায়। হাজারো হাজারো অশ্ব হেস্রারবে মাঝে মাঝে নীরব রাত্রিকে বিদীর্ণ করে অশ্বশালা মুখর করে রেখেছে। তাদের কাজ সুরু হবে ভোরের আলো ফুটলে। অশ্বারোহী এসে তাদের মুখের লাগাম ধরে টান্ দেবে।

তাছাড়া এদিকে আছে প্রাসাদের ভেতর খোজা প্রহরীদের, তাতার প্রহরিণীরদের, অসংখ্য বাঁদীদের, রাজকর্মচারীদের, তোষাখানার লোকেদের—নানারকম লোকের নানারকম কাজ। কিন্তু সে শুধু প্রভাত হবার অপেক্ষায়। সূর্যের প্রথম রশ্মি পৃথিবীর পুব থেকে সোনার বর্ণ ছড়ালে।

সেদিন রাত্রি শেষ হয়ে যাবার পর ঝরোখার ভেতর দিয়ে দিনের আলো কক্ষের মধ্যে ঢুকলে, প্রাসাদের তোরণদ্বারে রাত্রি প্রভাত হওয়ার বার্তা নহবত সুরে বেজে উঠলে, জেবুন্নিসার কক্ষে ইখ্‌তি উঠে বসে জেবুন্নিসার পালঙ্কের দিকে তাকাতে তার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। দেখল জেবুন্নিসার পাশের অংশ খালি, যেখানে জানী বেগম শয়ন করেছিল, সেখানে সে নেই। ইখ্‌তির মনটা হঠাৎ কেমন যেন ধ্বক্ করে উঠল। রাত্রি শেষের দিকে তার চোখে নিদ্রা এসে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটেছে। অপরাধ তারই। তার মালেকা তাকে পাহারায় রেখে তিনি নিদ্রা গিয়েছেন নিশ্চিন্ত হয়ে। ইত্যবসরে

এমনি ঘটনা ঘটেছে। মালেকা যে তাকেই অপরাধী বলে তিরস্কার করবেন সেই দুঃখেও—আবার জানী বেগমের জান পয়চান হলে তার মালেকার হৃদয় মথিত হবে সেই দুঃখেও ইখ্‌তি দারুণভাবে ভীতা হয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি সে কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এল। দরজার কাছে সেই দুটি তাতার প্রহরিণী এবার আর খুব বেশী গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে ছিল না, ডাকতেই তড়াক করে সজাগ হয়ে কোষমুক্ত তরবারী তুলে ইখ্‌তির দিকে চাইল।

ইখ্‌তি জিজ্ঞেস করল—কেউ ঘরে এসেছিল কি না?

ওরা মাথা নেড়ে বলল—কভি নেই।

ইখ্‌তি বলল—কিন্তু কক্ষ থেকে ছোটি বেগমকে কে নিয়ে গেল? মালেকা এখনও জাগেনি, জেগে উঠে যদি দেখতে না পায় তাহলে তোমাদের গর্দান যাবে, এই বেলা পারতো তাকে খুঁজে নিয়ে এস।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই তাতার প্রহরিণী দুটি দ্রুত মহলের অন্য প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইখ্‌তি আবার ঢুকল জেবুন্নিসার ঘরে। জেবুন্নিসা তখনও ঘুমচ্ছিল। অঘোর ঘুমে সে ফুলের মত নির্জীব হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। লেপ্‌টে আছে তার কুসুম কোমল সুন্দর দেহটা শুভ্রবর্ণের জরির কাজ করা মখমলের পালঙ্কের ওপর। এমনভাবে শুয়ে আছে যেন মনে হয় কতকাল জেবুন্নিসা ঘুমোয় নি। নিঃসহায়ার মত তার ঘুমের ভঙ্গিটা। ইখ্‌তি ডাকতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। কিন্তু না ডাকলে এই বিপদের কথা না বললে তার মনে শান্তি নেই। জেবুন্নিসা ঘুম থেকে উঠে যদি জানীর অপহরণ শুনে উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে সেজন্যে আর বিলম্ব না করে পালঙ্কের অতি নিকটে গিয়ে কণ্ঠে বিস্ময় মিশিয়ে ইখ্‌তি ডাকল। দু চারবার ডাকতেই জেবুন্নিসা উঠে বসে পাশে জানীকে না দেখতে পেয়ে সামনে দণ্ডায়মান ইখতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—জানী কোথায়?

ইখ্‌তি কুর্নিশ করে থতমত খেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে মাথা নেড়ে বলল—মালেকা, আমি জানি না। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আপনার পাশের শয্যা খালি।

জেবুন্নিসা পরমবিস্ময়ে হঠাৎ দ্রুত পালঙ্ক থেকে হর্ম্যতলে নেমে এসে বলল—মানে? জানীকে আবার অপহরণ করা হল? আর কালবিলম্ব না করে কক্ষের এক গোপনীয় স্থান থেকে জেবুন্নিসা একখানি বক্রাকার ছোট্ট

ইস্পাহানি ছোরা বের করে আনল। সেখানি কোমড়বন্ধের মধ্যে স্থাপন করে ইখ্‌তিকে অনুসরণ করতে বলে কক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিল। অপর দরজা দিয়ে মিয়াবাই কক্ষে প্রবেশ করে জেবুন্নিসার পথ রুখে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছ ?

জেবুন্নিসার তখন মুখমণ্ডল রাগে রক্তিম আকার ধারণ করেছে। ভ্রূকুটি করে বলল—প্রয়োজন আছে। পথ রুখে দাঁড়ালে কেন ? কিছু বক্তব্য আছে ?

মিয়াবাই আবার শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু এই সকালে কি এমন কাজ ?

তখন দাঁতে দাঁত চেপে জেবুন্নিসা বলল—ঐ যে মোগল রাজ অন্তঃপুরে পিতা এক বিষধর কাল নাগিনীকে রক্ষা করে গেছেন, তার ছোবলে কত বিষ তাই একবার পরীক্ষা করতে চলেছি।

কিন্তু কেন ?

জানীর অপহরণের জন্য।

জেবুন্নিসা আর অপেক্ষা করল না। মিয়াবাইকে হতবাক্ করে দিয়ে সে ইখ্‌তিকে ইসারা করে দ্রুত কক্ষত্যাগ করল।

রোশোনারা নিজের কক্ষেই ছিলেন। শুয়েছিলেন তাঁর রক্তবর্ণের শয্যার ওপর একরকম বিস্রস্ত হয়ে। ঘুমচ্ছিলেন কি সরাবের নেশায় বেঁহুস হয়ে পড়েছিলেন, বোঝা গেল না। জেবুন্নিসা এত্তেলা না দিয়ে প্রবেশ করে শয্যার সামনে গিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে হুঙ্কার দিতে—তাড়াতাড়ি রোশোনারা ধড়মড়িয়ে উঠে নিজের বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করবার চেষ্টা করলেন। চীৎকার করে ভগ্নকণ্ঠে ডাকলেন—কুলসম ! কণ্ঠে যতখানি চাপ দিয়ে চীৎকার করলেন ততখানি চীৎকার না বেরিয়ে স্বরটা বিকৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দুটি চোখে রাত্রি জাগরণের কালিমা। চোখের তলায় অত্যাচারের চিহ্ন। একমাথা রেশমী চুল পিঠের ওপর ভেঙে পড়েছে।

কুলসম কাছে এসে কুর্নিশ করলে রোশোনারা ক্ষেপে গিয়ে বললেন—বেতমিজ, বেসরম, নষ্টা আওরৎ, ডাকলে সাড়া পাই না কেন ?

কুলসম শুষ্কমুখে কিছু বলতে গেল কিন্তু শাহাজাদী রোশোনারার কণ্ঠ সপ্তগ্রামে উঠে সমস্ত কিছু লয় করে দিল—কোন বাত্‌ না ? চাবুক মেরে সব নিকাল দেবো। তারপর বললেন—আমার কক্ষে প্রবেশ করার জন্যে যে আমার হুকুমের দরকার হয়, এদের বুঝিয়ে দিয়ে নিকাল দিয়ে দে।

কিন্তু রোশোনারার কণ্ঠ স্তিমিত হলে জেবুন্নিসা রুদ্ধ ক্রোধ আর দমিয়ে রাখতে পারল না। সেও তাল, লয় রোশোনারার মত করে বলল—সম্রাট শাহজাহান নন্দিনী রোশোনারার কক্ষে প্রবেশ করার ইচ্ছা আমার কিছুমাত্র নেই, আমি আমার পিতার রেখে যাওয়া বিষধর কালনাগিনীকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তার কবল থেকে জানীকে ফিরে পাব কিনা?

শাহাজাদী রোশোনারা পরমবিস্ময়ে হঠাৎ হো হো করে পাগলের মত হেসে উঠে পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন, তারপর কক্ষের মেজের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বললেন—বাঃ আমার ভাইজান-ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসার শিক্ষার দৌড় তো অনেকদূর এগিয়েছে? আমার বহিন্ জাহানারার ঐ গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। বেশ, বেশ, আমাকে বিষধর কালনাগিনীর সঙ্গে তুলনা করে খুব একটা বাহাদুরী দেখিয়েছ। তা এই বিষধর কালনাগিনীর কাছে আসতে ডর লাগল না?

রোশোনারার হেঁয়ালিপূর্ণ কথাতে হঠাৎ জেবুন্নিসা আরো প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কোমড়বন্ধ থেকে বক্রাকার ইস্পাহানি ছোরা টেনে বের করল, করে দাঁত দাঁতে চেপে বলল—আমার পিতার নৃশংসতা দেখেছেন, তাঁকে যদি কখনও তার শয়তানরূপের জন্য মনে মনে ভয় করে থাকেন, তবে তাঁর কন্যাকেই বা কেন ভয় করবেন না? এই বলে দু-পা রোশোনারার দিকে এগিয়ে জেবুন্নিসা তার ক্রুদ্ধ চোখ দীর্ঘ করে বলল—এখনও বলছি, বলুন জানীকে কোথায় রেখেছেন? না বললে সারা দিল্লীর প্রাসাদ অন্বেষণ করে আমি তাকে বের করব। এই প্রাসাদের কোথায় কোথায় গোপন চোরকুঠরী আছে তা আমার নখদর্পনে। সুতরাং যদি নিজের জানের জন্য এতটুকু মায়া থাকে, তাহলে জানী কোথায় আছে বলে দিন শাহাজাদী।

রোশোনারা ছোরা দেখে একটু ভীতা হয়েছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কুলসমকে ইসারা করতে জেবুন্নিসা তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—শাহজাদী রোশোনারার কি এখনও ধূর্ততা স্তিমিত হবে না? তাহলে কি বাধ্য হয়ে এই ধারাল বক্রাকার ছোরাটি দিয়ে আজকের এই প্রত্যুষে মোগল হারেমে শাহজাদী রোশোনারার শোণিতে গোসল সারতে হবে?

রোশোনারা নিজের সংযম রক্ষার জন্যে তাঁর রক্তিম ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বললেন—কিন্তু অনাবশ্যক সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে আমার ওপর। আমি জানলে নিশ্চয় গোপন করতাম না।

জেবুন্নিসা আবার রুক্ষস্বরে বলল—শাহজাদীরা মিথ্যা কথা বলে বাইরের লোক না জানুক, মোগল হারেমের ঐ তাতার প্রহরিণী পর্যন্ত জানে। সুতরাং বৃথা মেজাজে উষ্ণতার ছোঁয়াচ না পরিয়ে সত্বর জানীকে হস্তান্তর করার আয়োজন করুন নতুবা—। জেবুন্নিসা আর কালক্ষেপ না করে আরও দুপা এগিয়ে গেল।

রোশোনারা সভয়ে তাঁর পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে চীৎকার করে বললেন—কুলসম, দেখছিস্ কি! প্রাসাদে কি কোন প্রহরী নেই? না, সমস্ত রাজপ্রাসাদ শূন্য হয়ে আমার পিতা সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে আগ্রার কারাগারে বন্দী হয়েছে? ডেকে নিয়ে আয় যাকে পারিস এখুনি। আমার ঔরঙ্গ ভাইজানের বেটি জেবের হাত থেকে বাঁচা! শেষের দিকে রোশোনারার কণ্ঠ ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল। রোশোনারা এই বলে যখন উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন তখন জেবুন্নিসা এগিয়ে গিয়ে তার ধারাল ছোরা উত্তোলন করেছে। মুখে সে বলল—এখনও যদি শাহজাদী রোশোনারা কবুল না করেন, তাহলে পৃথিবী থেকে তাঁর নাম চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

রোশোনারা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন— শেষ পর্যন্ত ভাইজানের কন্যার কাছে আমাকে হার স্বীকার করতে হ'ল! খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি জানীকে 'চুরি করে আনাইনি।

জেবুন্নিসা ধমক দিয়ে বলল—আবার মিথ্যে কথা!

ঝুটা বাত না, সত্যি কথা।

জেবুন্নিসা তখন গতরাত্রের ঘটনা বিবৃতি করে বলল—তাহলে কি বুঝতে হবে এসব অন্য কারুর কারসাজি?

রোশোনারা মাথা নেড়ে বললেন—আমি ঠিক বলতে পারব না।

এই সময় কক্ষের মধ্যে এক তাতার প্রহরিণী এসে জেবুন্নিসাকে বলল—এক অশ্বারোহী সৈনিক আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

জেবুন্নিসা তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল—আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী! আচ্ছা, নিয়ে এস এখানে।

অনতিবিলম্বে এক অশ্বারোহী সৈনিক এসে রোশোনারা ও জেবুন্নিসাকে কুর্নিশ জানিয়ে জেবুন্নিসাকে বলল—আমি আপনাকে এক সংবাদ জানাতে এসেছি। গতরাত্রে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোর কয়েকজন সৈনিক এই প্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল এবং তারা রাত্রি

শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে দারাশিকোর কন্যা জানী বেগমকে আপনার কক্ষ থেকে অপহরণ করে নিয়ে পালিয়েছে। যখন তারা প্রাসাদ তোরণদ্বারের কটক খুলে পলায়ন করে, সেইসময় প্রহরীরা তাদের দেখতে পেয়েছিল। আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলাম কিন্তু বাদশাহী অশ্বারোহী বাহিনী এত দ্রুত চোখের আড়ালে চলে গেল যে তাদের ধরতে সক্ষম হলাম না। লোকটি আর দ্বিতীয় কথা না বলে আবার কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল।

জেবুন্নিসা কোন কথা না বলে কক্ষ থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে হঠাৎ রোশোনারা ব্যঙ্গস্বরে বললেন—কী, ঔরঙ্গকন্যা জেবুন্নিসার বাহাদুরী ফুরিয়ে গেল? তারপর ক্ষিপ্তস্বরে বললেন—হ্যাঁ, আমারও নাম রোশোনারা। আমার শক্তির কথা তোমার নিশ্চয় অবিদিত নয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য পিতার হস্ত থেকে ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করতে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে আজ এখানে পৌঁছেছি, ঔরঙ্গ আমার শক্তির কাছে হার স্বীকার করে নিজেই বলেছে, 'বহিন্ তুমি অন্তঃপুরচারিনী হয়ে যে কৌশলের ক্ষমতা দেখালে আমি তোমার কাছে তার জন্য বশ্যতা স্বীকার করছি। আমার হারেমের সমস্ত ভার নিয়ে তুমি আমায় মৃত্যু পর্যন্ত সাহায্য কর।' সুতরাং সেই শক্তিমান বীর ঔরঙ্গজেব আমার পদানত। আর তারই কন্যাকে ভয় করে পরাজিত সৈনিকের মত মাথা নত করব সে বাঁদী আমি নয়। আমি শুধু অপেক্ষা করছি, ভাইজানের ফেরার জন্য। তারপর কি করে মোগলহারেমের বেসরম আওরৎকে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে?

জেবুন্নিসা কোন কথা না বলে ভাল করে ইস্পাহানি ছোরাটা কোমরবন্ধে গুঁজে নিয়ে দাঁত দিয়ে গোলাপী অধর কামড়ে ধরে কক্ষ থেকে ইখ্‌তিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। শুধু যাবার সময় জেবুন্নিসা দেখতে পেল—রোশোনারার ধুসরবর্ণের চোখের তারা দুটোর নীলাভ দ্যুতিতে কি বিজাতীয় আক্রোশ ফুলে ফুলে উঠছে। জেবুন্নিসা যে বিষাক্ত কাল নাগিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিল, মিথ্যে নয়। চোখে যেন ঠিক সর্প দংশনের মত আক্রোশ। এখুনি যদি সে জেবুন্নিসাকে টুকুরো টুকুরো করে দিতে পারত তাহলে বুঝি তাঁর ক্রোধ খানিকটা প্রশমিত হত। কিন্তু ঔরঙ্গজেব না ফেরা পর্যন্ত কোন কিছু সমাধানে আনতে রোশোনারার বোধ হয় ভয় ছিল তাই হয় তো শুধু আস্ফালন করেই ক্ষান্ত থাকলেন।

কিন্তু পিতা ফিরে এলে যে দারুণ বিস্ফোরণ মোগল হারামের মধ্যে তাকে নিয়ে সৃষ্টি হবে সে কথাও মনে মনে জেবুন্নিসা চিন্তা করল। শাহজাদী রোশোনারার সঙ্গে করুণাময়ী সম্রাট দুহিতা জাহানারা কোনদিনই পারেননি, তাঁর সঙ্গেও সবসময় কলহ চলত। রোশোনারার স্বভাব সম্রাট শাহজাহান খুব ভালভাবেই জানতেন। তাঁর মত মন্দস্বভাবের আওরৎ মোগল হারেমে একটিও জন্মগ্রহণ করে নি। পিতা ঔরঙ্গজেব সুযোগ বুঝেই এই ভগিনীর সঙ্গে গোপনে পত্র আদানপ্রদান করে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিলেন। আজ সেই রোশোনারা নিজের দৌত্যের ওপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভাইকে মুঠির মধ্যে পুরেছে। জেবুন্নিসার সন্দেহ, পিতা তাঁর ভগিনীর কথা শুনবেন না তার কন্যার কথা! পৃথিবীতে কাকে রাখলে তাঁর স্বার্থসিদ্ধি পূর্ণমাত্রায় হবে তারই ওপর চলবে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। বোঝা যাচ্ছে না, এর শেষ কোথায়? পিতা ঔরঙ্গজেব মোগলহারেমের সুশৃঙ্খলা বিধানে কোন পথ অবলম্বন করে কাকে রাখবেন আর কাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন!

সায়াহ্নের ধূসরছায়া দিল্লীর আকাশে। একঝাঁক পাখী আকাশের উর্ধ্বমার্গ দিয়ে দলবেঁধে উড়ে চলেছে। তারা ইরান থেকে এসে কাবুলের পথে যাবে কি, আরাকানের দস্যুর দেশ থেকে এসে পারস্যের ভূমি ছোঁবে, কোন কিছুই বোঝা যায় না। তবে দূরদেশে পাড়ী জমাবার জন্যেই তাদের গতিবিধি দূরগামী। ভারতের দক্ষিণপূর্বে বঙ্গদেশেও তাদের গন্তব্যস্থান হতে পারে।

সামনে ক'জন ঘোড়সওয়ার, পিছনেও তাই। মাঝখানে একটি রাজসিক শিবিকা। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত। শিবিকাবাহী আশাসোঁটার দল রকমারী পোষাকে সাজিয়ে স্কন্ধে শিবিকা ধারণ করে বিচিত্র শব্দ করতে করতে দিল্লীর নগর প্রদক্ষিণ করছে। শিবিকার অভ্যন্তরে আছে ঔরঙ্গজেবের দুইকন্যা জিনৎ ও জেবুন্নিসা। জিনতের ভ্রমণের উদ্দেশ্য দিল্লীর জুম্মা মসজিদে গিয়ে আল্লাকে দর্শন করা ও নামাজ পড়া; জেবুন্নিসার কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য। সে ভ্রমণে বেরিয়েছে নগর প্রদক্ষিণ করতে। বহুকাল সে দিল্লীর নগর প্রদক্ষিণ করেনি। দিল্লীর প্রাসাদের মধ্যে বন্দী হয়ে শুধু তার অভ্যন্তরে ঘুরপাক্ খেয়েছে, তাও অন্তঃপুরের বেষ্টনীর মধ্যে। অন্তঃপুরের বেষ্টনী দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায় দেখেছে, কিন্তু আকাশের বিশাল রূপ দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। অন্তঃপুরে থেকে রাজসিক আদব

কায়দার মধ্যে দিয়ে শুধু চোখের ওপর ঐশ্বর্যের ঝকমক দেখেছে। মাটির স্নিগ্ধ রূপের মধ্যে বিচিত্র শ্যামলিমার সবুজ শোভা দেখার সৌভাগ্য তার হয় নি। যদিও হারেমের পুষ্পোত্থানে বহু ফুলের সমারোহ, বহু সবুজের ছড়াছড়ি, তবু যেন তার সজীবতা কৃত্রিম। তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন বড় কম।

তাই তার বহুকালের ইচ্ছা, একবার সে নগ্ন পায়ে ঘাসের সুকোমল শয্যার ওপর দিয়ে, আকাশের বিশাল তল দিয়ে ছোট মেয়েটির মত স্বাধীন-ভাবে ঘুরে বেড়াবে। কেউ নিষেধ করবে না। বাঁদীরা পিছু পিছু ঘুরবে না। প্রহরীরা পাহারা দেবে না। রাজরোষের রক্তচক্ষু তার চলার পথে ক্ষুরধার দৃষ্টি স্থাপন করবে না। সম্পূর্ণ সহজজীবনের মত, গরীবি মন নিয়ে গরীবের ঘরে বেড়ে ওঠা আওরতের মত সাধারণ আকাঙ্খা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু সে ইচ্ছা তার মনের তিমিরেই স্বপ্নের মত লালিত হয়ে থাকে। বাইরের প্রকাশে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে গেলে বাদশাহের হারেমের ইজ্জতের হাজার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। তাই তার ইচ্ছা মনেই থাকে, বাইরে প্রকাশ হয় না।

তবু সে মাঝে মাঝে শিবিকাবাহী হয়ে দিল্লীতে এলে দিল্লীর পথেও বেরিয়ে পড়ত। আগ্রাতে গেলে আগ্রার পথেও বেরিয়ে পড়ত। দাক্ষিণাত্যে যখন থাকত, দৌলতাবাদের পথেও তার দর্শন পাওয়া যেত। ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্বের এই নেশা তাকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত। কিন্তু তার দুঃখ, সে একা কোথাও যেতে পারত না। গেলে শিবিকায় চড়তে হত, সামনে পিছনে, ঘোড়সওয়ার নিয়ে পথ চলতে হত। পথে কোথায় নেমে চলতে চাইলে অশ্বারোহী পথ আটকে দাঁড়াত। তার মনের স্বপ্ন বিতৃষ্ণায় নিঃশেষিত হয়ে যেত, প্রকৃতির আকর্ষণ তার মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত।

শাহজাদী হয়ে জন্মে সে তাই সর্বদা মনের মধ্যে আক্ষেপ করত।

এদিন দুইবোনে তাই বেরিয়েছিল নিজেদের মনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে।

দিল্লীর সমস্ত নগর সেই শিবিকা ঘুরল। শিবিকার দুপাশের দরজার ওপর মখমলের পুরু ঘেরাটোপ। মাঝে মাঝে অশ্বারোহী চীৎকার করতে লাগল—হঠ্ যাও, সম্রাট ঔরঙ্গজেব কন্যা জিনৎ ও জেবুন্নিসা।

সম্রাট শাহজাহান এই দিল্লীর নগরাকে সুশিক্ষিত করে তার নাম দিয়েছেন শাহজানাবাদ। শাহজানাবাদের প্রতিটি পথ সুরক্ষিত ও সুসংস্কৃত। তবে মনের মত করে আরও সুন্দরভাবে গড়তে পারতেন যদি না তাঁর পুত্ররা হঠাৎ সিংহাসন নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করত। সেজন্যে তাঁর কল্পনার নতুন নগর অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছিল। তবু পুরাতন দিল্লীর পাশে রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে যে নতুন নগর 'শাহজানাবাদ' নির্মাণ করিয়েছিলেন তার স্মৃতি অবিনশ্বর। জগতে যেমনি তাঁর নতুনরূপে নির্মিত 'ময়ুরসিংহাসন' প্রশংসা পেয়েছে, পেয়েছে তাজমহলের অপূর্ব কীর্তিমহিমা তেমনি দিল্লীর 'শাহজাহানাবাদ' অপূর্ব নগর বলে তখনকার দিনের একটি কীর্তির নিদর্শন হয়ে আছে।

এই দিল্লীকে একদিন ত্যাগ করে 'জেলালদিনাস' ওরফে আকবর তাঁর রাজধানী আগ্রায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। দিল্লীর ওপর তাঁর বীতশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। তাঁর পিতা 'এমায়ুমিস্' ওরফে হুমায়ুন এই দিল্লীর প্রাসাদের ছাদে যষ্টিহাতে পদচারণা করতে করতে অজান্তে ছাদের প্রান্তদেশে উপস্থিত হন। তাঁর যষ্টি স্খলিত হওয়ায় তিনি ছাদ থেকে নিম্নস্থ উদ্যানে পড়ে যান। এরূপ অকস্মাৎ ও ভয়ঙ্কর পতনই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

জেলালদিনাস ওরফে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীতে আর রাজধানী রাখলেন না। দিল্লীর প্রাসাদে পিতার মৃত্যুতে প্রাসাদকে তিনি অভিশপ্ত বলে মনে করলেন। এবং এই অভিশপ্ত প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে তিনি সত্বর স্থান নির্ণয় করতে লাগলেন।

তখন যমুনাতীরে অবস্থিত আগ্রা নামে একটি নগর ছিল। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে আগ্রানগরী বিশেষ প্রসিদ্ধ। আফগানদের ভারতবর্ষে আগমনের বহুপূর্ব থেকে আগ্রা নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। হিন্দুদের লেখা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যমুনানদী পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। হাসারাবাদের কাছে যেখানে প্রথমে যমুনা দেখা যায় সেই স্থান থেকে নদী এরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়েছে যে, এখানে হস্তী পতিত হলেও তৃণের ন্যায় ভেসে যায়।

সেকেন্দার লোদি গোয়ালিয়র আক্রমণ করবার জন্য যাত্রা করে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে আগ্রায় উপনীত হন, এবং তাঁর রাজধানী আগ্রা নগরীতে উঠিয়ে আনেন। পরিশেষে, সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্রাট বাবর সেকেন্দার লোদির পুত্র ইব্রাহিমকে পরাজিত এবং দিল্লী ও সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করে যমুনানদীর অপর পারে এক মনোহর বৃহৎ উদ্যান রচনা

করেন। উদ্যানের একপার্শ্বে চারিতল বিশিষ্ট সবুজ মর্মর প্রস্তরের একটি সুচারু মণ্ডপ নির্মিত করেন। এর চারিদিকে মসৃণ মর্মরের স্তম্ভবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ এবং তার ওপর গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজের পরিধি ছিল ৩৭ ফিট। মঞ্চের ভেতরের ছাদে নানাপ্রকার আশ্চর্য কারুকার্য বিশিষ্ট স্বর্ণখচিত সুশোভন চিত্রসমূহ অঙ্কিত করা হয়েছিল। বাগানের ভেতরে দুই ক্রোশ দীর্ঘ একটি আচ্ছাদিত পথ প্রস্তুত হয়েছিল, এর দু'পাশে ৯২ ফিট উচ্চ সুপারী বৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। এই সব দীর্ঘ ও সুন্দর বৃক্ষ দিয়ে পথটি অতিশয় মনোরম করা হয়েছিল। বাগানের মধ্যদেশে একক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট একটি সরোবর খনন করা হয়েছিল, তার চারদিকে প্রকাণ্ড প্রস্তরের আসন ছিল।

বাগানটি সাতশত পঞ্চাশ বিঘা বিস্তৃত ছিল এবং এর নাম ছিল 'বেজুগই গুলাফসান' (গোলাপ গন্ধ বিস্তারকারী)। এই বাগানে নানা প্রকার বিদেশী ফলের বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। সেই থেকে এই সব ফল ভারতে জন্মাচ্ছে। এই সব ফল ছাড়া হিন্দুস্তানের যে সমস্ত ফলের বৃক্ষ এখানে পর্যাপ্ত ছিল, তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এছাড়া নানা রকম গোলাপ এবং চামেলির বৃক্ষ ছিল। চামেলী পুষ্প ভারতীয় ফুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। গুলাফসানে এত বিচিত্র প্রকারের পুষ্পবৃক্ষ ছিল যে তার তুলনা হয় না এবং তা সৌন্দর্যে ও সৌরভে অবর্ণনীয়।

কিন্তু আগ্রা অতি প্রাচীন কাল থেকে দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আকবর সিংহাসনে বসে দিল্লীকে ত্যাগ করে তাঁর জন্মভূমি, এই আগ্রাকেই আবার নতুন করে গড়তে লাগলেন। সমস্ত দুর্গ ভেঙে ফেলে প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্মিত দুর্গ দিয়ে আগ্রানগরী বেষ্টন করলেন। আগ্রাদুর্গ রক্তবর্ণের প্রস্তর দিয়ে পুনর্নির্মিত হল। এই নবদুর্গের চারটি প্রধান প্রবেশদ্বার এবং দুটি ক্ষুদ্র দ্বার প্রস্তুত করা হয়। বস্তুতঃ এমন সর্বাঙ্গ ও মনোহররূপে নির্মিত হয় যে, দেখে মনে হত এটি একটিমাত্র প্রস্তর দিয়ে নির্মিত। এই দুর্গ প্রস্তুত করতে ২৬কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই সময়ে সম্রাটের আদর্শানুসারে রাজ্যের প্রধান প্রধান ধনিগণ নগরের মধ্যে চমৎকার অট্টালিকা এবং মনোহর উদ্যানসমূহ নির্মাণ করেছিলেন। এই নগরী যমুনা নদীর উভয় তীর বেষ্টন করে বিদ্যমান, এবং আয়তনে ও লোক সংখ্যায়ও অতুলনীয় হয়ে উঠল। বহুসংখ্যক কারুকার্য খচিত সুবৃহৎ ও সুশোভন অট্টালিকা ও মসজিদ, মনোহর স্নানাগার এবং বিশাল প্রমোদগৃহ সমূহে নগরী পূর্ণ হয়ে গেল।

শাহনসাহ জেলালুদ্দীন আকবর এই আগ্রার প্রাসাদের সীমা মধ্যে তাঁরা অভিজাতবর্গের আবাস, রাজভাণ্ডার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, দোকানদার, কারিগর, চিকিৎসক, নরসুন্দর এবং সমস্ত রাজভৃত্যের বাসস্থান নির্মাণ করলেন। এই গৃহগুলি চুণ না দিয়ে এরূপে রক্তপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত যে জোড় একেবারেই বুঝতে পারা যায় না। তিনি দুজন রাজাকে স্বহস্তে বধ করেছিলেন। তাঁর মহত্ব ও যশোমণ্ডিত যুদ্ধের কীর্তিস্বরূপ তিনি তাঁদের হস্তীর ওপর আরূঢ় দুটি মূর্তি নির্মাণ করিয়ে সিংহদ্বারের দুপার্শ্বে স্থাপন করলেন। জলবায়ুর উৎকর্ষ, ক্ষেত্রের উর্বরতা, নদী, মনোরম উদ্যান, সর্বপ্রকার ব্যক্তির সমাগম ও নগরের পরিমাণে আগ্রা আশেপাশের সমস্ত নগরকে পরাজিত করেছে। আগ্রা দৈর্ঘ্যে চারমাইল ও প্রস্থে ২ মাইল। মনুষ্যের জীবনযাত্রার জন্য এরূপ কোন দ্রব্যই আবশ্যক হলে আগ্রা তা পরিবেশন করতে কার্পণ্য করত না। প্রয়োজন হলে সুদূর ইয়োরোপ হতেও আনীত হয়ে নানা সামগ্রী নগরে সঞ্চিত করা হ'ত। এ নগরে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী, সূত্রধর স্বর্ণকার তাদের ব্যবসার ডালা নিয়ে বিপণি সাজিয়েছিল। প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারস্য ও তাতার দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যেত।

একটি মৃত জনপ্রাণীহীন নগর হঠাৎ সোনার কাঠির পরশ পেয়ে জেগে উঠল। রাতারাতি কোথা থেকে যে সেই নগরে লাখো লাখো লোক এসে ভীড় বাড়িয়ে ফেলল, তা বোঝা গেল না। কত দেশের কত লোক। কত রকমের কত পোষাক। কত দেশের ভাষা। সর্বোপরি শাহনশাহ আকবর। তৈমুর বংশের নতুন বীর্যবান হিন্দুস্থানের বর্তমান বাদশাহ যেন নতুন সৃষ্টির আনন্দে জগতের চোখে এক নতুন রোশনাই জেলে দিলেন।

কিন্তু মানুষের জীবনে প্রায় যেরূপ ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা সংঘটিত হল। সমস্তই প্রস্তুত, নবদুর্গ, প্রাসাদে বাদশাহ, তাঁর রাজধানী সবই স্থানান্তরিত। এমন সময়ে ঈশ্বরের আদেশে প্রেতের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হল, প্রেতগণ ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল, প্রত্যেক দ্রব্য ওলোট পালট করে, স্ত্রীলোক ও বালককে ভীতি প্রদর্শন ও লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে অনিষ্ট সাধন করতে লাগল। এমন অনিষ্ট দিনের পর দিন সংঘটিত হতে লাগল যে সহ্যের অতীত হয়ে উঠল। প্রেতগণ বাদশাহের সন্তানদের ওপর আক্রমণ করল। জন্মের দু' তিনদিন পরে তাদের মৃত্যু হতে লাগল। এইভাবে

একসঙ্গে দু' তিনজনের মৃত্যুঘটায় বাদশাহ আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠলেন। শেষে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী থাকবে না চিন্তা করে সম্রাট আকবরের দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হল।

শেষে সেলিম চিস্তী ফকীর, যিনি আকবরের পরবর্তী ও একটি মাত্র সন্তানের জীবন রক্ষা করেছিলেন, পরে যিনি আকবরের সিংহাসনে শাহজাদা সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে বসেছিলেন, সেই সন্তানের জীবন দাতা ফকীর সেলিম চিস্তী সম্রাট আকবরকে অবিলম্বে আগ্রা ত্যাগ করে শিক্রিতে রাজধানী ও আবাসস্থল স্থানান্তরিত করতে বললেন। সম্রাট জেলালুদ্দিন শাহনশাহ আকবর গুরুর কথানুযায়ী আগ্রার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে শিক্রির মরুভূমির ওপর মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল রাজধানী স্থাপন করলেন।

যমুনার কোলে পড়ে থাকল সমৃদ্ধশালী আগ্রানগরী। আবার জেগে উঠল ঐ সোনার আগ্রার মত আর একটি সোনার নগর—সে হলো শিক্রি। ইতিহাসে আকবরের এই ফতেপুর শিক্রি জগতে এক নতুন কীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগ্রার মতই সেখানে নির্মিত হল নতুন প্রাসাদ, নতুন কারুকার্যে সৌন্দর্যশালী নগরীর প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সম্ভার। শিক্রির অন্ধকার পরিবেশকে আলোর মালায় বিভূষিত করে অলঙ্কারের রোশনাইতে চমকে দিয়ে মানুষের কলকাকলিতে মুখরিত করে দিয়ে নতুন স্বর্গ তৈরী হল।

আগ্রা ও দিল্লীর অন্ধকার পরিবেশকে আবার আলোর পথে নিয়ে আসেন সম্রাট আকবরের পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ। তিনি পিতার দেহ সেকেন্দ্রায় সমাধিস্থ করে আগ্রায় এসে আবার রাজধানী করেন। এবং নতুন করে আবার আগ্রাকে জাগিয়ে তুলে নগরীকে সুসংস্কৃত করে রাজকার্যে মন দেন। সেইসময় দিল্লীর প্রাসাদের ফটকও আবার বাদশাহের আগমনে মুক্ত হয়। দিল্লীও জেগে ওঠে।

তবে সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর রাজধানী ও নগরীকে যে রকম সুসংস্কৃত করে এক নতুনরূপে একটি কল্পিত চিত্রের মত তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেরকমটি এর আগের কোন বাদশাহ চেষ্টা করেননি। সম্রাট শাহজাহান তাই তাঁর সৃষ্টির নতুন স্থানটির নাম তাঁরই নামকরণে 'শাহজাহানাবাদ' রেখেছিলেন। তবে সাধারণতঃ লোকে বলত 'জাহানাবাদ'। আগ্রার পরবর্তী সংস্কারও এই বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল।

শাহজাহান তাঁর জাহানাবাদ নগরীটি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করেছিলেন শুধু পাশেই যমুনার খরস্রোত প্রবাহিত হতে দেখে। আগ্রার পাশেও যমুনা। সেখানে যমুনা তার বক্ষ প্রসারিত করে প্রবহমান। দিল্লীর উপকূলে তখন এই যমুনার শান্ত প্রবাহমান স্রোতধারা শিল্পী শাহজাহানের চক্ষুকে অভিভূত করেছিল।

লাহোর গেট দিয়ে শরীর রক্ষীদের হেফাজতে শিবিকার দ্রুত চলমান তালে দুটি উৎসুক রমনীর চারটি চোখ শুধু বুভুক্ষার মত মখমলের ঘেরাটোপের ফাঁক দিয়ে দিল্লীনগরীর পথঘাট দেখতে লাগল। সুন্দর সুরম্য পথ। পথের দুপাশে সবুজ সুকোমল তৃণের শয্যা। উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে নানারঙের নানাফুলের সমারোহ। দুপাশে বৃহৎ বৃহৎ আকাশ প্রমাণ সাইপ্রাস বৃক্ষ।

নিখুঁত করে রাজধানীর রাজপথ সুসংস্কৃত। এক একটি মনোরম সুন্দর বাড়ী চোখে পড়ছে, বাড়ীটি কোন ওমরাহ অথবা মনসবদারের হবে। পাথর বা ইটের বাড়ী সাধারণত পথের দু-পাশে খুব কম। শুধু খড়ের চাল ও মাটীর দেয়ালের বাড়ীই বেশী।

ওদের শিবিকার চলমান ধ্বনিতে, অশ্বারোহীদের অশ্বের পায়ের তীব্র খট্ খট্ শব্দতে ও অশ্বারোহীদের 'তফাৎ যাও' চীৎকারে পথবাসী তাদের ব্যস্ততা ভুলে এদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু দুইবোনেই লক্ষ্য করল, অন্যবারও এই পথবাসীরা এমনি অবাক চাউনি নিয়ে প্রাসাদের বাদশাহের আওরৎদের প্রলুব্ধ হতে দেখে। তবে তাদের সে দেখার সঙ্গে এবারের দেখার যেন অনেক তফাৎ। তাদের চোখেমুখে লেগে আছে ভয়ের কালিমা। এক জায়গায় দেখা গেল বেশ কিছু নরনারী। অশ্বারোহী বাহিনীর মুখ থেকে হুঙ্কার ধ্বনি শ্রুত হয়ে এবং ঔরঙ্গজেবের দুই কন্যার নাম শুনে তারা দৌড়ে পালাল।

শিবিকার ভেতরে জিনৎ ও জেবুন্নিসা পরস্পরে চাওয়াচায়ি করে দুজনেই মাথা নত করল। দুজনেই যখন আবার চোখ তুলল, আবার ওদের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হল। দুজনের দৃষ্টিই সজল। জেবুন্নিসা ম্লানকণ্ঠে বলল—জিনৎ বহিন, চ প্রাসাদে ফিরে যাই। মানুষের কাছ থেকে সেলাম নিতে গেলে যে শাসনের রক্তচক্ষু দেখালে হয় না তার প্রমাণ আজকের দিল্লীর মানুষেরা।

ওরা যেই শুনেছে আমরা ঔরঙ্গজেব-কন্যা! এই বলে জেবুন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

জিনৎ কোন কথার উত্তর দিল না। শুধু ম্লান হেসে শিবিকার বাইরে দিল্লীর শেষ সূর্যাস্তের আকাশের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকল। হয়ত তার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত টলমল করছিল।

আবার শিবিকা চলল। আবার রাজকন্যাদের ভ্রমণের বার্তা জলদ গম্ভীর-স্বরে দিল্লীবাসীদের কানে পেঁছেতে লাগল। তারা নানাকার্যের মধ্যে তাকাতে লাগল এই রাজসিক শিবিকার দিকে। জেবুন্নিসার বড় বিরক্ত লাগছিল, তাদের নামোল্লেখ করে এই হুঙ্কারধ্বনি, সে হুঙ্কারধ্বনির পেছনে জনসাধারণের শ্রদ্ধার চেয়ে অশ্রদ্ধার ভাবই যখন প্রকাশ হচ্ছে তখন কেন এই ধ্বনি-প্রকাশ। হয়ত পিতা ঔরঙ্গজেব শুনলে সমস্ত দিল্লীবাসীদের গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের মুণ্ড দেহ থেকে নামিয়ে দিয়ে তাদের নিঃশেষ করে দেবেন। কিন্তু কি লাভ? তাই করলে কি মানুষের শ্রদ্ধা কুড়োন যায়? বরং নৃশংসতার মধ্যে মানুষের নীরব অভিসম্পাতই মনুষ্য জীবনের শান্তি বিনষ্ট করে।

হাজারো হাজারো চমকদারি জাঁকজমকপূর্ণ পণ্যদ্রব্যের বিপণির সামনে দিয়ে শিবিকা ছুটে চলল। হঠাৎ দুই বোনের দিল্লীর বাজারের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করল। তাই তারা মখমলের ঘেরাটোপ সরিয়ে রক্ষী সিপাইকে আদেশ করল শিবিকা থামাবার জন্যে। শিবিকা থামালে দুইবোন শিবিকা থেকে নেমে রক্ষীদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তারা বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাজারে বহু ধরনের লোক। খানিক চলবার পর তারা সাধারণ লোকের মত অন্যান্য মানুষের ভীড়ে মিশে গেল। জেবুন্নিসা ও জিনতের মাথার ওপর ওড়নার আবরণ। অবগুণ্ঠন ছাড়া কোন বয়স্থা মুসলমান মেয়ে পথ চলে না। ওরাও সেই প্রথাটা পুরোপুরি বজায় রাখল। ওদের সুবিধে হল। ওদের কেউ চেনে না। যে সব আমীর, ওমরাহ, এক হাজারী, দু হাজারী, পাঁচ হাজারী মনসবদার তাদের ওজনভারী পোষাকে ওজনভারী মান নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও মোগল হারেমের এই রমণীদের চেনে না। সুতরাং ওদের সুবিধে হল। আগেপিছু শরীররক্ষী না নিয়ে হুঁসিয়ার ধ্বনিতে কান ঝালাপালা করে মহারানীর মত পথ চলার চেষ্টা নয়—সম্পূর্ণ আলাদা,

স্বাধীন। বাজারের প্রত্যেকটি লোকের মত তাদের চলার পথ নিজের খুসীতে সীমাবদ্ধ। ওদের পরনের পোষাক ছিল রাজসিক, তবে সে ধরনের পোষাক পরে বহু রমণীই বাজারের বিপণিতে বিপণিতে সওদা করে ফিরছে।

জেবুন্নিসা হঠাৎ জিনতের ওড়নার খুঁটটা ধরে একটু টান দিয়ে কাছে আনল। তারপর মিষ্টি একটু হেসে সামনের একটি দোকানের এক মুসলমানী পানওয়ালীর দিকে তাকিয়ে বলল—পান খাবি? তাম্বুলরাঙা অধরের মিষ্টি হাসি সমস্ত ঐশ্বর্যের রোশনাইকে চমকে দেয়।

সামনেই একটি চমৎকার সাজানো গুছানো দোকান। দোকানের মধ্যে বহু-সংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুসের মধ্যে থেকে স্নিগ্ধজ্যোতি বিকিরণ করছে। দেয়ালে নানাবর্ণের কাগজ মোড়া, নানাপ্রকার ছবি লটকান, তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্দার। বেশীর ভাগ চিত্র মুসলমানী আওরতের। বেহেস্তের হুরীর মত খাব্সুরত সুন্দরী রমণী বিচিত্র ভঙ্গি করে বক্ষের রত্ন শোভাকে কাঁচুলির বন্ধনে লোভাতুর করে চিত্রের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। সেইদিকে বহু রাজপুরুষ সৈনিকের চোখ। তাদের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। তা ছাড়া দোকানের অধিকারিণী তাম্বুল বিক্রেতা কুরূপা নয়, বেশ সুন্দরী। বয়সও বেশ রঙ্দার। তার আকর্ষণেও বহু মরদ পুরুষের ভীড়।

তাম্বুল বিক্রেত্রীর চক্ষু বড় বড়, চাউনি বড় চঞ্চল, তাম্বুল রাঙা অধরের মধ্যে দন্তশ্রেণীতে সর্বদা হাসির মিষ্টি আকর্ষণ। তাম্বুল বিক্রেত্রী হেসে হেসে তার খরিদারদের সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলার ঢঙে মনে হচ্ছে এ মেয়ে-লোকের অসাধ্য কিছু নেই। জেবুন্নিসা তার দিকে তাকিয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করল। কিন্তু জিনৎ জেবুন্নিসার কামিজের খুঁট্ ধরে সলজ্জভঙ্গিতে বলল—না বহিন্, আমার ডর লাগে। দেখছ না, আওরৎটি কি রকম বেসরম বাতচীজ করছে!

এসব ক্ষেত্রে জেবুন্নিসার সাহস প্রচণ্ড। জিনৎ অতো সাহসের পরিচয় দিতে পারে না। তা ছাড়া তার একটু রমণীসুলভ সরমও ছিল। বহিনের স্বভাবের পরিচয় জেবুন্নিসার অজানা নয়। তাই সে বহিনের দিকে তাকিয়ে বলল—কিছু না, একটু মজা করতাম আর কি? তা যাক্, তোর যখন পছন্দ নয়, আমরা এগোই।

জিনৎ বলল—দেখ পিতা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ভারতের চারদিকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সময় মোগল সাম্রাজের ভীষণ দুর্দিন।

আমাদের সাবধান হয়ে চলা ভাল। বলা তো যায় না, আবার কখন কার কোপে পড়ে যাব।

জেবুন্নিসা জিনতের দিকে তাকিয়ে তাব কথাগুলি উপলব্ধি করল, তারপর একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল—তুই বড় দুর্বল আওরৎ জিনৎ, অত ডর থাকলে কি আর শাহজাদীর জীবন থাকে? শাহজাদী হয়ে জানের পরওয়া করতে নেই। এই বলে জেবুন্নিসা আবার বহিনকে আকর্ষণ করে বাজারের অন্যপথ ধরল।

দিল্লীর চাঁদনী চকের বাজার। লাখো লাখো দ্রব্যের ছড়াছড়ি সেই বাজারে। সারা ভারতের সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য এসে জমা হযেছে সেই দুর্লভ বাজারে। কী মেলে না এখানে? স্বর্ণ ও রজত ধাতু নির্মিত হাজার হাজার দ্রব্য মূল্যবান চমকদারী বিপণীতে সাজানো। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। চকের বাজারের চমকদার দোকানের নানাধরনের বাতির আলো। রঙে রঙে চারদিক শুধু রঙের হাট। নানারকম পুষ্পের সারি পুষ্পবিপণীতে। সেই বিপণীব পুষ্প সৌরভে সমস্ত অঞ্চলটি আমোদিত। আতর গোলাপের গন্ধ। চারদিকে শুধু বিচিত্র গন্ধের মাতন। কোথা থেকে ভেসে আসছে সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি। বহু জাতীয় বাদ্যের নিকণ। নর্তকীর চটুল পায়ের নূপুর নিক্কণ। মাঝে মাঝে আওরতের কণ্ঠের সুমধুর কেলোয়াতী ঢঙের গজল, ঠুংরী। গায়িকার কণ্ঠের সপ্তসুরের আরোহণ, অবরোহণ, তার সাথে বাদ্যের ঘটা। তাছাড়া সুরার পাত্রের মৃদুধ্বনি, খিচুড়ি-পোলাও, কোপ্তা, কাবাবের রসালো গন্ধ। জিবের রসনা তীব্র হয়ে ওঠে।

নরকের গুলজারের মত, বেহেস্তের জাঁকজমকের মত অদ্ভুত এই চাঁদনীর বাজার। এর মধ্যে ঘুরছে বহু আমীর, ওমরাহ মনসবদারকে খুনী করবার জন্যে বহু বিচিত্র ধরনের অবগুণ্ঠনবতী রমণী। তাদের অবগুণ্ঠনের আড়ালে সুরমা আঁকা চোখের চটুল দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে আসল শীকার। জেবুন্নিসা এমনি একটি অবগুণ্ঠনবতীর দৃষ্টির অর্থ পড়ে নিয়ে মনে মনে হাসল। জিনতের পাশ দিয়ে একজন ওমরাহগোছের ব্যক্তি একরকম জিনৎকে স্পর্শ করেই চলে গেল। এবং লোকটি পিছনদিকে ফিরেও তাকাল। তাই দেখে জিনৎ ভয়ে একেবারে জেবুন্নিসার গায়ের সঙ্গে মিশে গেল।

জেবুন্নিসা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। এই সুযোগে বহিনকে রঙ্গ না করে ছাড়ল না— যা না বহিন, ঐ মেহমান আদমীর সঙ্গে চলে যা না।

তাহলে মোগল হারেমের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবি। মনে হচ্ছে, ঐ আদমী কোন উচ্চদরের আমীর লোক। হয়ত তার অনেক ঐশ্বর্য। ওর বিবি হয়ে ওর ঘরে গেলে তোর আওরৎ জীবনের সমস্ত সুখ পাবি। কথাটা রঙ্গ করতে গিয়ে জেবুন্নিসা হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেল। জিনৎ একটা কিছু উত্তর বহিনকে দিতে যাচ্ছিল, হয়ত সে বহিনকে বলতে যাচ্ছিল— 'তার চেয়ে তোমারই সবচেয়ে বেশী দরকার। তুমি না কোন আদমীর কাছ থেকে মহব্বত চেয়েছিলে?' কিন্তু কথাটা বলা হল না। জিনৎ চুপ করে গিয়ে জেবুন্নিসার মুখের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকাল।

আবার ওরা এগিয়ে চলতে লাগল। কেউ আর কোন কথা বলে না। হয়ত জেবুন্নিসা ভাবছে—তাদের শাহজাদীর জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। মোগল হারেমের রাজৈশ্বর্যের মধ্যে থেকে তাদের জীবন শুষ্ক। তারা চোখের সামনে দেখবে তাদের বংশের শাহজাদারা অজস্র দেশবিদেশের খাবসুরত আওরতের কমনীয় জীবন ভোগ করবে আর তারা মোগল রাজবংশের সম্মান, প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে হারেমের পালঙ্কে শুয়ে কণ্টকের জ্বালা অনুভব করবে। কী বিচিত্র এই জীবন প্রণালী? মেহেরবান খোদার দুনিয়ায় কী বিচিত্র এই বিচার?

জিনতের খুব ভাল লাগছিল না। তার ভয়ও করছিল। সঙ্গে রক্ষী নেই। তারা বাইরে অপেক্ষা করছে। হয়ত তাদের খুঁজতেও লেগেছে। জেবুন্নিসার এই দুঃসাহস খুব ভাল না। এর জন্যে পিতা ফেরার পর না কোন গণ্ডগোল হয়! তাছাড়া জুম্মা মসজিদে গিয়ে আল্লাকে ডাকবার জন্যেই সে বহিনের সঙ্গী হয়েছিল, কিন্তু সেখানে যে শেষপর্যন্ত যাওয়া হবে না সে বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। প্রাসাদের ফটকের বেষ্টনি ভেদ করে হারেমে যেতে হবে। এখন শাহজাদী রোশোনারা বেগম সেই হারেমের কর্ত্রী। পিতা যাবার সময় তাঁকেই অন্তঃপুরের কর্ত্রীত্ব দিয়ে গেছেন।

হঠাৎ জিনতের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। এক বাজিকর একটি জোরালো আলোর সামনে পথের ওপর দারুণ এক খেলা সুরু করেছে। লোকটি কোন্ দেশীয় বোঝা মুস্কিল। তবে তার পোষাক দেখলে হাসি লাগে। সম্ভবত বাংলা-দেশের লোক বলেই মনে হল। বঙ্গদেশের কয়েকজন অদ্ভুতকর্মা ঐন্দ্রজালিক মোগল রাজপ্রাসাদে বহুবার আগমন করেছে। তারা বাদশাহকে খুশী করে বহু ইনাম নিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়

থেকে এই সব বাজীকরদের আগমন। এছাড়া অনেক পর্তুগীজরাও এইসব বাজিকরদের অনুকরণে অনেক খেলা দেখাত ; তবে তাদের দেখানোর মত খুব একটা আশ্চর্যজনক কিছু চোখে পড়ে না।

জিনৎ হঠাৎ বাজিকরের আকাশ ফাটানো চীৎকার শুনে তার দৃষ্টি সেদিকে সঞ্চালন করল। বাজিকর একজন নয় তার সঙ্গে আরো কয়জন লোক। বাজিকর একহাতে একখানি আয়না ধরল এবং অপর হাতে একটি গোলাপ পুষ্প। রক্তগোলাপটি আলোর মুখে এমন করে ধরল, দেখে বোধ হল যেন খানিকটা তাজা রক্ত চোখের সামনে তুলে ধরল। বাজিকর সেই পুষ্পটি আয়নার পশ্চাতে মুহূর্তের জন্য ধরে দর্শকের সামনে আনল। কিন্তু আশ্চর্য, সেই রক্তবর্ণের গোলাপটির রং সম্পূর্ণ অন্যবর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐরকমভাবে সেই একটি পুষ্পই বার বার আয়নার পশ্চাৎ থেকে ঘুরিয়ে এনে লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী, কালো, সাদা সমস্ত বর্ণের শোভা দর্শককে স্তম্ভিত করল।

যখন অজস্র দর্শক আনন্দে করতালি দিয়ে নিজেদের খুসী প্রকাশ করছে সেই সময় বাজিকর আবার একটি পক্ষীর পিঞ্জর উপস্থিত করল। পিঞ্জরের মধ্যে দুটি সুদৃশ্য নাইটিঙ্গেল পাখি। জোরালো আলোর সামনে প্রত্যেকেই দেখল, পিঞ্জরের মধ্যে দুটি সুন্দর নাইটিঙ্গেল। কিন্তু বাজিকর হঠাৎ হাসতে হাসতে পিঞ্জরটি একপাক ঘুরিয়ে দিল। থামলে দেখা গেল নাইটিঙ্গেল নেই, তৎপরিবর্তে সবুজবর্ণের দুটি টিয়াপাখী ঐস্থলে বসে আছে। তৎপরে আর একবার ঘোরাতে রক্তবর্ণের তিতির দেখা গেল। এইরকম ভাবে পিঞ্জরটি যতবার ঘোরানো হতে লাগল ততবার বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্রবর্ণের পক্ষী দেখা দিতে লাগল। শেষে দেশ-বিদেশের এত পাখী সেই পিঞ্জরের মধ্যে আসতে লাগল যে দর্শকরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

হঠাৎ জিনতের খেয়াল হল সে বাজারের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে এই বাজীকরের অদ্ভুত খেলা দেখছে। পাশে তার বহিন জেবুন্নিসা নেই। মাথাটা তার চড়াৎ করে ঘুরে গেল। একা মোগল হারেমের অবরোধ প্রথা ভেঙে বহির্জগতে কখনও সে আসেনি। সে চেনে না কোন পথঘাট। তার বহিন জেবুন্নিসা জানে সে কথা। সে কি তবে ইচ্ছে করেই তার আপন বহিনকে এমনি করে পথ হারিয়ে দিয়ে কোন দুষ্ট মতলবের আশ্রয় নিল? বলা যায় না, মোগল রাজপরিবারের আজ দুর্দিন। কেউ কাউকে আজ বিশ্বাস করছে না।

হঠাৎ জিনতের চোখের মধ্যে থেকে জল বাইরে বেরিয়ে এল। দিলের মধ্যে দারুণ একটা কম্পন সৃষ্টি হয়ে সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ওলোটপালট করে দিতে চাইল। সব শূন্য, সব কিছু নিঃস্ব। বাজারের আর কিছুই তার চোখে পড়ল না।

মনে এল, পিতা যখন শুনবেন, জিনৎ রাজ অন্তঃপুরের অবরোধ প্রথা ভেঙে কোথায় কোন গভীর রহস্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। শুনে তিনি দারুণ আস্ফালন করবেন। চারদিকে খোঁজবার জন্যে লোক পাঠাবেন। কিন্তু তিনি জানেন, আওরংকে খুঁজতে গেলে পথে পথে ঘুরলে হবে না। হয় জিনৎ কারও অন্তঃপুরের বিবি হয়ে সেখানে লুকিয়ে গেছে, নতুবা সরোবরের জলে ডুব দিয়ে শাহজাদীর অভিশপ্তজীবন থেকে মুক্তি নিয়েছে। তবে শাহজাদীরা সহজে আত্মহত্যা করে না, এও তিনি জানেন। তাদের জীবন যেমন অভিশপ্ত। তাদের বাঁচবার সাধও তেমনি অস্বাভাবিক। ধূপের মত পুড়ে পুড়েও তারা ঠিক তাদের শুষ্ক জীবন প্রবাহ টেনে নিয়ে যাবে।

একটু মাথাটার গোলমাল শান্ত হলে জিনৎ সামনের দিকে চোখ মেলে দেখল, তার বহিন জেবুন্নিসা একদৃষ্টে একটি দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে। জিনৎ তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জেবুন্নিসার দৃষ্টি অনুসরণ করে জিনৎ দেখল, তার বহিন তাকিয়ে আছে দোকানের পাশে ফেলে রাখা একটি 'ফরস্-ই-চন্দনী' চন্দন-কাঠের রঙের কার্পেটের ওপর। জিনতও দেখল, সেই কার্পেটটির কারুকার্য অদ্ভুত। এমন একটিও মোগল হারেমে আজকাল খুব বড় একটা দেখা যায় না।

জেবুন্নিসা পাশে জিনৎকে অনুভব করে ফিসফিস করে বলল, সম্রাট জাহাঙ্গীরের 'প্রিয়তমা মহিষী মোগল রাজঅন্তঃপুরের প্রথম খ্যাতিসম্পন্ন রমণী মেহেরউন্নিসা ওরফে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের তৈরী কারুকার্যমণ্ডিত 'ফরস্-ই চন্দনী'।

তিনি মোগলহারেমের সুন্দরীদের জন্য বহু পোষাকের প্রচলন করেছিলেন। আগে সুন্দরীর দল মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতেন। আবার কেউ কেউ বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্য অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ শোভা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে পরিধান করে বর্বরোচিত উৎকট উপভোগে আনন্দ অনুভব করতেন।

নূরজাহান মোগল হারেমের কর্ত্রী হয়ে অঙ্গাবরণের নতুনত্বের দিকে দৃষ্টি

আরোপ করলেন। পেশওয়াজের তুদামী, ওড়নার পাঁচ তোলিয়া, বাদ্লা, কিনারী, নিচোল, আঙ্গিয়া, নূরমহলী প্রভৃতি তারই আবিষ্কৃত রমণীর পোষাক। আপাদলম্বিত নিচোল যা রমণীর নিম্নাঙ্গের শোভা প্রকাশ করে, তার প্রবর্তন ক'রে তিনি রমণী জাতির বহু উপকার করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্ভ্রান্ত ললনাকুল তখনকার দিনে তারই অনুকরণে নিচোল ব্যবহার করত।

নূতন ধরনের একপ্রকার আঙ্গিয়া ও (কাচুলি) রমণীদের বক্ষবন্ধনী হিসাবে যথেষ্ট কাজে লাগে। নূরমহলী ডিজাইনের কাপড়ে প্রস্তুত বর-কনের কিংখাবের সাজপোষাক তামাম উত্তর ভারতের চারদিকে প্রভূত প্রসারলাভ করেছিল। এমনি কারুকার্যময় সুন্দর জাঁকজমক পূর্ণ পোষাক আর কখনও তৈরী হয় নি। তা ছাড়া 'দস্তরখান্' নামে একটি ভোজের গালিচা সজ্জিত করবার অভিনব প্রণালী ও উপায় উদ্ভাবন তাঁরই কৃতিত্ব।

আশ্চর্য এই গুণময়ী ললনার রন্ধন-নৈপুণ্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাটের তৃপ্তিসাধনের জন্য তিনি নিত্য নব মুখরোচক আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করতেন। সঙ্গীতেও নূরজাহনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তাঁর সুধাস্রাবী গীতি শ্রোতাকে শোক দুঃখময় জগতের কথা বিস্মৃত করত। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিদুষী রমণী বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মনাম নিয়ে পারস্য ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেছিলেন।

মোগল হারেমের পরবর্তী রমণীরা সকলেই এই গুণবতী রমণীর গুণের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হত। ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে স্বীকার করত না বটে কিন্তু 'চোখের সামনে তারা দেখতে পেত' নূরজাহানের কীর্তি কাহিনী। মোগলহারেমের প্রথম যশস্বিনী রমণী এই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নূরজাহান। হারেমের বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করে সুখানুভবের তীর্থে বিচরণ করা ছাড়া মোগল রাজবিদুষীদের আর অন্য কোন ইতিহাস নেই, এই দুর্ণাম প্রথম লঙ্ঘন করে মোগল হারেমের রমণীদের মনের দিকপরিবর্তনে অগ্রগামিনী হয়েছিলেন।' এবং তার সময় থেকে এই রাজঅন্তঃপুরের রমণীরা বিলাসজীবন ছাড়াও অন্য চিন্তায় সময় ব্যয় করত।

জিনৎ ও জেবুন্নিসা পরস্পরের দিকে তাকাল একবার। দুজনেই বোধ-হয় একই কথা ভাবছিল। তাই, দুজনেরই বক্তব্য কিছু প্রকাশ হল না। শুধু দৃষ্টি বিনিময় হল। দৃষ্টির অর্থের মধ্যে সেই হারানো মানুষটির জীবন-

কাহিনী আলোচিত হল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ওপর দাদু শাহজাহানের দুর্ব্যবহার সকলেই জানে। মোগল হারেমের রমণীরা কেউ কেউ এই রমণীর জন্য ব্যথাতুরা, কেউ কেউ আবার ঈর্ষান্বিতা হয়ে শাহজাহানকে সমর্থন করে।

দু'বোনে কিছুক্ষণ পথ চলার পর জিনৎ বলল,—বহিন্ আমাদের এবার ফিরে যাওয়াই উচিত। রাত্রি হয়ে গেল, আর তো জুম্মা মসজিদে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিন সেখানে যাব, আজ প্রাসাদে জল্‌দি ফিরে গেলেই ভাল হয়। হয়ত রক্ষী সিপাইরা খুঁজতে সুরু করেছে।

জেবুন্নিসা নিম্নস্বরে বলল—আর একটু বহিন। তোমার বহুৎ তক্‌লিফ হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু একবার জ্যোতিষির কাছে আগামী সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

জিনৎ মনে মনে একটু বহিনের ওপর ক্ষুব্ধ হল। পিতা দিল্লীতে নেই। সাম্রাজ্যের চারদিকে ঘোর অন্ধকার। এ সময় দিল্লীর প্রাসাদের বাইরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর পর্যন্ত থাকা অন্তত ঔরঙ্গজেবের কন্যাদের উচিত নয়। বহিনের এই দুঃসাহস যে মাত্রাতিরিক্ত এই কথা ভেবে রুষ্ট হয়ে জিনৎ চুপ করে থাকল।

জেবুন্নিসার মনে তখন শিল্পসৌন্দর্যের ভাব। তার মনে দিল্লীর প্রাসাদের বাইরে থাকার কোন অপরাধের ভয় নেই বরং হঠাৎ সে তাদের ঐশ্বর্যের জাঁকজমকে পূর্ণ পিঞ্জরার বদ্ধজীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেয়েছে বলে আল্লাকে বহুৎ সেলাম জানাচ্ছে।

তার তখন মন ভাবাবেগে পূর্ণ। বাজারের বহু মানুষের, কলরব, হাসি, চীৎকারের সমন্বয়ে তার কাব্যমনের গভীর অন্তর্দেশে একটা সুখের অনুভূতি তাকে দুর্জয় সাহস দান করেছে। সমস্ত অপরাধের শেষ শাস্তি, মুক্তির জন্যে তার মনের আকাঙ্খা সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছে। আর মোগল বাদশাহের বিচারে যে শাস্তি তার অপরাধের পাওনা সে প্রাপ্যশাস্তি মৃত্যু ছাড়া ভয়ঙ্কর কিছু নয়, সুতরাং সেই ভয়ঙ্করকেই জেবুন্নিসা মনে মনে জয় করেছে, তাই তার মনে কোন আশঙ্কা নেই।

জিনৎকে তাই সঙ্গে করে পা চালিয়ে জ্যোতিষির সমীপে যাবার জন্যে বাজারের অন্য প্রান্তে চলল। যেখানে দেশবিদেশ থেকে জ্যোতিষিরা তাদের অব্যর্থ ভাগ্যগণনার সরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষমান। তখনকার দিনে মোগল

সাম্রাজ্যের চারদিকে এই জ্যোতিষিদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশীমাত্রায় হয়েছিল। তার কারণ মোগল রাজপুরুষেরা জ্যোতিষির গণনার ওপর ফলাফল নির্ভর করে রাজ্য জয় ও ভাগ্যপরিবর্তনের অভিযানে যাত্রা করত। সেইজন্যে এই ব্যবসায় তামাম ভারতের লোকেদের দৃষ্টি আরোপিত হয়েছিল।

জিনৎ ও জেবুন্নিসা যখন দ্রুত জ্যোতিষির কাছে যাবার জন্যে বাজারের অন্যপ্রান্তে চলেছে সেইসময় একটু আলো-অন্ধকার ছায়া জায়গাতে একজন যুবক তাদের পথরোধ করল। যুবকটি সুন্দর কিন্তু পোষাকটি মলিন। দীর্ঘায়ত দুটি চোখের মিনতি নিয়ে ফিস ফিস করে চাপাস্বরে যুবকটি জেবুন্নিসার দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করে বলল—সেলাম। আলেকম্ শাহজাদী জেবুন্নিসাবেগম। আমার গোস্তাফি মাপ করবেন।

জেবুন্নিসা পথিমধ্যে এরকম বাধাপ্রাপ্ত হতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে বলল—সেলাম আলেকম—কী আর্জি?

যুবকটি মাথা নত করে বলল—আপনি হয়ত আমাকে চেনেন না কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনার শিক্ষক মুল্লা আশ্রফ মাজন্দ্রানীর কাছ থেকে আপনার অপূর্ব কবিতা রচনার কথা শ্রুত হয়েছি, এ ছাড়া আপনার দয়ায় বহু সুকবি তাঁদের জীবনধারণের রসদ পেয়ে তাঁদের কাব্যশাস্ত্রালোচনা চালিয়ে চলেছেন এ কথাও শুনেছি। আপনার সম্মুখে আমি একবার দাক্ষিণাত্যে নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু আপনি হয়ত তা বিস্মৃত হয়েছেন।

জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে বলল—আমি বিস্মৃত হয়েছি। এখন কাব্যশাস্ত্রালোচনার সময় অল্প, মনও বিক্ষিপ্ত। আমার পিতা এখন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত। ভবিষ্যৎ এখন ধ্বংসের মধ্যে। তাই আপাতত সে চিন্তা পরিত্যাগ করে আমি এখন সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি কখনও সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে তাহলে কাব্যালোচনা আবার সুরু করব। তখন দেখা করবেন। আপনার যোগ্যতা পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করব।

যুবকটি ম্লান হাসল, হেসে বলল—সেদিন হয়ত এ বান্দা ইহজগতে থাকবে না। জীবনধারণের রসদ কাব্যালোচনা করলে যে মেটে না এ নিশ্চয় জানেন। তাই আপনার কাছে বহুদিন পূর্বে একটি 'কল্গী' (পাগড়ী বা টুপীর অলঙ্কার বিশেষ) প্রেরণ করেছিলাম। বিনিময়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। তার পরেও একটি কবিতা রচনা করে স্মরণের জন্য প্রেরণ করেছিলাম।

জেবুন্নিসার মনে পড়ল। হ্যাঁ, একজন উচ্চবংশীয় অভাবী কবি নিয়ামত

আলা খাঁ তার কাছে একটি কলগী প্রেরণ করেছিল এবং তার সঙ্গে একটি কবিতা। কবিতার পদগুলি বড় সুন্দর। কবিতা রচিত কাগজটি সে সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। একরকম তার মুখস্তই আছে ঃ—

'অয়্ বন্দগীয়ত্ সা'দত্ আখতর্—এ-মন্
দর খেদ্‌মত্—এ-তু অয়াঁ গুদা জৌহর—এ-মন্
গর জিকা খরিদনেস্ত পস্ গুজর-এ-মন্
ওর্ নেস্ত খরিদনী বজন্ বর্ সর্-এ-মন্।'

'হে আমার শুভগ্রহ তোমাকে প্রণাম করি,
আমার অলঙ্কার তোমার সেবায় নিয়োজিত আছে।
যদি ঐ শব অর্থাৎ সামান্য দ্রব্য ক্রয়ের অভিপ্রায়
হয়—তবে তাহাই আমার অমূল্য রত্ন বলিব।
যদি ক্রয় করিতে না চাও তবে আমার
শিরোপরি আঘাত কর।'

আশ্চর্য সে কবিতার অনুভূতি। রচয়িতাকে তখন জেবুন্নিসা দেখেনি কিন্তু তার কবিতার চয়নগুলি তাকে দেখবার জন্যে ভীষণ আকর্ষণ করেছিল। সেদিনের সেই কাব্য সৌন্দর্যের মধ্যে মন ছিল বলেই দুনিয়ার সবকিছু রঙের বাহারে রঙিন ছিল। তখন জীবন-সমস্যার ঘাত প্রতিঘাতে রাজৈশ্বর্যের অস্বচ্ছলতা থাকলেও খুব বেশী মনে পীড়া দিত না। তখন মনে হত এই নিয়ে সারাজীবন সে কাটিয়ে দেবে। এর মধ্যে যে রস আছে, তার রসাস্বাদন করে জীবনের মাধুর্যকে উপভোগ করবে। কিন্তু চিন্তাও যে ক্ষণস্থায়ী, কোন সিদ্ধান্তই যে অধিককাল মনের সঙ্কল্পে স্থায়ী হয় না তার প্রমাণ আজকের পরবর্তী ঘটনা। তাই জেবুন্নিসা কাচাবয়সের সবুজ তারুণ্যে ভরা দিনগুলি আস্তে আস্তে ভুলে যেতে সুরু করেছে। ভেবেছে এ দুনিয়ায় আকাশ, বাতাস, নদী, পর্বত, গান, কবিতা সমস্ত সৌন্দর্যের উপকরণই মিথ্যা। বরং মানুষের যে ইন্দ্রিয় সর্বদা তার জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ছটফট করে তার পূর্ণতার জন্যে মানুষের চেষ্টাই অসীম। সৌন্দর্যের যে উপকরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে যা শুধু দৃশ্যমান, দেখেই সুখ, ভোগে অসার তার কোন মূল্য নেই। সেইজন্য জেবুন্নিসার মন যত পরিণতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তত তার মন থেকে অলীক সৌন্দর্যের বস্তুর আস্বাদন লোপ পেতে থাকে।

সাম্রাজ্যের চারদিকে এই জ্যোতিষিদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশীমাত্রায় হয়েছিল। তার কারণ মোগল রাজপুরুষেরা জ্যোতিষির গণনার ওপর ফলাফল নির্ভর করে রাজ্য জয় ও ভাগ্যপরিবর্তনের অভিযানে যাত্রা করত। সেইজন্যে এই ব্যবসায় তামাম ভারতের লোকেদের দৃষ্টি আরোপিত হয়েছিল।

জিনৎ ও জেবুন্নিসা যখন দ্রুত জ্যোতিষির কাছে যাবার জন্যে বাজারের অন্যপ্রান্তে চলেছে সেইসময় একটু আলো-অন্ধকার ছায়া জায়গাতে একজন যুবক তাদের পথরোধ করল। যুবকটি সুন্দর কিন্তু পোষাকটি মলিন। দীর্ঘায়ত দুটি চোখের মিনতি নিয়ে ফিস ফিস করে চাপাস্বরে যুবকটি জেবুন্নিসার দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করে বলল—সেলাম আলেকম্ শাহজাদী জেবুন্নিসাবেগম। আমার গোস্তাফি মাপ করবেন।

জেবুন্নিসা পথিমধ্যে এরকম বাধাপ্রাপ্ত হতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে বলল—সেলাম আলেকম—কী আর্জি?

যুবকটি মাথা নত করে বলল—আপনি হয়ত আমাকে চেনেন না কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনার শিক্ষক মুল্লা আশ্রফ মাজন্দ্রানীর কাছ থেকে আপনার অপূর্ব কবিতা রচনার কথা শ্রুত হয়েছি, এ ছাড়া আপনার দয়ায় বহু সুকবি তাঁদের জীবনধারণের রসদ পেয়ে তাঁদের কাব্যশাস্ত্রালোচনা চালিয়ে চলেছেন এ কথাও শুনেছি। আপনার সম্মুখে আমি একবার দাক্ষিণাত্যে নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু আপনি হয়ত তা বিস্মৃত হয়েছেন।

জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে বলল—আমি বিস্মৃত হয়েছি। এখন কাব্যশাস্ত্রালোচনার সময় অল্প, মনও বিক্ষিপ্ত। আমার পিতা এখন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত। ভবিষ্যৎ এখন ধ্বংসের মধ্যে। তাই আপাতত সে চিন্তা পরিত্যাগ করে আমি এখন সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি কখনও সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে তাহলে কাব্যালোচনা আবার সুরু করব। তখন দেখা করবেন। আপনার যোগ্যতা পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করব।

যুবকটি ম্লান হাসল, হেসে বলল—সেদিন হয়ত এ বান্দা ইহজগতে থাকবে না। জীবনধারণের রসদ কাব্যালোচনা করলে যে মেটে না এ নিশ্চয় জানেন। তাই আপনার কাছে বহুদিন পূর্বে একটি 'কলৃগী' (পাগড়ী বা টুপীর অলঙ্কার বিশেষ) প্রেরণ করেছিলাম। বিনিময়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। তার পরেও একটি কবিতা রচনা করে স্মরণের জন্য প্রেরণ করেছিলাম।

জেবুন্নিসার মনে পড়ল। হ্যাঁ, একজন উচ্চবংশীয় অভাবী কবি নিয়ামত

আলা খাঁ তার কাছে একটি কলগী প্রেরণ করেছিল এবং তার সঙ্গে একটি কবিতা। কবিতার পদগুলি বড় সুন্দর। কবিতা রচিত কাগজটি সে সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। একরকম তার মুখস্তই আছে ঃ—

'অয়্ বন্দগীয়ত্ সা'দত্ আখতর্—এ-মন্
দর খেদ্‌মত্—এ-তু অয়াঁ শুদা জৌহর—এ-মন্
গর জিকা খরিদনেস্ত পস্ গুজর-এ-মন্
ওর্ নেস্ত খরিদনী বজন্ বর্ সর্-এ-মন্।'

'হে আমার শুভগ্রহ তোমাকে প্রণাম করি,
আমার অলঙ্কার তোমার সেবায় নিয়োজিত আছে।
যদি ঐ শব অর্থাৎ সামান্য দ্রব্য ক্রয়ের অভিপ্রায়
হয়—তবে তাহাই আমার অমূল্য রত্ন বলিব।
যদি ক্রয় করিতে না চাও তবে আমার
শিরোপরি আঘাত কর।'

আশ্চর্য সে কবিতার অনুভূতি। রচয়িতাকে তখন জেবুন্নিসা দেখেনি কিন্তু তার কবিতার চয়নগুলি তাকে দেখবার জন্যে ভীষণ আকর্ষণ করেছিল। সেদিনের সেই কাব্য সৌন্দর্যের মধ্যে মন ছিল বলেই দুনিয়ার সবকিছু রঙের বাহারে রঙিন ছিল। তখন জীবন-সমস্যার ঘাত প্রতিঘাতে রাজৈশ্বর্যের অস্বচ্ছলতা থাকলেও খুব বেশী মনে পীড়া দিত না। তখন মনে হত এই নিয়ে সারাজীবন সে কাটিয়ে দেবে। এর মধ্যে যে রস আছে, তার রসাস্বাদন করে জীবনের মাধুর্যকে উপভোগ করবে। কিন্তু চিন্তাও যে ক্ষণস্থায়ী, কোন সিদ্ধান্তই যে অধিককাল মনের সঙ্কল্পে স্থায়ী হয় না তার প্রমাণ আজকের পরবর্তী ঘটনা। তাই জেবুন্নিসা কাচাবয়সের সবুজ তারুণ্যে ভরা দিনগুলি আস্তে আস্তে ভুলে যেতে সুরু করেছে। ভেবেছে এ দুনিয়ায় আকাশ, বাতাস, নদী, পর্বত, গান, কবিতা সমস্ত সৌন্দর্যের উপকরণই মিথ্যা। বরং মানুষের যে ইন্দ্রিয় সর্বদা তার জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ছটফট করে তার পূর্ণতার জন্যে মানুষের চেষ্টাই অসীম। সৌন্দর্যের যে উপকরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে যা শুধু দৃশ্যমান, দেখেই সুখ, ভোগে অসার তার কোন মূল্য নেই। সেইজন্য জেবুন্নিসার মন যত পরিণতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তত তার মন থেকে অলীক সৌন্দর্যের বস্তুর আস্বাদন লোপ পেতে থাকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ামত আলী খাঁ যেন তার পথ আবার দেখিয়ে দিল। যেখানে সে বেঁচে থাকবে, যার মধ্যে তার জীবনের আয়ু তার দিকে ইঙ্গিত করে নিয়ামত তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অপূর্ব কারুশিল্পের সুখ্যাতি বাজারের এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিল। একটা মানুষকে বিচার করতে গেলে তার কীর্তিই তাকে দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং তাকে 'বেঁচে থাকতে হলে ঔরঙ্গজেবের কন্যা হয়ে বেঁচে থাকলে চলবে না। জেবুন্নিসা নামে বেঁচে থাকতে হবে। তাতে জগতের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে নাম। জেবুন্নিসা তার অতীত জীবনের বিস্মৃত প্রায় কর্মধারাকে আবার স্মরণে আনতে পেরে নিজেকে লাখো লাখো কুর্নিশ জানালো। আর নিয়ামতের ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠল।

যুবকটির দীর্ঘায়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে জেবুন্নিসা মাথার অবগুণ্ঠনটি অল্প তুলে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল—নিয়ামত খাঁ, তোমার কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কলগীর মূল্য আমি খুব শীঘ্র প্রেরণ করব। ভবিষ্যতে যখন সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হবে তখন আমার দর্শনাকাঙ্খী হয়ে এসো। তোমার যোগ্য সমাদর শাহজাদী দিতে কার্পণ্য করবে না।

জেবুন্নিসা আর অপেক্ষা না করে জিনতের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে বাজারের বাইরে এসে শিবিকার দিকে এগিয়ে চলল।

জিনৎ জেবুন্নিসার হঠাৎ মত ও পথ পরিবর্তনে শুধু বিস্মিত হল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে কিছু সাহস করল না। রক্ষী সিপাইরা এতক্ষণ তাদের আরোহিনীদের খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় শুষ্কমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ শাহজাদীদের দেখে, যেন তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল। জেবুন্নিসা ও জিনৎ শিবিকায় উঠতে শিবিকাবাহীরা আবার ঘাড়ে শিবিকা স্থাপন করে প্রাসাদের পথে ছুটল। আবার রক্ষী অশ্বারোহীরা চীৎকার করে বলল—হুঁসিয়ার, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসা ও জিনৎ—'তফাৎ যাও'। পথের লোকেরা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিয়ে এদের যাবার জায়গা করে দিল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল শিবিকা ও অশ্বারোহী দল। তাদের চলার শব্দে প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠল বাতাসের বুকে। পথের ধুলোয় জাগল আলোড়ন। আলো ও অন্ধকার ছায়া পথের ওপর মুহূর্তে একটা দারুণ কোলাহল জাগিয়ে শাহজাদীদের ভ্রমণ সমাপ্ত হল।

কিন্তু জেবুন্নিসার মধ্যে একটা অন্ত আলোড়নের জোয়ার যেন ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে তার কক্ষে আবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

তখন রাজঅন্তঃপুরের অভ্যন্তরে অন্য ঘটনা সুরু হয়েছে।

বাদশাহ নেই। হারেমের চিরস্থায়ী কর্ত্রী এখন আগ্রার মহলে বন্দিনী। তাঁর প্রিয়তম পিতা বাদশাহ শাহজাহানের পাশে বসে কন্যার কর্তব্য দান করছেন। জাহানারার সেই বুদ্ধিদীপ্তি ও গাম্ভীর্যময়ী মুখের ছায়া হারেমের কর্ত্রী পদে তাকে মহীয়ান করেছিল। সেইজন্যে সকলেই তাকে ভয় করত। হারেমের নিয়ম ও শৃঙ্খলা সেইজন্যে সর্বদা সমানগতিতে চলত। মাঝে মাঝে যা ব্যাহত হত, তা লঘু শাসনের চক্ষু দিয়ে বশীভূত করার ক্ষমতা জাহানারার ছিল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব রোশোনারাকে মোগল হারেমের কর্তৃত্ব দিয়ে হারেমের সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলা নষ্ট করতে সাহায্য করেছিলেন। রোশোনারা নিজে ছিলেন বিলাসিনী রমণী। তাঁর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া তখন ভ্রাতৃবিরোধের ষড়যন্ত্র মোগলহারেমের মধ্যেও দারুণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

সম্রাট শাহজাহান আগ্রায় তাঁর নিজের কক্ষে বন্দী। দিল্লী থেকে যখন আগ্রায় যাত্রা করেছিলেন তখন তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজন বাঁদী ও প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাকে। সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে আর যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যারা শাহজাহানের হৃদয়ের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত, বিশেষ করে যারা বাদশাহের শয্যার অংশভাগিনী হয়ে একদিন বা একাধিক রাত্রি বাদশাহকে পত্নীর শোকোচ্ছ্বাস থেকে অব্যাহতি দিয়েছে তারা ঐ দিল্লীর হারামেই পড়েছিল। যদি তারা জানত, বাদশাহ আর কখনও আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন না তাহলে কখনই তারা এমনি করে বাদশাহের সঙ্গ ছেড়ে তাঁকে একা আগ্রায় ছেড়ে দিত না। আজ বাদশাহ শাহজাহান নসীবের দুর্ভাগ্যে সিংহাসন হারিয়ে আগ্রার মহলে বন্দী। বেগম সাহিবাও পিতার সঙ্গে একরকম বন্দী হয়ে আগ্রার দুর্গেই বসবাস করছেন। সুতরাং শাহ-জাহানের নিজস্ব যারা এই হারেমে বেগমমহলে বেগমের পদমর্যাদায় বসবাস করছে তাদের আজ কান্না ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এরপর নবতম বাদশাহ কিরকম ব্যবহার করবেন সেই চিন্তায় বেগম মহলের এক তৃতীয়াংশ আওরৎ দারুণ আশঙ্কায় কণ্টকিতা। সর্বদাই তারা ভয়ে ও ভাবনায় অপেক্ষমানা। বাদশাহের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব একসময় দিল্লী প্রাসাদ অবরোধ করে

সিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসে এই রকম কতকগুলি আওরতের ওপর তাঁর রুদ্ধ-রোষ আরোপিত করে গেছেন। তাদের শাস্তি দিয়ে গেছেন মৃত্যুদণ্ড। এরপর যখন কায়েমী করে সিংহাসনে বাদশাহ হয়ে বসবেন তখন হয়ত মোগল হারেম নিঃশেষ করে সমস্ত আওরতের প্রাণহানির বিচার সমাপ্ত করবেন। সেইজন্যে সমস্ত বেগম ও বাঁদীমহলের রমণীরা আনন্দ হারিয়ে, বিলাসের স্বপ্নে আর মন রঙীন না করে মৃত্যুর জন্য ভীতা হযে অপেক্ষা করছে বিজয়ী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফেরার জন্যে।

সম্রাট শাহজাহানের অন্য সন্তান যদি সিংহাসনে বসতেন তাহলে অন্তত তাঁর কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করা যেত। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ সন্তান দারা শিকোর প্রাণে আর যা কিছুই থাক্ অন্তত দয়া ভিক্ষা করলে তিনি সুবিচার করতেন। শাহজাদা সুজা নারী আসক্ত ও সুরার রাজ্যে সর্বদা বিচরণ করলেও নারীর কোমল প্রাণে আঘাত লাগতে পারে এমন কিছু চরম তিনি নির্দেশ প্রদান করবেন না। তিনি হয়ত তাঁর হৃদয়ে স্থান দিয়ে এদের প্রতি ভিন্ন শাস্তির আয়োজন সমাপ্ত করবেন। কনিষ্ঠ মুরাদও সুজার মতই রমণীদের সম্মান প্রদান করবেন। এরা কেউই শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের মত রমণীর প্রতি চরম শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর, কৌশলী, ঔরঙ্গজেবই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে জয়ী হবেন, সে বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং বেগম মহলের দারার অবশিষ্ট বেগমরা, সুজা ও মুরাদের হৃদয় যারা একদিনের জন্যও অধিকার করেছিল, যারা দয়াবান শাহজাহানের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে, বাঁদী থেকে যারা দেহ উপচার উৎসর্গ করে,বেগম মহলে উন্নীতা হয়ে বেগমের মত সবকিছু সুখ ভোগ করেছিল তারা আজ নিজেদের কক্ষের অন্তরালে বসে রাজসিক পোষাক দেহ থেকে বিচ্যুত করে মৃত্যু ভয়ে সর্বদা কাঁপছে।

তাছাড়া দিল্লীর হারেমের কর্ত্রী হয়ে শাহজাদী রোশোনারা আগামী দিনের শাসনের যে নমুনা প্রদর্শন করতে সুরু করেছেন তাতেও সকলে ভীতা হয়ে একেবারে মর্মাহতা হয়ে দুর্ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করছে।

প্রশ্নটা উপস্থিত হয়েছে এই বেগম মহলের খাব্সুরত মিঠিবেগম গোলাপ-উন্নিসা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে।

সেদিনের সায়াহ্নের ধূসর ছায়া যখন স্বচ্ছ আকাশের বুকের ওপর তার উপস্থিতি ঘোষণা করছিল। দিল্লার প্রাসাদের মহলে মহলে স্বর্ণ ও রজত

স্ফটিকাধারে আলোর রোশনাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রাসাদের বার মহলের নানাবিধ কার্য স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাইরে থেকে আসা লোক-জনেরা কাজ সমাপ্ত করে পাল্কী বেয়ারার কাঁধে চড়ে সিংহদরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেইসময় রাজঅন্তঃপুরের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন রমণীকণ্ঠের দারুণ আর্তনাদ। খোজাপ্রহরীরা কাঁধে কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে চারদিকে ছুটতে লাগল। অন্তঃপুরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে দরজা সর্বদা খোলা থাকে তা বন্ধ হয়ে গেল। বাঁদীরা চীৎকার করে যে যার মহলের কক্ষে ঢুকে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। একটা কেমন যেন বিশৃঙ্খল অবস্থা।

বেগমরা তাদের কক্ষের মখমল শোভিত পালঙ্কে শুয়ে তাদের খাসবাঁদীকে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে রে?

খাসবাঁদী তখন বাইরে থেকে ফিরে এসে কক্ষের একান্তে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করল—মিঠিবেগম! মালেকা মিঠিবেগম বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেছে। প্রচুর খুন বেরিয়ে তার দেহের কামিজ লাল করে দিয়েছে।

বেগমরা ভ্রূকুঞ্চিত করে আবার প্রশ্ন করল—মর গিয়া!

জী হাঁ।

খুব একটা সাংঘাতিক ঘটনা কিছু নয়। মৃত্যুর সঙ্গে যোগাযোগ মোগল হারেমের সবারই আছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মরে যাচ্ছে। কত আওরৎ তার দূষিত চরিত্রের জন্য বাদশাহের বিচারে মৃত্যুদণ্ড পাচ্ছে। বিশ্বাস-ঘাতককে কেউ খুন করলে তার শাস্তি বাদশাহের পুরস্কার। বাঁদীদের এক-রাতের কোন এক মুহূর্তে পদস্খলন হলে হারেমের কর্ত্রীর দ্বারা শাস্তি ভোগ করে। কেউ কেউ মোগল হারেমের অবরোধ ভেঙে পুরুষের সঙ্গে মিলছে। বাদশাহের চরম বিচার তার ওপর নেমে আসছে, কারাকক্ষের অন্ধকার প্রকোষ্ঠই তার চলার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। সুতরাং মৃত্যুর জন্য কেউই ভীত নয়।

তবু আজ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে মোগল হারেমে একটা সংশয় উপস্থিত হল।

রোশেনারা তখন ছিলেন শীশমহলের অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত জগতের সেরা ঐশ্বর্য দিয়ে নির্মিত বাদশাহী স্নানাগারে। এমন একটি স্নানাগার পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাদশাহ ও বেগমদের স্নানের জন্য এই মহল নির্মিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাদশাহের বিকৃত রুচি ও শালীনতাবর্জিত

চোখের নগ্নসৌন্দর্যেরই নিদর্শন ফুটে ওঠে। একদিক দিয়ে তখনকার দিনের মোগলবাদশাহরা রমণী নগ্নদেহের সৌন্দর্য কতরকম ভঙ্গিতে দর্শন করলে তাঁদের ইন্দ্রিয়ের সুখ চরিতার্থ হয়—তারই চেষ্টা করতেন এবং সেই জন্যে এই অপূর্ব স্নানাগার। বাদশাহ তাঁর খাব্‌সুরত কতকগুলি বেগমকে নিয়ে এই স্নানাগারে প্রবেশ করতেন।

এই স্নানাগারের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হয়েছিল। শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত সানের ওপর দিয়ে নির্মল জল প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখে মনে হয় যেন জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করছে। চারদিক থেকে ফোয়ারার নির্মল জল বেগে উঠছে, আবার মুক্তারাশির মত প্রান্তরের ওপর পতিত হচ্ছে। অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত ছাত থেকে অসংখ্য দীপাবলী লম্বিত রয়েছে ও সেই সমস্ত দীপেরবিবিধ বর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের ওপর বড সুন্দরভাবে প্রতিহত হচ্ছে। চারদিক থেকে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজি খচিত হয়ে দেয়ালে সন্নিবেশিত হয়েছে। কেননা স্নানকারিণী চার-দিকে আপনার সুন্দর অনাবৃত অবয়ব দেখতে পাবে। বিলাসপটু বাদশাহরা বেগমদের নিয়ে স্নান ও জলকেলি করবেন বলে কত দেশ, বিদেশ থেকে অর্থ দিয়ে হীরা, চুনি, পান্না, মকরত এনে এই অপূর্ব বিলাস কক্ষ নির্মিত ও সুশোভিত হয়েছে।

রোশোনারা সেই কক্ষে আপন দেহ অনাবৃত করে দর্পণে সেই অস্তমিত সৌন্দর্যের রূপ দেখতে দেখতে সানের নির্মল গোলাপ জলে অবগাহন করে গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছিলেন।

স্নানাগারের কারুকার্যমণ্ডিত স্বর্ণময় দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল! হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত পড়ল। রোশোনারা বিরক্ত হযে দরজার দিকে তাকালেন। তারপর নিজের অনাবৃত দেহের দিকে দর্পণের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে সানের জল থেকে উঠে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি বাঁদী অপেক্ষা করছিল। সে রোশোনারার দেহের জল মুছিয়ে দিয়ে সারা শরীরের ওপর একটি মসলিনের গাত্রাবরণ জড়িয়ে দিল।

বাঁদী দরজা উন্মুক্ত করতে বাইরের সংবাদদাত্রী বাঁদী দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করল এবং রোশোনারাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলল—মালেকা, মিঠিবেগম বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেছে!

রোশোনারা কিন্তু চমকালেন না। সবার অগোচরে তাঁর ঠোঁটের কোণে

একটুকরো হাসি এসে মিলিয়ে গেল। শুধু বিস্মিত ও গম্ভীর হয়ে বললেন—তুই যা, আমি যাচ্ছি।

বাঁদী চলে গেলে রোশোনারা দাঁতে দাঁত চেপে শুধু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে স্মরণ করলেন। আর মনে মনে বললেন—দারার আর একজন পেয়ারী আওরৎ মিঠিবেগম ওরফে গোলাপউন্নিসা। হঠাৎ স্নানাগার প্রকম্পিত করে হাঃ হাঃ করে পাগলের মত শাহজাদী রোশোনারা হেসে উঠলেন। কক্ষে যে বাঁদী রোশোনারার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল।

দারার বেগম নয় এই মিঠিবেগম গোলাপউন্নিসা। সম্রাট শাহজাহানই একদিন এই বাঁদীকে মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষায় গ্রহণ করে বেগমের সম্মানে উন্নীতা করেছিলেন। বাঁদীগোলাপ হয়েছিল গোলাপউন্নিসা বেগম। তবে মিঠিবেগম হয় নি। মিঠিবেগম করেছিলেন, শাহজাহানের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো। সে ইতিহাস বর্ণনা করার পূর্বে বাঁদীগোলাপের সাথে সম্রাট শাহজাহানের আকস্মিক মিলনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

বাঁদীর রূপ থাকে, যৌবন থাকে। রূপের রোশনাইও ছড়ায়। কিন্তু রূপ গুণের জন্য বাঁদীর মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ভিন্ন ভিন্ন দরের বেগমের প্রিয়পাত্রী হিসাবে উন্নীতা হয়। বেছে বেছে বাঁদী রাখা হয় বাদশাহের ইন্তেজারের জন্য। সে বাঁদী হবে সবচেয়ে খাব্সুরত। তার পরেরগুলি বিভিন্ন বেগমের জন্য। তাছাড়া যারা খাস বাঁদী তাদের বিশেষত্ব একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তারা বেগমদের দ্বারা নির্বাচিতা হয়ে নিযুক্ত হয়।

কিন্তু গোলাপউন্নিসা খাসবাঁদী ছিল না। খুব অল্পবয়সেই তার পিতা মোগলহারেমে তাকে বাঁদী করবার জন্যে একরকম বাদশাহকে বিক্রী করে গিয়েছিল। গোলাপউন্নিসা বাঁদী মহলে থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। দিনের পর দিন তার দেহের পরিবর্তন হারেমের কক্ষের দর্পণে দেখে সে মনে মনে অনেক স্বপ্ন রচনা করেছে। বাঁদীর পোষাকের মধ্যে একটু হেরফের করে তার আগত যৌবনকে সম্ভাষণ জানিয়েছে। চোখে সুরমার কাজল এঁকে চোখের চটুলভঙ্গি দর্পণে ফেলেছে। তাম্বুলরাঙা রক্তিম অধরের মাঝে হাসির রেখা টেনে কোন মরদকে এই হাসি দিয়ে জালে ফেলা যায় কিনা তার মহড়া দিয়েছে। মসলিনের কাঁচুলির বন্ধনে সদ্য পাওয়া প্রস্ফুটিত

সৌন্দর্য-স্তম্ভের দৃশ্য অপরের চোখে লোভাতুর করে দেখিয়ে নিজে সুখ অনুভব করেছে। কিন্তু তারপর গোলাপউন্নিসা বুঝেছে তার এই যৌবনই বৃথা। এর কোন মূল্য নেই। মোগলহারেমের কঠিন অবরোধ ভেদ করে খোজা প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে সে কখনই বাইরে যেতে পারবে না। সুতরাং কোন মরদই তার এই যৌবন উপাচার আপন হৃদয়ে স্থান দেবে না। শুধু বাদশাহ আছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে স্থান পাবার যোগ্যতা তার নেই। বাদশাহকে দেখলেই তার বুক কাঁপে। অবশ্য তার কাজই বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ পাত্র থেকে সরাব অন্যপাত্রে ঢেলে বাদশাহকে পরিবেশন করা। কিন্তু সে তার ছোট্ট বুকের স্তিমিত ধুকধুকুনিতে অনুভব করে দারুণ কলরব। তাই মাথা হেঁট করে হাজারো সেলাম জানাতে জানাতে সে তটস্থ হয়ে ওঠে।

বাদশাহ হয়ত তখন তাঁর নির্বাচিতা প্রেয়সীর সঙ্গে প্রেমালাপে ব্যস্ত, তিনি বাঁদীর দিকে কখনও তাকিয়েও দেখেন না! শুধু হাত বাড়িয়ে সরাব পাত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু যার দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেন না, একদিন তার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

সেদিনও বাদশাহ তাঁর আরামকক্ষে বসে তামাকু সেবন করছিলেন। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারদিক ভরে গেছে। গোলাপউন্নিসা ত্রস্তপদে এসে বাদশাহ শাহজাহানের সামনে সরাবের পেয়ালা ধরল। শাহজাহান বাদশাহ তাকালেন সেই সুন্দর হাতে ধরা স্বর্ণ পেয়ালার দিকে। স্বর্ণের পেয়ালার মধ্যে রক্তের মত লাল সরাবের খুসবাই তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তিনি যেন মুহূর্তে পিপাসার্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু সেই সরাবের পিপাসার চেয়ে তার চোখ আরো এগিয়ে গিয়ে ক্রুটি চম্পাফুলের মত অঙ্গুলির বন্ধনে ধরা পেয়ালার ওপর ন্যস্ত হল। গোলাপউন্নিসার সুগঠিত সুডৌল মৃণাল বাহুটির ওপর আটকে গেল। এবার তিনি তাঁর আয়ত চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে গোলাপউন্নিসার যৌবন প্রস্ফুটিত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসুচোখের দৃষ্টি স্থাপন করলেন।

গোলাপউন্নিসার সুন্দর সরল মুখটি, সুরমা-আঁকা দুটি চোখের দৃষ্টিতে ভীরুতার ছোঁয়াচ। দুবার অল্প চোরা চাউনি দিয়ে বাদশাহকে অবলোকন করে ঠোঁটে মৃদুহাসির রেখা টেনে মাথাটা নীচু করল গোলাপউন্নিসা। বাদশাহ শাহনসা শাহজাহান গোলাপউন্নিসার সেই সুন্দর দৃষ্টির অদ্ভুত মাদকতা মনে গ্রহণ করে অভিভূত হয়ে গেলেন।

এবার স্পষ্ট ও সোজাসুজি গোলাপের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ফুলের মত সতেজ তনুদেহটি অল্প নুয়ে একটি ভঙ্গিমায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সুদৃশ্য ভেলভেটে মোড়া কার্পেটের মেজের ওপর যে সুন্দর পা দুটি রাখা ছিল বাদশাহ শাহজাহান সেইদিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। এত খুসী হয়ে উঠতে লাগলেন যে, মনে মনে তাঁর ইচ্ছা—এই মুহূর্তে ঐ নরম সুন্দর মেয়েটিকে দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে কোলে তুলে নেন! কিন্তু ভুললে কি করে চলবে—তিনি বাদশাহ! তাঁর কোন কিছুতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ অশোভনীয়। কেউ দেখলে বাদশাহের দুর্বল মনের পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আবার তাকালেন সম্রাট শাহজাহান গোলাপউন্নিসার পায়ের দিকে। দুধে আলতা রঙের সুকোমল পা দুটি চাঁপা ফুলের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভেলভেটে মোড়া ফরাসের ওপর রাখা। শাহজাহান এবার তাঁর অভিজ্ঞ প্রৌঢ় চোখ দুটি আস্তে আস্তে তুলে নিলেন পায়ের পাতা থেকে উর্ধ্বাঙ্গে। একটি পাতলা মসলিনের বহুমূল্য ঘাঘরা মেয়েটির নিম্নাঙ্গকে জড়িয়ে আছে। শাহজাহান নির্লজ্জের মত হাঁটু থেকে চোখ দুটি আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের দিকে আবার দৃষ্টি ঝুলিয়ে দিলেন। বহুদর্শী জহুরীর মত আবার কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গে চলে গেলেন। বার কয়েক নিম্নাঙ্গের ওপর নীচে চোখ দুটো দিয়ে লেহন করে আবারও উর্ধ্বাঙ্গে উঠলেন। বক্ষের রূপসুধাকে সামান্য কাচুলির বন্ধনে ঢাকা দিয়ে একটি ছোট্ট বহুমূল্য গাঢ় বেগুনী রঙের জামা গায়ে। তবে তাতে বক্ষের শোভা ঢাকা পড়েনি, বরং চোখের ওপর আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বুকের ওপর জাফরাণীরঙের একটি রেশমী কাজকরা পাতলা ওড়না। অবহেলা ভরে বক্ষ থেকে খসে পড়ে মাটিতে লুটচ্ছে। কিন্তু তাই দিয়ে মাথায় অবগুণ্ঠন টানা। রেশমের মত কটা রঙের নরম চুলের ওপর অবগুণ্ঠনের মহিমা অপরূপ দৃশ্য সঞ্চার করেছে। শাহজাহান বার কয়েক মেয়েটির যৌবন প্রস্ফুটিত বক্ষসুধার দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। মেয়েটির দৃষ্টি অবনত। কপাল, চিবুক, অধর, ভুরু, সুরমাআঁকা চোখ তারপর মৃণালবাহু, সমুদ্রউত্তাল বক্ষ, কটি, বাঁক, জঙ্ঘা, হাঁটু নিতম্ব—সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

শাহজাহান অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগলেন—এতদিন এই কিশোরীটি তাঁর সামনে তাঁকে সরাব পান করিয়ে চলেছে, তিনি এতদিন এর দিকে

তাকান নি? এর এই প্রস্ফুটিত যৌবন সম্পদ সামান্য এক তুচ্ছ কাজে ব্যয় করে এর যৌবনকে অসম্মানই করেছেন! সম্রাট শাহজাহান মনে মনে দারুণ ভাবে আফশোষ করতে লাগলেন। তারপর এও ভাবলেন, তাঁর এই প্রৌঢ়বয়সে এইরকম জোয়ানী খাবসুরত সুন্দরী আওরতের আগুনের মত যৌবনের সাথে তিনি কী নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন? এর বুকে যে আগুন আছে, এর শোণিতে যে সমুদ্রের মাতন আছে তিনি তাঁর এই প্রৌঢ় জীবনে কেমন করে উপভোগ করবেন?

জীবনে অনেক রমণী তিনি পেয়েছেন। যাদের ভাল লেগেছে যৌবনের পৌরুষ দিয়ে তাদের আওরৎ জীবনের ভাললাগাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। বেগম কেউ কেউ হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দুচারবার ছাড়া খুব বেশী কেউ শাহজাহানের নিবিড়সঙ্গ পায় নি। কারণ মমতাজবিবি তাঁর হৃদয় জুড়ে তাঁর স্বামীকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস শাহজাহান নষ্ট করতে চাননি বলেই এই লুকোচুরি। না হলে মোগল বাদশাহ হয়ে এক নারীর যৌবনসুধা ভোগ করে শান্ত থাকা অন্তত কাপুরুষতার পরিচয়কে তুলে ধরতে শাহজাহান কোনদিন চাননি। তবু মমতাজের মনে আঘাত সৃষ্টি হয়, এমন কাজ করতেও তিনি চাননি। তবে মমতাজের নির্দেশ ছিল, বাঁদী ও নর্তকীদের যৌবনসুধা সাময়িক কামনা করে বাদশাহের বাদশাহী নিয়মকে সেলাম জানালে তার কোন দোষ নেই। শুধু যেন কোন রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মমতাজবিবিকে বিস্মৃত না হন।

সম্রাট শাহজাহান তবু ভয় করতেন। যদি কোন দিন কোন সময় কোন আওরৎকে মমতাজের চেয়েও ভাল লেগে যায়? সেইজন্যে তিনি অন্ধ হয়ে অন্ধকারে নেমে পড়তেন রমণীর যৌবনসুধা উপভোগ করতে। আলোর মধ্যে সে রমণীকে ভাল করে দেখতেন না, পাছে সে রমণীর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

এখন অবশ্য মমতাজবিবি নেই। এখন ভয়েরও কোন হেতু নেই। তবে ভাল কাউকে আর লাগে না। আগের ভাল লাগার সাথে আজকের কোন মূল্য নেই। আজ মনে হয় তিনি বাদশাহ। তামাম এই দুনিয়ায় যত খাব্-সুরত জোয়ানী আওরৎ আছে তিনি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে বক্ষে ধারণ করতে পারেন—কিন্তু বক্ষে ধারণ করে তিনি কি পাবেন? বাদশাহের বক্ষে স্থান পেয়ে কেউ হয়ত পুলকিত হবে, কেউ হয়ত বৃদ্ধের স্তিমিত যৌবনের

শীতসম্পর্শে কান্নাকে গোপন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে আর তিনি তাই শুনেও কান না দিয়ে তাঁর বাদশাহী মেজাজের ভূমিকা করে আওরতের ঐশ্বর্যকে লুণ্ঠন করবেন। তাই মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে এইসব হট্টগোল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিজের কক্ষের মধ্যে ঢুকে যেতেন।

চিন্তা থেকে সরে এসে আবার তিনি তাকালেন গোলাপউন্নিসার দিকে। মেয়েটি মাথা হেঁট করে তখন সরাবের স্বর্ণপাত্র ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট শাহজাহানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ঝলক আগুন। দারুণ এক প্রদাহশক্তি নিয়ে অপেক্ষামানা। একবার অলক্ষ্যে চিন্তা করে নিলেন সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বেগমসাহিব জাহানারাকে। জাহানারার নিষেধ কিছুতেই নেই। পিতা হারেমের যে আওরৎকে হঠাৎ মর্যাদা দেন, তাকে শুধু জাহানারা বাদশাহের বেগম মহলে স্থানান্তরিত করে নতুন সাজে সাজিয়ে দেন। নতুন ঐশ্বর্যের রোশনাইতে রাঙিয়ে দেন বর্তমানের বাদশাহের প্রণয়িণীর গাত্রবর্ণ। উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তিনি পিতাকেই শ্রদ্ধা জানান বার বার। শাহজাহান মাঝে মাঝে অবশ্য লজ্জিত হন। জ্যেষ্ঠাকন্যার নীরব সম্মতি যে সমর্থনযোগ্য নয়, বুঝে তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে বশে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সংযম বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

প্রিয়তমা মহিষী মমতাজকে হারানোর বেদনা এমন করে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে শোকের মধ্যে নিমজ্জিত করে যে, তিনি তখন অবলম্বন না গ্রহণ করলে নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না! চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে দিনের হট্টগোলের পর রাত্রের নিস্তব্ধতা ফিরে এলে নিজের কক্ষে বিশ্রামের জন্যে স্বর্ণপালঙ্কে আড়ভাবে শুয়ে সরাবের পেয়ালা মুখে তুললে—মমতাজের সেই কোমল বাহুর আলিঙ্গন দেহে স্পর্শ সুখ আনে। তখন সম্রাট শাহজাহান দারুণভাবে চঞ্চল হয়ে কক্ষের ভেলভেটের ফরাসের ওপর পায়চারী করেন। চোখে তার জল এসে পড়ে। মনে মনে আফশোষ করে বিতৃষ্ণায় নিজেকে প্রশ্ন করেন—'আমার অপরাধটাই লোকে দেখল, মানসিক অবস্থাটা কেউ পর্যালোচনা করল না। আমার এই যন্ত্রণা, এ যে ঘাতকের খড়্গের আঘাতের পূর্বে যেরকমভাবে অপরাধীকে অস্থির করে তোলে, তেমনি—একথা কে বিশ্বাস করবে? মোগল বাদশাহের কোন দুঃখ নেই। এই কথাই সবাই বলে। কিন্তু সম্রাট শাহজাহান যে দুঃখের তিমিরে সর্বদা নিমজ্জিত থাকেন, তাঁর মত তামাম মোগল সাম্রাজ্যের কোন দীনদুঃখী দেওয়ানা ফকীর

মুসাফেরও বুঝি নেই।' সম্রাট শাহজাহান চোখের দুই কোণে হাত দিয়ে চোখের জল মোছেন। জাহানারা বোধ হয় পিতার এই শোকের বেদনা নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তাই হয়ত পিতার ভুলে থাকা কিছু আনন্দকে নিজের নিষেধ দিয়ে কণ্টকিত করেন না। কে জানে কোনটা ঠিক?

সম্রাট শাহজাহান নিজেও বুঝতে পারেন না কন্যার মনের আসল অভিসন্ধি কি। তাই এদিকের সংযম ও সাবধানতা মানুষের মত রুদ্ধ থাকে না। বাদশাহের মত বাদশাহী চালে আরো দ্রুত এগিয়ে চলে। সম্রাট শাহজাহান সম্ভোগের নেশায় নিজের অতীতকে ঠেলে সরিয়ে দেন। সেই সময় হঠাৎ নিজের কক্ষেই দেখতে পান গোলাপউন্নিসাকে। কিন্তু গোলাপকে দেখে শাহজাহানের মনে তাঁর নিজের অক্ষমতার প্রশ্ন আসে। নৃপতি সন্দেহ করেন, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তৈমুর লংয়ের ও চেঙ্গিস খাঁর রক্তের মিশ্রণের উগ্রতাপ যেন দেহের শোণিতে আর আলোড়ন জাগায় না।

সম্রাট শাহজাহান মুখে একটা হুম্ শব্দ করে বাঁদীর হাত থেকে পেয়ালা গ্রহণ করলেন। তারপর গোলাপের নতমুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি?

গোলাপউন্নিসা, জনাব। গোলাপ সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে কম্পিতস্বরে তার উত্তর পেশ করল।

কতদিন হারেমে এসেছ?

তিন বছর হুজুর।

এতদিন দর্শন দাও নি কেন?

হুজুর, একবছর আপনাকে সরাব পান করাচ্ছি।

সম্রাট শাহজাহান বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—এই একটি বছর ধরে একটি আগুনের পিণ্ড উগ্র যৌবনের প্রদাহ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, তিনি হীরাকে তুচ্ছ করে কাচ নিয়ে খেলা করেছেন! শুষ্ক ফুলের বক্ষ থেকে সৌরভ গ্রহণের জন্য আকুল হয়েছেন, অথচ সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পকোরকে বেহেস্তের মন মাতানো সৌরভ থেকেও মনের অন্য চেতনায় তিনি বিস্মৃত হয়েছেন! আশ্চর্য এই অনুভূতি, আশ্চর্য সেই অভিজ্ঞতা। সম্রাট শাহজাহান হাতে ধরা সরাবের পেয়ালার জলীয় পদার্থ গলায় ঢেলে দিয়ে গোলাপউন্নিসাকে বললেন—তোমাকে আর সরাব বিতরণ করতে হবে না, তার জন্যে অন্য বাঁদী

নিযুক্ত হবে। তুমি আজ রাত্রে আমার বিশ্রাম কক্ষে উপযুক্ত পোষাকে উপযুক্ত কায়দায় রাত্রি অতিবাহিত করবার জন্যে আসবে। যাও, আমার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়ে তোমার উপযুক্ত সাজের ব্যবস্থা শীঘ্র সমাপ্ত করছি।

গোলাপউন্নিসা আকস্মিকভাবে সৌভাগ্য পেয়ে দারুণ যেন খুসী হয়ে উঠল। মনের চঞ্চল স্পন্দন দ্রুত হয়ে তার কানায় কানায় আবেগে ভরে উঠল। হঠাৎ গোলাপউন্নিসা নিজের খুসীটা মহলে মহলে ছড়িয়ে দেবার জন্যে বাদশাহের কাছে থেকে চলে যাবার জন্যে বাদশাহের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাজারো কুর্নিশ পেশ করে তড়িৎপদে উঠে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

গোলাপউন্নিসার চলে যাবার ভঙ্গি দেখে বাদশাহ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর নিজেই স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সরাব পেয়ালায় ঢেলে মুখে তুললেন।

মোগল বাদশাহের আরাম কক্ষে ঐশ্বর্যের রোশনাইয়ের মাঝে সেদিন রাত্রে হিন্দুস্তানের সেরা পুরুষের বাহু বন্ধনে গোলাপউন্নিসার সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত পবিত্র যৌবনোচার নিবেদিত হল। একটি মাসুম জোয়ানী আওরৎ এক বহু রমণী ভোগ্য পুরুষের বাহু বন্ধনে তার রমণী কৌস্তুভ রত্নটি দান করে সে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করল। সে খুসী এইজন্যে যে, তার ঐশ্বর্য হিন্দুস্তানের বাদশাহ গ্রহণ করেছেন। তার রমণী জীবন সার্থক। যদি সে রমণী এর পরে তার যোগ্য সমাদর পায়।

তবে গোলাপ পেল। বাদশাহ শাহজাহান তাকে একদিন উপভোগ করে পরিত্যাগ করলেন না। তিনি গোলাপের মধ্যে পেলেন যৌবনের গভীর প্রবহমান স্রোত। রক্তের মধ্যে পেলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রমণীর মাতন। গোলাপ ঠিক শালিমার বাগের পুষ্পোদ্যানের প্রস্ফুটিত রক্তাক্ত গোলাপ। তার দেহে যেমন সৌরভ তেমনি জৌলুষ, তেমনি আনন্দের বিভিন্ন উপাদানে সমস্ত দেহ পূর্ণ। বক্ষের উত্তালতায় আশ্চর্য এক কোমল সুখানুভবের ঐশ্বর্য।

মোগল হারেমের সবাই জানল। ঈর্ষান্বিতা হল গোলাপের সৌভাগ্যে অনেকেই। হারেমের কর্ত্রী পাদিশাহ বেগম জাহানারাও শুনলেন। পিতার নতুন বাদশাহী আওরৎকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে নিজের কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নোপহার পরিয়ে দিলেন। এ রত্নোপহার সম্রাট শাহজাহানেরই প্রদত্ত উপহার। এমনি করে জাহানারা তার রত্নোপহার পর পর পিতার নতুন নতুন

আওরংযেব পরিয়ে দেন, আর শাহজাহান পরদিনই আবার একটি কন্ঠার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করেন।

জাহানারা গোলাপউন্নিসার জন্যে সমস্ত মর্যাদার ব্যবস্থা করে দিয়ে সম্রাটের স্নেহভাজন হলেন।

গোলাপউন্নিসা বাঁদী মহলের নিম্ন জীবন থেকে উঠে এসে বেগমমহলের ঐশ্বর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে স্বর্ণ পালঙ্কের আয়াসের মধ্যে নিমজ্জিত হল। গোলাপউন্নিসার জীবনের আকস্মিক এই সৌভাগ্যে সে নিজেই কম বিস্মিত হল না। ছিল সে বাঁদী। তার কাজ ছিল বাদশাহকে সরাব পরিবেশন করা। যৌবন তার দিন দিন রোশনাই জেলে বাইরে তার জৌলুস ছড়াচ্ছিল বটে, মনে মাঝে মাঝে অবশ্য কঠিন বাহুর নিষ্পেষণের ইচ্ছা জেগে উঠত, জেগে উঠত দিলের মধ্যে মহব্বতের রঙীন বসোরাই গোলাপের সৌন্দর্য। কিন্তু সে জানত, তার জীবন এই মোগল হারেমের অবরোধের বাইরে কখনও যাবে না, সুতরাং তার কোন আশাই মিটবে না, বাঁদী জীবনের এই নির্মম কর্তব্য নিয়েই তাকে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ বাদশাহ তাকে সব দিলেন। আশ্চর্য এক অনুভূতির মধ্যে দিয়ে বাঁদীর জীবন থেকে পিছলে এসে তারপর নতুন নতুন ভূমিকা প্রবর্তনে ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে ফুটে উঠল নতুন নতুন সজীব সুন্দর রঙবেরঙের পুষ্পকোরক। তা ছাড়া গোলাপউন্নিসা বেগম সাহিব জাহানারার কাছ থেকেও যথেষ্ট ভোগ বিলাসের সুযোগ পেল। বোধ হয় জাহানারা নিজেই আন্তরিকভাবে গোলাপউন্নিসাকে ভাল বাসল।

তারও যথার্থ প্রমাণ পাওয়া গেল, এক উৎসবে। 'জশন্-ই-নৌরোজ' উৎসব উপলক্ষে জাহানারা সম্রাট পিতাকে উপঢৌকন প্রদান করলেন। এ রীতি জাহানারা হারেমের সর্বময় কর্ত্রীপদ পাওয়ার পর থেকেই চালু হয়েছিল। প্রতিটি উৎসবে জাহানারা পিতাকে উপহার দিতেন। এবং বেগম সাহিবের দেখাদেখি আত্মসম্মানরক্ষার্থে রাজ সভাসদ্‌গণও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে থাকতে পারতেন না। সেই উৎসবে এবারে জাহানারা একটি আশ্চর্য আচরণ প্রকাশ করলেন, গোলাপউন্নিসাকে পুরস্কৃত করে। এক সেট বহু মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার তার দেহের শোভার জন্যে প্রদান করে জাহানারা পিতার যথেষ্ট প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ যাচ্ঞা করলেন। কিন্তু জাহানারার হঠাৎ এই উপহার প্রদানে বেগমমহলের অন্যান্য রমণীরা ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের ঈর্ষার আগুন আর কতদূর ছড়াবে, পাদিশাহ বেগম সম্মানে

সম্মানিতা জাহানারা হারেমের শাসন ক্ষমতা খুব কঠিনভাবে পরিচালনা করেন। মোগল হারেমের শালীনতা বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। সুতরাং বিদ্রোহিনী মাথা তুললেও জাহানারার দৃষ্টির কাছে মাথা নিজে থেকেই নত হয়ে যায়।

গোলাপউন্নিসা অনেকদিন সম্রাট শাহজাহানের প্রৌঢ় মনের স্তিমিত আকাঙ্খা মিটিয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানও বহুদিন আর অন্য কোন আওরতের প্রতি মধুর দৃষ্টি স্থাপন করেন নি। কিন্তু বাদশাহকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার পরও অনেকদিন গত হয়ে গেলে প্রথম আকস্মিক চমকটা মন্দীভূত হয়ে এলে গোলাপউন্নিসা বুঝতে পারে—তার হৃদয়ের আকাঙ্খা পূর্ণভাবে নিবৃত্তি লাভ করে নি। মনে হয় যেন, বাদশাহের আলিঙ্গনের মধ্যে কোন উষ্ণতা নেই, অনুভবের তীর্থে শুধু অনিচ্ছাকৃত বলপ্রয়োগের বেদনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই গোলাপউন্নিসা বেগম মহলের আরামকক্ষে মখমলের শয্যার ওপর আয়াসে শুয়ে ভাবে—।

দারা তখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র। পঞ্জাবের শাসনকর্তার পদ প্রতিনিধির ওপর স্থাপন করে তিনি সম্রাটের কাছেই রাজধানীতে অবস্থান করতেন। শাহজাহান এই পুত্রকে যে বেশী ভাল বাসতেন, তার প্রমাণ সবসময়ে সম্রাটের কাজের মধ্যে পাওয়া যেত। সেইজন্যে দারা একটু বেশী মাত্রায় অহঙ্কারী ও স্নেহের সুযোগে ইচ্ছানুযায়ী অন্যায়কেও প্রশয় দিতেন। তাতেও শাহজাহান পিতৃস্নেহের নিদর্শনে পুত্রকে সব সময়ে ক্ষমা করতেন।

এমনি একদিন দারা শাহজাহানের আরামকক্ষে প্রবেশ করছেন, দেখলেন একটি অপরূপ সুন্দরী রমণী অপরূপ ঐশ্বর্যের রোশনাই অঙ্গে ধারণ করে মস্তকে ওড়নার অবগুণ্ঠন টেনে পিতার আরাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়ালেন দারা।

তখন দারা তরুণ যুবক। সবে তার জীবনে তিনটি মহিষীর আগমন হয়েছে। রক্তে দারুণ আলোড়ন। বাহুতে সিংহের শক্তি। হৃদয়ে সঙ্গীতের মূর্ছনা। যে যাচ্ছিল সে গোলাপউন্নিসা। হঠাৎ সেও দারাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়নার আবরণের মধ্যে দিয়ে সুরমা আঁকা কাজল কালো আঁখির মেদুর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গোলাপউন্নিসা কী মোহ বিস্তার করল কে জানে—শাহজাদা দারা শিকো কেমন যেন স্থান-কাল ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন এটা বাদশাহী হারেম। এখানে বাইরের পুরুষের প্রবেশ

নিষেধ। তিনি ঢুকেছেন শুধু পিতা তাকে পেয়ার করেন বলে। পিতার সেই বিশ্বাস নষ্ট করে বিশ্বাসঘাতক হলে পিতার স্নেহ চিরতরে লুপ্ত হবে। কিন্তু আওরতের দৃষ্টির মাঝে যত কঠিন নিষেধের বাধাই থাক, তা লয় হয়ে যাবেই। যদি দৃষ্টির মধ্যে তেমনি কোন গভীরতা থাকে।

তারপরের ঘটনা অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। দারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। এদিকে গোলাপউন্নিসাও বিশ্বাসঘাতিকা হল। দারা তাকে বোঝালেন,—'সম্রাটের প্রিয় পুত্র হয়ে কোন অপরাধই পিতা গ্রহণ করবেন না। তা ছাড়া এই অসামান্য যৌবনের উপাচার নিয়ে প্রৌঢ় বাদশাহ কী করবেন, তার চেয়ে তার পুত্রের ভোগে লাগা যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত। এই দারাই গোলাপউন্নিসার নতুন নামকরণ করেন 'মিঠিবেগম'। মিষ্টি যৌবনের গুলাবী আতরের সৌরভে মাতানো মিঠিবেগমের হৃদয় সাগরে দারা তার তরুণ মনের বলিষ্ঠ মহব্বতের রোশনাই জ্বাললো। জাহানারা প্রিয়তম ভাই দারাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনি এই অপরাধ ক্ষমা করলেন। সম্রাট শাহজাহান যখন জানলেন, মনে অবশ্য কষ্ট পেলেন। কিন্তু তিনি নিজে বেশ ভালভাবেই জানতেন, গোলাপউন্নিসার যৌবন ভোগ করার মত শক্তি আজ তাঁর অন্তর্হিত। তার যোগ্যতা তাঁর পুত্রেরই আছে। নওজোয়ানের নতুন শক্তি গোলাপকে বহুসুখ প্রদান করতে পারবে। তাই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুজনকেই ক্ষমা করলেন।

এরপর দারার জীবনে কায়েমী হয়ে এল মিঠিবেগম। তবে সে বাদশাহের বেগমমহলেই অবস্থান করত, যেমন অবস্থান করত আর আর অন্যান্য শাহজাদাদের আওরতেরা। শাহজাদাদের নিজস্ব বেগম ছাড়া যে আওরৎকে হঠাৎ কোন শাহাজাদার ভাল লাগত, ভাল লাগলে মুহূর্তের অসাবধানতায় তাদের গ্রহণ করলে এই বাদশাহের হারেমেই স্থান পেত। কারণ বাদশাহের হারেমে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল কিন্তু শাহজাদাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল।

এমনি অনেক রমণী বঙ্গদেশ থেকে হারেমে স্থান পেয়েছিল। তাদের অধিকারে ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 'বাদশাহের দ্বিতীয়পুত্র শাহজাদা সুজা। শাহজাদা দারা, ঔরঙ্গজেব, মুরাদের নষ্টা আওরৎদের হারেমে স্থান দিয়ে বাদশাহ পিতা তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়-মনের পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

অবশ্য মিঠিবেগম চেয়েছিল হারেম থেকে চলে যেতে। বাদশাহের

সামনে থাকতে তার লজ্জা করত। একদিন যে বাদশাহ তাকে প্রাণভরে ভালবাসার ভূমিকা করে গেছেন, তাঁর অক্ষমতার জন্য ব্যঙ্গ করে তারই পুত্রকে গ্রহণ করে মিঠিবেগম তার আওরৎজীবনের সত্যিকার মনের আঘাত অনুভব করত। কিন্তু দারা তাকে মহলে কিছুতে নিয়ে যাবেন না। তিনি জানেন, তাঁর মহলে রাজপুত মহিষী রাণাদিল, খৃষ্টানী মহিষী উদিপুরী, তাছাড়া নাদিরা তার দুই পুত্র সুলেমান ও সিপ্‌হির ও কন্যা জাহনজেবকে নিয়ে থাকে। সেখানে এমনি একটি মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তুললে তাঁর মহিষীদের মধ্যে কলরব সুরু হয়ে যাবে। তাতে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশী। তাই মিঠিবেগম বাদশাহ হারেমেই থেকে গেল।

তারপর দারা সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃঘাতীযুদ্ধে লিপ্ত। তিনি যখন যেখানে যান তার সমস্ত পরিবার নিয়েই ঘোরেন। এই রীতি মোগল সাম্রাজ্যের। বাদশাহ যুদ্ধের সময় তাঁর বেগমদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শাহজাদারাও বাদশাহকে অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্যে দারা তাঁর তিন বেগম, পুত্র কন্যাদের নিয়েই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যখন তিনি 'সামুগড়' যুদ্ধে হেরে গিয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন, সেই সময় ঔরঙ্গজেব আগ্রায় এসে পিতাকে বন্দী করেন। দারা দিল্লীতে পালিয়ে যান। ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীতে এসে সিংহাসন অধিকার করেন তখন দারা অনেক দূরে।

দারা যখন শেষ দিল্লীতে এসেছিলেন, মিঠিবেগম তার সম্মানের উচ্চাসন থেকে নেমে এসে শাহজাদার পা জড়িয়ে ধরেছিল। চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে মিনতি করেছিল—তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসলে যে তাকে সর্বপ্রথমে পবিত্র হারেমের অন্তঃপুর থেকে বহিষ্কৃত করবেন—এ মিঠিবেগম বেশ ভালভাবেই জানত। কিন্তু দারার মন মিঠিবেগমের চোখের জলে সিক্ত হল না। তাঁর মন তখন বিক্ষিপ্ত। আগে সিংহাসন। আগে রাজৈশ্বর্য। তারপর আওরৎ। তাই তুচ্ছজ্ঞান করে মিঠিকে সামান্য আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তখন সবাই বুঝতে পারছিল, যে সাম্রাজ্যের আগামী ভবিষ্যৎ কী? কে বসবে এই রাজতখ্‌তে? তাই মিঠিবেগম হারেমের ভেতর নিজের কক্ষে সর্পদংশনের জ্বালা বুকে নিয়ে দিনগুলি অতিবাহিত করতে লাগল। কিন্তু সে যে কী অসহনীয়, কী নিদারুণ আওরৎজীবনের এই পর্যায়ে কেউ না পড়লে বুঝতে পারবে না। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করলেন। রমণীকুলের ধ্বংসকারী, কুটিলমনা

বাদশাহ শাহজাহানের কলঙ্কময় ঔরসজাত কন্যা রোশোনারা এসে রাজ-অন্তঃপুরের কর্ত্রী হয়ে বসলেন।

ঔরঙ্গজেব হারেমের প্রতিটি রমণীকে দর্শন করে বিশেষ করে তাঁর তিন ভাইয়ের কামনা চরিতার্থ হারেমের কলঙ্ক ও তাঁর পিতার কটি নষ্টা আওরতের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তাদের সম্বন্ধে সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি মিটে গেল। কিন্তু মিঠিবেগমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ঔরঙ্গজেব মৃদু হেসে পাশে দণ্ডায়মান বহিন্ রোশোনারার কানে কানে কি যেন নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী ক্ষুব্ধস্বর কানে গেল—'যে আওরতের যৌবনে আমার পিতা তাঁর দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছেন, পিতার আওরতের ওপর শয়তান পুত্রের লোভ—' তারপর ঔরঙ্গজেব আসমানের দিকে তাকিয়ে খোদাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'হে খোদা, এই পাপীর সাজা তুমি নিজের হাতেই গ্রহণ কর—আমি কি শাস্তির ব্যবস্থা করব ভেবে পাচ্ছি না।'

ঔরঙ্গজেব যুদ্ধে চলে যাবার পর বার কয়েক রোশোনারা মিঠিবেগমকে তাঁর আরামকক্ষে ডেকে নিয়ে এসেছেন। মিঠিবেগম এলে বলেছেন—পূর্বের সরাব পরিবেশন করা কি তুমি ভুলে গেছ? তারপর নিজেই হো হো করে হেসে বলেছেন—বাঁদীর জীবন নিয়ে জন্মে সে কী কখনও ভোলা যায়? নফর—নফরই। সে বেগম হতে চাইলে বাঁদীর কলিজা পাল্টাবে কেমন করে? বলে আবার হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়েছেন। তারপর হাসি প্রশমিত হলে ক্রুদ্ধস্বরে মিঠিবেগমকে বলেছেন—বাঁদীর পোষাক পরে আয়, এসে আমাকে সরাব পি-লা।

মিঠি আবার গোলাপউন্নিসা বাঁদীই হয়েছে। প্রতিবাদ না করে বাঁদীর পোষাক পরিধান করে এসে রোশোনারাকে সরাব পরিবেশন করেছে। কিন্তু রোশোনারা তাতেও খুশী হন নি। নেশার মাত্রা খুব গভীর হলে তিনি গোলাপউন্নিসাকে বলেছেন—তোর আওরৎ জীবন তো বহু মরদের উষ্ণরক্তে কলঙ্কিত। আর নিজেকে পবিত্র রেখে কি হবে—দুচারটে মরদের ইন্তেজার যদি আশা করিস্ আমাকে বল, তাহলে ব্যবস্থা করে দি। কিন্তু রোশোনারা গোলাপউন্নিসার ইচ্ছার অপেক্ষা করেন নি, শয়তানী মন নিয়ে মরদের আয়োজন করে, নিজে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে গোলাপের ওপর অত্যাচার করাতে চেষ্টা করেছেন।

সেদিনের সেই রাত্রিটি মিঠিবেগমের জীবনের বড় পরীক্ষার দিন।

শক্তিশালী এক সৈনিক পুরুষ তার শক্তিশালী বাহুর শক্তি দিয়ে অনিচ্ছাকৃত এক পবিত্র আওরতের দেহবাস উন্মোচন করবার জন্তে চেষ্টা করে চলেছে। মিঠি তার চোখে জলের ধারা নামিয়ে মিনতি করে, শক্তি প্রয়োগ করে নিজের লজ্জাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে চলেছে।

আর এদিকে আর এক আওরৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য এক আওরতের নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে পৈশাচিক আনন্দে অট্টহাস্য করেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সৈনিকপুরুষ গোলাপের মিনতিতে অন্যমনস্ক হয়ে বলপ্রয়োগ করতে ভুলে গেছে, কিন্তু রোশোনারার শাসনে আবার সেই সৈনিক মিঠিবেগমের বক্ষবাস উন্মোচনের জন্য মসলিনের পাতলা ওড়না আকর্ষণ করে টেনেছে।

শেষে যখন আর পেরে ওঠে না গোলাপ, তখন ছুটে গিয়ে রোশোনারার পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলে—বেগমসাহেবা, আমাকে কদিনের জন্য সময় দিন, শাহজাদা দারার সন্তান আমার গর্ভে। তার মুক্তি হলেই আপনি যা বলবেন আমি তাই মেনে নেব।

কিন্তু এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোশোনারা হঠাৎ মহলের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দারুণ অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি তুলে চারদিক ভরিয়ে তুললো। সেইরাত্রে দিল্লীর রাজঅন্তঃপুরের একটি গোপনীয় কক্ষের চারদিকে শুধু রোশোনারার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি।

রোশোনারা তাঁর আওরৎজীবনের ধর্ম দিয়েও বিচার করেন নি, মমতা দিয়েও ক্ষমা করেন নি। মিঠিবেগমের শেষ আর্জি ও মিনতিতে হয়ত কোন আওরতের চিন্তাধারায় একটু থম্‌কে যাওয়ার ভাব আসতো, বিশেষ করে একটি রমণীর গর্ভে সন্তানের ভ্রূণ। আবার আওরৎজীবনের অন্যচিন্তাও মনে আসে, স্বভাবতঃ রমণীর জননী হওয়ার আক্রোশে অন্য রমণীর হৃদয়ে বিক্ষুব্ধ ভাব আসে, হয়ত রোশোনারার মনে সেই আক্রোশ ইমারত তৈরী করতে মিঠিবেগম আর রেহাই পেল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিঠিবেগমের বসন উন্মোচন করান। তারপর···।

মিঠিবেগম বেগমমহল থেকে বাঁদী মহলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। নির্দেশ রোশোনারার। সেই বাঁদীমহলের একটি সাধারণ কক্ষে একটি সাধারণ বিছানার ওপর বেগুনা আওরৎ ইস্পাহানি বক্রছোরাটি আমূল নিজের

কলিজার মধ্যে স্থাপন করে, রক্তের স্রোতে চারদিক রুধিরাক্ত করে নিজের কলঙ্কময় জীবনাধ্যায় শেষ করেছে।

রোশোনারা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, অনেকেই তখন উপস্থিত। ঔরঙ্গজেবের চারকন্যা বাঁদীদের আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করছিল। কিন্তু তার মধ্যে জেবুন্নিসা গম্ভীর হয়ে শান্তদৃষ্টিতে যন্ত্রণাকাতর রক্তাক্ত মিঠির নীলাভ মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

রোশোনারা সদ্য স্নান সেরে রঙমহলের পোষাকে ভূষিতা হয়ে বাঁদীর কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। রক্তাক্ত মিঠিবেগমের দিকে একবার তাকিয়ে কক্ষের চারদিকে বাঁদী, বেগম যারা উপস্থিত ছিল তাদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—এত ভীড় করার কি আছে? এক নষ্টা আওরতের মৃত্যু ঘটেছে, এতে হারেমেরই মঙ্গল। তার জন্যে দুশ্চিন্তার কী?

ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠকন্যা মিহর হঠাৎ বলে ফেলল—ওর গর্ভে একটি সন্তান ছিল শাহজাদী!

রোশোনারা ব্যঙ্গ করে বললেন—রাজ্যে মরদের দুর্ভিক্ষ হয় নি, সুতরাং সন্তান গর্ভে আসাও বিচিত্র নয়।

ঔরঙ্গজেবের অন্য কন্যা জিনৎ এগিয়ে এসে বলল—কিন্তু কেন আত্মহত্যা করল, জানা উচিত তো?

কোন প্রয়োজন নেই। হারেমে অসংখ্য আওরৎ। বাঁদার জীবনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হলে তার আগে সমস্ত বাঁদীদের বেঁধে ঘাতকের কাছে পাঠালেই ঠিক হয়।

মিঠিবেগম দারাচাচার আওরৎ ছিল।

আবার রোশোনারা ব্যঙ্গ করে বললেন—এখনও বৃদ্ধ বয়সে পিতারও কম আওরৎ নেই। মোগল সাম্রাজ্যের রাজপুরুষদের এই গুণ একটু বেশীমাত্রায় আছে সে তো সবাই জানে।

তারপর রোশোনারা অপেক্ষা না করে খোজাদের নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন—বাঁদীদের যেখানে কবর দেওয়া হয় সেখানে আগামী প্রত্যুষে গোলাপউন্নিসার কবর দেওয়া হবে।

জেবুন্নিসা কোন কথা না বলে নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করে চলে গেল। তার শুধু অপেক্ষা পিতার জন্য। পিতা না ফেরা পর্যন্ত সমস্ত অন্যায় ও

অত্যাচার নীরবে হজম করতে হবে। উপায় নেই। রোশেনারার মত রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে পিছনের একটা বিরাট শক্তিই দরকার।

শেষ পর্যন্ত জেবুন্নিসার প্রত্যাশা সফল হল।

দিল্লীর প্রাসাদে সংবাদ ছুটে এল। বিজয়ী ঔরঙ্গজেব ফিরছেন।

'জালা জাল্লালুল্লাহ' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বিজয়ী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘজীবন কামনা করতে করতে অসংখ্য বাহিনী বিজয়ী নিশান উড্ডীন করে দিল্লীর পথ মুখরিত করে অশ্ব, হাতি, উট, মানুষের পায়ের পদধ্বনি জাগিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল।

সংবাদ বহুদিন আগেই দিল্লীর রাজপ্রাসাদে এসেছিল। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধের পর পর জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কিছু সংখ্যবাহিনী দিল্লীতে প্রেরণ করেছিলেন। দূত এসেছিল মুহূর্মুহুঃ। দূতের মুখে ঘোষিত হয়েছিল ঔরঙ্গজেবের বিজয়ের বার্তা। ঘোষিত হয়েছিল আরও নৃশংস সংবাদ। যা শুনলে মানুষের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কেঁপে উঠেছিল সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য। কেঁপে উঠেছিল সমগ্র ভারতের মাটি পর্যন্ত।

ঔরঙ্গজেবের দরবেশের আলখাল্লার নীচে তাঁর শিরায় চেঙ্গিসের রক্তের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। চেঙ্গিস সমস্ত পৃথিবীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিলেন। স্বার্থান্বেষী ঔরঙ্গজেবের মধ্যেও যখন স্বার্থের নেশা তীব্র হয়ে উঠত, কৌশলের প্রয়োজন হত, শক্তি সংগ্রহের আকুলতায় তখন ঔরঙ্গজেবের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠত; রক্তধারায় মুছে যেত কোরাণের অক্ষরগুলি।

হাতির ওপর নানাবিধ অলঙ্কার ও রঙীনবস্ত্রে সিংহাসন সাজানো। তার ওপর বসে বিজয়ী ঔরঙ্গজেব। সূর্যের তীব্র আলো সিংহাসনের মাথার চন্দ্রাতপ ভেদ করে এসে আগামী দিনের সম্রাটের মুখের ওপর বিকীরণ করছে। মুহূর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত। সঙ্গে বাজনার তালে তালে পদাতিক সৈনিকের পদযুগল উত্থিত হচ্ছে।

দিল্লীবাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ভাবছে—এরপর।

এরপর আসবে এঁরই শাসনাধীনে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্য। সম্রাট শাহজাহানের পর সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

সেদিন প্রতি মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে আনন্দধ্বনি বিঘোষিত হয় নি।

জেগেছে কান্না, মানুষ কেঁদেছে একান্ত নিরালায়, একান্ত সঙ্গোপনে—পাছে নবীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হন।

খাজোয়ার যুদ্ধও হয়ে গেছে। সে যুদ্ধে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহাজাদা সুজা তাঁর সব হারিয়েছেন। সে ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ। শাহজাদা সুজার প্রিয়তমা মহিষী পিয়ারীবানুর ভীষণ আত্মহত্যা আরাকানের সেই বর্বর রাজা পিয়ারীবানুর অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে তার ইন্দ্রিয় পিয়ারীবানুকে অধিকার করবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। শাহজাদা সুজাকে পশ্চাদ্ধাবন করে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হত্যা করিয়ে পিয়ারীবানুকে অধিকার করেন।

পেয়েছিলেন অবশ্য পিয়ারীবানু শাহজাদা সুজার কাছ থেকে অনেক দুঃখ। শাহজাদা সুজার বিলাসী জীবনের মধ্যে ছিল বহু রমণীর আনাগোনা। কিন্তু পিয়ারী তাঁর স্বামীর প্রাণের প্রহরিণী হয়ে সর্বদা তাঁকে ওড়নার আড়ালে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি কখনও চান নি স্বামীকে হারাতে।

আরাকানের দস্যুরাজ তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর রূপবহ্নি উপভোগ করবার জন্যে অনেক প্রলোভন দেখান। কিন্তু যে রমণী জীবনের বহুদিন শাহজাদা সুজাকেই চিন্তা করে এসেছে, যে রমণী একদিন রাজরানী হবার বাসনা রেখেছিল, আজ তাঁর অবস্থান্তরে আরাকান দস্যুরাজকে আপন হৃদয় দান করে নিজের প্রাণ বাঁচাবে? পিয়ারীবানু বদ্ধকক্ষের মধ্যে বন্দিনী থেকে প্রস্তরময় দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে নিজের রূপরাশি বিনষ্ট করে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এসব সংবাদও দিল্লীতে এসেছিল। দিল্লীর হারেমের রমণীকুলে পিয়ারীবানুর ভীষণ আত্মহত্যা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুলতান মহম্মদের শিবিরের মধ্যে সুজার একমাত্র কন্যা গুলরুকবানুকে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছেটা মহম্মদের। পৃথিবীতে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদ কৌশল করে পিতার রোষবহ্নি থেকে গুলরুককে বাঁচিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব চেয়েছিলেন ভ্রাতাদের সমস্ত চিহ্ন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে। তার উত্তরে সুলতান মহম্মদ পিতার কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছে—'যে মোগল সাম্রাজ্যে শাহজাদীদের জীবনের মূল্য কি? গুলরুককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া মানে শক্তিবানের হস্ত কলুষিত করা।' আসলে অবশ্য অন্য ঘটনা ছিল। মহম্মদ গুলরুককে

ভালবাসত। সে কথা ঔরঙ্গজেব জানতেন। পুত্রের কথাতে প্রতিবাদ না করে সমর্থন করে তিনি অন্য একটি গভীর চিন্তা মনে পোষণ করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেই মহম্মদ তাঁর শিবিরে গুলরুকের হৃদয় অধিকার করে তাকে শাদী করেছিল। মহম্মদ ভেবেছিল, পিতা যদি কোন দিন তাঁর মত পরিবর্তন করেন, তাহলে গুলরুক পৃথিবী থেকে সরে যাবে। সেইজন্যে গুলরুককে রক্ষার জন্য তার বেগম করে মহম্মদ তাকে রক্ষা করেছিল।

এমনি ইতিহাস ভাগ্যাহত সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা বুলন্দ্‌ ইক্‌বাল দারা শিকোর। তাঁর মনে ছিল অনেক আশা। তিনি আবার ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করবেন। আবার দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করবেন। আগ্রার কক্ষে বন্দী সম্রাট পিতাকে মুক্ত করবেন।

সেইজন্যে তিনি দিল্লী থেকে গুজরাটের পথে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে এসেছিলেন। গুজরাটে এসে নিয়তি-নিপীড়িত রাজকুমারের অপ্রত্যাশিত অর্থ ও লোকবল লাভ হল। তার ওপর হঠাৎ আজমীরে মিলিত হবার জন্যে সম্রাট শাহজাহানের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ রাঠোরপতি যশোবন্ত সিং সাদর আহ্বান করলেন। তাতে শাহজাদা দারার নিষ্প্রভ ও নিরুৎসাহী মনে হঠাৎ ঈশ্বরের আহ্বান বলে মনে বলের সঞ্চার হল। শাহাজাদা দারা ভাবলেন, এবার হয়ত তিনি যশোবন্ত সিংহের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হবেন। আবার হয়ত তাঁর জীবনের দুর্ভাগ্যের কালিমা মুছে গিয়ে নতুন আলোকপাত হবে। সেইজন্যে নববলে বলীয়ান যুবরাজ দারা অদম্য উৎসাহে যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তাঁর নূতন সৈন্য নিয়ে আজমীরের পথে অভিযান করলেন। সেদিন ছিল একহাজার উনসত্তর হিজরী জমাদিউল আওয়াল। কিন্তু ধর্মাট্‌-ক্ষেত্রের পলাতক যশোবন্ত ইত্যবসরে ঔরঙ্গজেবের প্রলোভনে ভুলে প্রতিশ্রুতমত দারার পক্ষ অবলম্বন করলেন না। ঔরঙ্গজেবের ইন্দ্রজালে, চক্রজালে বা অর্থজালে ধরা পড়েনি এমন কেউই অবশিষ্ট ছিল না। অপ্রত্যাশিত বন্ধুর অভাবনীয়-ব্যবহারে উদ্‌ভ্রান্তমতি দারা কিংকর্তব্য স্থির করতে পারলেন না। এদিকে পলায়নের আর উপায় নেই। ঔরঙ্গজেব সকল পথ বন্ধ করেছেন। অনন্যোপায় যুবরাজকে রণে অবতীর্ণ হতে হল। তিনদিন যুদ্ধের পর 'দেওরাই' ক্ষেত্রে সর্বস্ব হারিয়ে দারা মের্তায় পলায়ন করলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁর পশ্চাতে লোক নিযুক্ত করলেন। দারা বিশ্রামের

আরাম বর্জন করে শ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আবার বাঁচবার জন্যে কচ্ছ প্রদেশের পথ অবলম্বন করলেন। পারস্য সীমান্তের অনতিদূরে অতি ক্ষুদ্র ধূণরাজ্য। সে রাজ্যের আফগান রাজাকে দারা অতীতে তিনবার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল। তার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে ধূণরাজ্য পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আফগান রাজা তাঁকে সাহায্য না করে সপরিবারে কারারুদ্ধ করল এবং সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন করল। দারার খোজা ভৃত্য আফগান সুলতানকে হত্যা করে তার প্রভুকে রক্ষা করবার সংকল্প করল। কিন্তু তার বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হয়ে গেল। দারার সমস্ত সৈন্য কারারুদ্ধ হ'ল। সংবাদ রটে গেল যে, ঔরঙ্গজেবের সৈন্য ধূণরাজ্য থেকে বেশীদূরে নয়।

দারার সঙ্গে ছিলেন তাঁর তিন মহিষী—নাদিরা বেগম, উদীপুরী, রানাদিল, কন্যা জানী বেগম ও কনিষ্ঠ পুত্র সিপহর আর দারার দুইসহস্র অনুচর। আফগান সুলতান অনুচরদের কাছ থেকে দারাকে বিচ্ছিন্ন করলে দারার প্রধানা স্ত্রী নাদিরাবেগম ভয়ার্তা, কম্পিতা, নিরাশাহতা হয়ে পড়লেন। এই নাদিরা ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র পরভেজের কন্যা। তাঁর শোণিতে প্রবাহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের রক্ত। তিনি স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সুতরাং তিনি স্বামীর অবর্তমানে জীবনধারনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। ঔরঙ্গজেবের পার্শ্বচারিণীরূপে নিজেকে কল্পনা করে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন—'প্রতিহিংসা পিপাসু ঔরঙ্গজেব আমার স্বামী-পুত্রের রক্তে তাঁর রক্তপিপাসা নিবারণ করবেন। সেই অত্যাচারীর জয়যাত্রার পথে আমার মৃত্যু হবে তার জয়চিহ্ন।' তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর অঙ্গুরীর বিষ লেহন করলেন; মুহূর্তে তাঁর মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিতা হ'ল। এমন দুর্ভাগ্য আর দারার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নি। নাদিরা বেগম ছিলেন রমণীকুলমণি। দারার মনের সাহস, কর্মের প্রেরণা. শক্তির আধার। দারা বুঝলেন, তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর কাছ ছেড়ে একেবারে চলে গেল।

মৃত্যু-শিবিরে তখনও ক্রন্দনধ্বনি শেষ হয় নি, অস্ত্রের ঝণঝণা বেজে উঠল দুর্গদ্বারে। ঔরঙ্গজেবের অনুচর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল,—'বন্দী কর।' সেই স্বর ধূণরাজ্যের সমস্ত দুর্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। দারা তরবারি উত্তোলন করলেন, তাঁর আকাঙ্খা পত্নীর পাশে সংগ্রাম করে নিহত হবেন। কিন্তু শত্রুগণ তাঁকে সে সুযোগ দিল না, বন্দী করল, তাঁর হস্তপদ শৃঙ্খলিত করল। দারা যে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন তার চতুঃপার্শ্বে

হস্তীপৃষ্ঠে উন্মুক্ত বর্শা ও তরবারী নিয়ে ঘাতক। সঙ্গে অন্য হস্তীপৃষ্ঠে তার অন্য দুই স্ত্রী, সন্তানগণ এবং ক্রীতদাসীগণ।

চল্লিশদিন একাধিকক্রমে পথ অতিক্রম করে বন্দীর চারদিকে উজ্জ্বল বর্ম-পরিবৃত কয়েকটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রহরী নিযুক্ত করে বিজয়ী ঔরঙ্গজেব তাঁর বিপুল বাহিনী নিয়ে দিল্লীতে ফিরলেন।

পথে কাতারে কাতারে লোক। কেউ এতটা আশা করে নি। যে যুবরাজ একদিন সম্রাট শাহজাহানের নয়নের মণি ছিল, যে ভাবিকালের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, তাঁর অবস্থা দেখে দিল্লীবাসীর চোখে জল এসে গেল। কিন্তু কাঁদবার উপায় নেই। কাঁদলেই নতুন সম্রাট প্রাণ সংহার করবেন। তাই অনেকেই কান্নাকে গোপন করে কান্নার অন্য এক রূপান্তরে দারার দুর্ভাগ্য দেখে ব্যঙ্গস্বরে হো হো করে হেসে উঠল।

প্রকৃত দারাই যে ধৃত হয়েছেন, জনসাধারণকে তা দেখাবার জন্যে সপুত্র রাজকুমারকে এক কর্দমাক্ত হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে নগর ভ্রমণ করান হল। মোগল সম্রাট শাহনসা শাহজাহানের প্রিয়পুত্র একদিন যে-পথে সর্বসাধারণের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতুল-গৌরবে বিচরণ করেছেন, প্রখর রৌদ্রে হীনজনোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, নতনয়নে অধোবদনে গমন করতে আজ সেই পথ তাঁর নিদারুণ লজ্জার হেতু হল। মানুষের করুণ দৃষ্টির সম্মুখে দিল্লীর রাজপথে বিশ্রুত শক্তিমান শাহজাদা বুলন্দ্ ইকবাল দারা শিকো। কী নিষ্ঠুর আশ্চর্য ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস!

একজন ফকির চীৎকার করে বলল—'শাহজাদা দারা, যখন তুমি স্বাধীন ছিলে, তুমি প্রত্যহ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছ, আজ তোমার দেওয়ার মত কিছু নেই।' তবু সম্রাট পুত্র তাঁর ছিন্ন গাত্রাবরণ শালটি ফকিরকে দান করলেন। ইহলোকে তাঁর সর্বশেষ দান অর্পণ করার লোভ সংবরণ করতে তিনি পারেন নি! কিন্তু ঔরঙ্গজেব দান সম্পন্ন করতে দেননি, কারণ বন্দীর তো দানের অধিকার নেই!

হতভাগ্য দারা! হিন্দুস্তানের ভাগ্যবিধাতা সম্রাট আকবরের মতানুসরণকারী জ্ঞানী দারা। শাহজাহানের প্রিয়পুত্র বুলন্দ ইকবাল দারা। তাঁর আজ অবস্থা অবলোকন করে মনে হয় দুনিয়ায় বুঝি ইনসাফ নেই। ইনসাফের ইজ্জত নেই। যুদ্ধে অনেকেই হেরে যায় কিন্তু এমনি নৃশংসতা

বন্দীর ওপর এই প্রথম। ঔরঙ্গজেব ধর্মের দোহাই দিয়ে শত্রু ভ্রাতাকে ক্ষমা করলেন না। ইসলামের শত্রু। সুতরাং তাঁর শত্রু।

দিল্লীতে ফেরার পর ঔরঙ্গজেব সেইজন্যে আর কালবিলম্ব করলেন না। একদিকে শত্রুর ধ্বংস অবিলম্বে সমাধা করা উচিৎ, অপরদিকে দারা বেঁচে থাকলে তাঁর শান্তি নেই। শত্রু যদি কোনরকমে চক্রান্তজাল বিস্তার করে মুক্তি পায় তাহলে সমস্ত বিজয় নিরানন্দে পর্যবসিত হবে। সেইজন্যে ঔরঙ্গজেব জীঘাংসু নজরবেগের হতে দারার প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। কারাগারের মধ্যে নজরবেগ বন্দী দারা ও তাঁর পুত্র সিপ্‌হর শিকোর পর নৃশংস অত্যাচার সুরু করল।

দারার বিচারও সমাপ্ত হল। 'মুক্তি পূজা, ইসলামের শত্রু এই অপরাধে' —তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে। দারা ক্ষমার জন্য আবেদন করেছিলেন— 'জনাব বাদশাহ ও ভাইসাহিব!' বাঁচবার জন্যে তাঁর সে কী আকুতি। 'ময়ুর সিংহাসনের মোহ আমার অন্তর থেকে চিরান্তরিত হয়েছে। বংশাবলীক্রমে তুমি সিংহাসনে সুখে ভোগ কর ; কিন্তু এ হতভাগ্যকে হত্যা করবার জন্য মনে মনে যে অভিসন্ধি পোষণ করছ, তা ন্যায় বা ধর্মসঙ্গত নয়। যদি দয়াপরবশ হয়ে আমায় বাসোপযোগী একখানি ঘর ও সেবার জন্যে একটিমাত্র পরিচারিকা দাও, জীবনের অবশিষ্টকাল নির্জনে তোমার কল্যাণ কামনা করব।' বলতে বলতে উন্মুক্ত রাজসভায় সবার সম্মুখে সমস্ত সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে দারা কান্নার ভারে ভেঙে পড়ল।

রাজপুত্রের এই শোচনীয় পরিণামে সকলের হৃদয় ভিজল, পাষাণ কোমল হল, কিন্তু কঠোর ঔরঙ্গজেবের চিত্ত গলল না। ক্ষমা! চিরবৈরী দারাকে ক্ষমা! নরত্বের চরম বিকাশ, খোদার পরম উপাধি, সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠতম বিধি, মানব-ভাষার পবিত্রতম ক্ষমা—ঔরঙ্গজেবের অভিধানে তা নেই!

পরদিন ভোর হবার পূর্ব মুহূর্তে নিষ্ঠুর-নেত্র ও বিভীষণ-মূর্তি নজর-বেগ তার অনুচরবর্গ নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের দেখে শিউরে দারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পরক্ষণে নতজানু হয়ে বললেন—'আমাকে হত্যা করতে এসেছ?' আততায়ীগণ সিপহরকে স্থানান্তরিত করার ভান করল। মহাভয়ে সিপহর পিতার পাশে নতজানু হয়ে দৃঢ় বাহুতে পিতাকে জড়িয়ে ধরল। ভীতিবিহ্বল পিতাপুত্রের করুণ ক্রন্দনে কঠোর কারাকক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। অবশেষে বলপ্রয়োগে নির্দয় হৃদয় আততায়ীগণ সিপহরকে পিতৃ-

ক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল। দারার উপাধান তলে একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা লুকানো ছিল। নৈরাশ্যের বলে বলীয়ান দারা সহসা তা করায়ত্ত করে জনৈক আক্রমণকারীর পঞ্জরে আমূল বিদ্ধ করে দিলেন; কিন্তু সে দৃঢ়বদ্ধ ছুরিকা আর মুক্ত করতে পারলেন না। ঘাতকের খড়্গের তলায় নিয়ে যাবার জন্য সকলে তাঁকে ধরাধরি করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। ঘাতকের আঘাতের পূর্বে দারা চীৎকার করে বলেছিলেন,—'মহম্মদ আমার প্রাণ হরণ করেছে, ঈশ্বরের পুত্র আমাকে জীবন দান করেছে।'

'মহম্মদ মরা জান্ মি কুশাদ,
ইবন আল্লাহ্ মরা জান্ মি বকৃশাদ্।'

মানুষ যত, ঈশ্বরের পথ তত। দারা বহু পথে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঈশ্বর লাভ করেছেন কি? অথচ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি শাহনসা আকবরের অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করে জগতে কীর্তি রেখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ পরিণতি এমনি নিষ্ঠুরভাবে সম্পন্ন হতে এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হল যে, জগতের নিয়ম বিচিত্র। তাই মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল—জগতের সনাতন নিয়ম কোন মানুষ অতিক্রম করে যেতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি বন্ধন আছে, যা' কোন ভাষা পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না।

দারার শিরশ্ছেদ হয়ে যাবার পর তাঁর ছিন্নমুণ্ড ঔরঙ্গজেব পিতার সমীপে আগ্রার দুর্গে প্রেরণ করলেন। কারণ শাহজাহান তাঁর প্রিয়পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন বলেই এই আয়োজন। এ ধরনের নিষ্ঠুরতায় ঔরঙ্গজেবের নৃশংসতাই প্রমাণিত হয়। সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করে রেখে তাঁর চোখের সামনে পুত্রের বীভৎস রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড!

বন্দাকক্ষে পিতার পাশে বসেছিলেন জাহানারা। প্রহরী রক্তময় পাত্রের ওপর দারার বীভৎস রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডটি নিয়ে ঢুকলে সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ শাহজাহান চোখের ওপর দুই করতল স্থাপন করে চীৎকার করে বললেন—না, না, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে ঐ বীভৎস ছিন্নমুণ্ড! উঃ কী নৃশংস পুত্রের পিতা আমি। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পিছন করে যমুনার পারে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন—'না না, আমি কখনও ক্ষমা করব না। জীবিত থাকতে কখনও পারব না।

মমতাজ ঐ তাজমহলের গহ্বর থেকে যদি আমায় অনুরোধ করে, তবু না। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়তম দারাকে যে হত্যা করেছে, আমার কাছে তার ক্ষমা নেই।' মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহাজাদা খুরম ওরফে সম্রাট শাহজাহান পাগলের মত বন্দীকক্ষে মেজের ওপর ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন।

জাহানারা সেখান থেকে উঠে ছুটে পালিয়ে গেছেন। চোখে হাত চাপা দিয়ে বীভৎস দৃশ্য থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালিয়ে গিয়ে তাঁর জেসমিন প্রাসাদে নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে নিজেকে রক্ষা করেছেন। দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে তিনি শুনেছিলেন কিন্তু তাঁর রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড কল্পনা করার শক্তি তাঁর ছিল না। সেই বীভৎস মুণ্ড অবলোকন করে তাঁর শরীরের কম্পন দারুণবেগে উত্থিত হয়েছে। উঃ কী নারকীয় সে দৃশ্য!

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বাতাস মৃদুগতি, সুন্দর পুষ্পগন্ধে ধরণী আমোদিত হচ্ছে, আগ্রা প্রাসাদের অঙ্গুরীবাগের প্রত্যেকটি ফুলের প্রাণে এখনও নৃত্যের ছন্দ। রক্তকরবী ফুলের রক্তস্তবক দেখে মনে হচ্ছে এখনও রক্তের আলোর শিখা জেগে আছে। দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গীত নিস্তব্ধ। কিন্তু সেই সঙ্গীতের ছন্দের শিহরণ এই দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে আর বাইরের বাতাসে গিয়ে পৌঁছবে না?

জাহানারা অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে বার বার নিজের শোকের বেষ্টনীতে ঘুরে ফিরে চীৎকার করতে লাগলেন—'এ কেন হল? আল্লা একি বিচার করলেন। আমি যে আমার ভ্রাতা দারার স্বপ্ন সফল করে দিতাম। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি—দুধারার মিলন করিয়ে দিতাম। মরমী সুফী সাধু সন্ত যোগীদের প্রেমবারি সিঞ্চন করে অমূল্য সুরাসার তৈরী করে দিতাম। সে সুরা রূপ নিত কাব্যের ঝঙ্কারে, ভাষার মূর্চ্ছনায়।'

কিন্তু সব স্তব্ধ। আগ্রার প্রাসাদের মধ্যে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছে। অঙ্গুরীবাগের পাশ দিয়ে চলেছে যমুনার স্বচ্ছ শ্রান্ত জলধারা। জলধারার বুকে এখনও স্রোতের কলতান। পত্রমর্মর এখনও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যমুনার জলে আজ যে কলতান, সে কলতানের সাথে সঙ্গীতের যোগ নেই। মনে হচ্ছে তার মধ্যে মৃত্যুর কলরোল। আসন্ন ধ্বংসের আশঙ্কায় মানুষের আর্তনাদ চারদিক কবরিত করে উত্থিত হচ্ছে।

ঔরঙ্গজেব এরপর নিয়ে পড়লেন দারার অবশিষ্ট পরিবারবর্গকে। দারার

দুটি বেগম রানাদিল ও উদিপুরী ও কন্যা জানীকে রাখা হয়েছিল দিল্লীর হারেমের একটি স্বতন্ত্র মহলের পরিবেশে। একরকম বন্দিনীর মত তাঁরা দিন-যাপন করতেন। তাঁরা জানতেন এরপর কি সংবাদ তাঁদের কাছে আসবে। তাই তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দারার প্রিয়তমা বেগম নাদিরা এই পরবর্তী প্রস্তাবের ভয়ে দারার পরাজয়ের পরই আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু উদিপুরী ও রানাদিল তা করতে পারেন নি। জীবন ও যৌবনকে নিঃশেষ করে দিতে তাঁদের প্রাণে লেগেছিল। কিম্বা অন্য এক প্রতিশোধের নেশায় তাঁদের রক্ত তখনও উষ্ণ। পরবর্তী ঘটনায় দ্বিতীয়টিই প্রমাণ হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেব সেই আশ্চর্য প্রস্তাব দারার দুই মহিষীর কাছে পাঠালেন। শুনে অবশ্য কেউই বিস্মিত হলেন না। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিজে একটু লজ্জা অনুভব করলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ইসলামের শত্রু বলে হত্যা করেছেন, তাঁর মহিষীদের গ্রহণ করে তিনি কী ইসলামের উপকার করবেন? তাই অন্যায় কাজটি নিজের সমর্থনের জন্য কোরাণেরই বচন উদ্ধৃতি করে প্রমাণ করলেন, ইসলাম ধর্মানু-সারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করতে বাধ্য। সেইজন্যে দারার দুটি প্রধানা মহিষীকে স্বীয় অর্ধাঙ্গের ভাগিনী হতে আহ্বান জানালেন।

আসল কারণ অবশ্য দারার তিন মহিষী অত্যাধিক সুন্দরী ছিলেন। মনে মনে অনেকদিন থেকে ঔরঙ্গজেব নিজের শয্যাসঙ্গিনী করবার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁরও বেগমরা সুন্দরী ছিলেন কিন্তু মনে হত, জ্যেষ্ঠভ্রাতার বেগমদের মত নয়। অবশ্য অপরের বেগম বেশি সুন্দরী হয়, এ কথা সর্বজনবিদিত।

যা'হোক উদিপুরী ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর সর্ত জানিয়ে সংবাদ পাঠালেন—'তিনি স্বামীর শোক ভুলে সম্রাটের বেগম হতে রাজী আছেন, কেবল যদি তাকে প্রধানা বেগম করা হয় এবং হারেমের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁকেই পরিচালনা করতে দেওয়া হয়।'

ঔরঙ্গজেব মনে মনে উদিপুরীকেই কামনা করেছিলেন। কারণ এই মেয়েটিকে তিনি দেখছেন খুব ছোটবেলা থেকে। আসিয়াখণ্ডের দূরপশ্চিম-প্রান্তস্থিত জর্জিয়া দেশের খৃস্টান কন্যা। বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী তাঁকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা তাঁকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অদ্বিতীয়া রূপলাবণ্যবতী হয়ে ওঠেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে দারা তাঁর অত্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত নিজে খৃস্টান হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন।

উদিপুরী দারাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। ঔরঙ্গজেবের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দারা-হত্যার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করলেন। শয়তান, কৌশলী ঔরঙ্গজেবের ধর্মকে ধ্বংস করবার জন্যে এবং তাঁকে বশীভূত করবার জন্যেই তাঁর এই প্রস্তাব-গ্রহণ। পরবর্তীকালে ইতিহাসে উদিপুরীর আর কোন প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প দৃষ্ট হয় না বলেই মনে হয়; হয়তো তিনি এ সঙ্কল্প পরে ত্যাগ করেছিলেন। তবে উদিপুরী নিজে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়ে মোগল হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করেছিলেন।

কিন্তু দারার রাজপুত মহিষী রানাদিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করেছিলেন। খৃস্টানী উদিপুরীর মত এত সহজে সমস্যার সমাধানে আসেন নি। তিনি রাজপুত কন্যা। পূর্বের জীবনে ছিলেন দিল্লীর বিপণীতে পথচারিণী নর্তকী। দারার ভালবাসায় মুগ্ধ। দারার বিরহে বিক্ষুব্ধ। তিনি ঔরঙ্গজেবের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর দিলেন—জাঁহাপনা, কেন আমাকে সাক্ষাতের জন্যে আহ্বান করেছেন?

সম্রাট উত্তরে জানালেন—তিনি রানাদিল্‌কে বিবাহ করতে চান।

রানাদিল জানালেন—আমার মধ্যে এমন কি আছে যা সম্রাটকে সন্তুষ্ট করতে পারে?

সম্রাট উত্তরে জানালেন—তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তৎক্ষণাৎ রানাদিল তাঁর ঘন কুন্তলদাম কর্তন করে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছে প্রেরণ করে জানালেন—জাঁহাপনা, এই সেই সুন্দর কেশদাম, আপনি যা পেতে চেয়েছিলেন। আমি শান্তিতে জীবনযাপন করতে চাই। আমাকে আর বিরক্ত করে আপনি আমার অশ্রদ্ধাভাজন হবেন না।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাতেও ক্ষান্ত হলেন না, পুনরায় জানালেন—আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। কারণ তোমার রূপ অতুলনীয়। তোমার দেহ-সৌন্দর্য বেহেস্তের হুরীকেও পরাজিত করে। আমি তোমাকে আমার অন্যতম সম্রাজ্ঞীর পদে উন্নিতা করতে চাই। তুমি নিশ্চয় আজ আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হবে। তুমি যদি শাহজাদা দারাকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমাকে তাঁর মত কল্পনা করলে পরবর্তী জীবনে সুখে হারেমের সুখ-শয্যায় বাদশাহের সুখস্পর্শে মোহিত হবে।

কিন্তু রাণাদিল আরো ভীষণ প্রতিশোধ নিজের ওপর দিয়ে সংঘটিত

করলেন। একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্যের অবদান রমণীর বক্ষ-সৌন্দর্য সমূলে কর্তন করলেন এবং নিজের অসামান্য সুন্দর মুখটি ক্ষত-বিক্ষত করে একখণ্ড বস্ত্রে রক্ত-লিপ্ত করে তা ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দিয়ে জানালেন—সম্রাট যদি সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, তাহলে রমণীর সেই বক্ষসৌন্দর্য আমি স্বহস্তে ধ্বংস করে আপনার নিকট পাঠালাম। যে মুখসৌন্দর্য দেখে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আমি তাও ক্ষতবিক্ষত করে দিলাম। যদি সম্রাট আমার উষ্ণরক্তের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে রক্তাপ্লুলিপ্ত বস্ত্রে সে স্পর্শ আপনাকে মাতন জাগায় কিনা দেখবেন। তাছাড়া আমি আমার সমস্ত রক্ত দিতে প্রস্তুত যদি সেই রক্ত পেয়ে আপনার তৃপ্তি সাধন হয়।

ঔরঙ্গজেব রাণাদিলের দৃঢ়চিত্ততার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিছুকাল আর রাণাদিল বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর দেহের জ্বালায় ছটফট করতে করতে ইহজগত ছেড়ে চলে গেলেন। মনে হয়, মৃত্যুর অপরপারে তাঁর স্বামীর সংগে মিলিত হবার বাসনায়—। কারণ রাণাদিলের শেষ ইচ্ছা তো তাই ছিল।

দারার কন্যা জানীর পূর্বের অপরাধের জন্য ঔরঙ্গজেব জানীকে আবার রোশোনারার হেফাজতে পাঠালেন।

এবার ঔরঙ্গজেব তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী মুরাদ বক্সের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। মুরাদকে গোয়ালিয়র-দুর্গে রাখা হয়েছিল তাঁর শেষ দিনটি ঘোষণা করবার অপেক্ষায়। মুরাদ আর বাঁচতে চান নি। বন্দী হওয়ার দিনটি থেকে তাঁর চিন্তা ছিল, হয় মৃত্যু নয় সিংহাসন। 'ইয়াতখ্‌ত্‌ ইয়াতবুত্‌।' কিন্তু তিনি এও জানতেন তাঁর বিশ্বাসঘাতক ভাই তাঁকে কৌশলে বন্দী করেছে। সহজে পরিত্রাণ দেবে না।

কোরাণ-স্পর্শ করে যে ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে ভাই শেষপর্যন্ত ইসলামের ধর্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। অবশ্য পরে বীরশ্রেষ্ঠ মুরাদ বুঝেছিলেন যে রাজকার্যের নিয়মই এই। বিশ্বাস স্থাপনা করলে কেউ কখনও জয়ী হতে পারে না। তাই তাঁর শেষ দিনগুলি আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে নিঃশ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার পূর্বপর্যন্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

মুরাদ ছিলেন শাহজাদা সুজার মত অত্যাধিক বিলাসী, মদ্যপ ও

নারীসঙ্গ। ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়র-দুর্গে পাঠিয়ে মুরাদের মনটা অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে সরসতিয়া বান্থ নামে একটি সুন্দরী আওরৎকে মুরাদের সঙ্গে বাস করবার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

সরসতিয়া বান্থ তার আওরৎজীবনের ভাললাগা ও ভালবাসা দিয়ে মুরাদকে মুগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি। মুরাদের তখন চেতনা সঞ্চার হয়েছে। শয়তান ভাই তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এই খাবসুরত আওরৎকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর চিত্তের বিক্ষুব্ধভাব স্তিমিত করে তাঁকে দুর্বল করে দিতে চান। তাই যা জীবনে শাহজাদা মুরাদ কোন দিন করেন নি তারই আশ্রয় নিলেন। সরসতিয়া বান্থর উদ্ভিন্ন যৌবন দেহভার—ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাকে ক্ষিপ্ত করা সত্বেও তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করে সরিয়ে দিলেন। বার বার বললেন—'আজ এ সময় তোমার অসামান্য রূপ ও যৌবন নিয়ে আমাকে প্রলুব্ধ কর না। তুমি নিশ্চয় জান আমি আওরৎকে কখনও অশ্রদ্ধা করি না। তাদের আমি দিল্লীর রাজপ্রাসাদের অঙ্গুরীবাগের প্রতিটি কুসুমকোমল, সৌরভে মোহিত রঙবেরঙের পুষ্পস্তবকের মত ভালবাসি। কিন্তু আজ আমার ঘোর দুর্দিন। আমার ভাইজান আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যদি কখনও এই ভীষণ গোয়ালিয়র কারাকক্ষের দুর্ভেদ্য-প্রাচীরের বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাই, যদি উদ্ধার করতে পারি সিংহাসন, তাহলে তোমার এই আওরৎ জীবন ও যৌবনকে আমি সেলাম জানাবো'।

কিন্তু রমণী শাহজাদা মুরাদের বর্তমান অবস্থা চিন্তা না করে ভুল অর্থ গ্রহণ করল। কিংবা ঔরঙ্গজেবের লোভের প্রস্তাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শাহজাদা মুরাদের ক্রন্দন মুখরিত আকুতি তার মনে রেখাপাত করল না। ঔরঙ্গজেব সরসতিয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুরাদকে প্রলুব্ধ করতে পারলে, তাঁর হারেমে সরসতিয়া স্থান পাবে। সরসতিয়ার সেই লোভ ছিল। আর সেইজন্য মুরাদের ক্রন্দন তার মন স্পর্শ করল না। তা'ছাড়া সরসতিয়া বান্থ ভাবল, শাহজাদা মুরাদ তাঁর রমণী জীবনকে অবমাননা :করেছেন। সেইজন্যে সরসতিয়া সেই অপমানের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে মনে মনে শাহজাদা মুরাদের মৃত্যু কামনা করল।

আর শাহজাদা মুরাদ সম্রাটের পুত্র হয়ে এমন আশ্চর্য মন পেলেন কেমন

করে, পরবর্তী ঘটনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়। তাঁর মুক্তির জন্য একবার গোপনে ব্যবস্থা হয়। প্রাচীরগাত্রে দড়ির সিঁড়ি লাগিয়ে, তলদেশে দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত রেখে চক্রান্তকারীরা একদিন গভীর রাত্রে তাঁকে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। মুরাদ সেদিন রাত্রে পালিয়ে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বেগুনা আওরৎ সরসতিয়ার জন্য কাতর হয়ে উঠলেন। আশ্বাসপ্রদান করে আসবার জন্যে পাশের কক্ষে তার কাছে গিয়ে বলতেই সরসতিয়ার রমণী অবমাননার ক্ষিপ্ত জ্বালা প্রক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চীৎকার করে উঠে রক্ষীদের মুহূর্তে সচেতন করে দিল।

ঔরঙ্গজেব আর কনিষ্ঠ ভাইয়ের জন্য চিন্তা করলেন না। মনে অবশ্য তাঁর এক একবার ক্ষীণ অনুশোচনা জাগত যে ভাই তাকে এত বিশ্বাস করল, সেই ভাইয়ের সামনে কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করা! কিন্তু এও ঔরঙ্গজেব ভেবেছেন, ঐ ভাইকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি তাকে কী সুখ দান করবেন? কখনই তাকে বন্দী জীবন থেকে তিনি মুক্তি দিতে পারবেন না। আর যদিও কখনও মুক্তি দেন, তাহলে সিংহাসনের জন্য ভাই আবার যুদ্ধের আয়োজন করবে। সুতরাং মৃত্যুই হ'ল একমাত্র তার উপযুক্ত সহজ পথ। কবরে শায়িত হলে উঠে আসবার সামর্থ্য থাকবে না। অন্তত তাঁর এই ভয়গ্রস্ত জীবন অনন্তকালের জন্য শান্তি পাবে। চিন্তা সমাপ্ত করেও তবু তিনি ইতস্তত করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁর বহু সময় মুরাদের বিচারের পূর্বে ব্যয়িত হয়েছিল।

দারার প্রাণ দণ্ডাদেশ দেবার সময় তাঁর এত চিন্তা করতে হয়নি। দারার মৃত্যু ও তাঁর ছিন্নমুণ্ড দর্শনে একটা পৈশাচিক আনন্দ মন থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দিন যত এগিয়ে গেছে তত যেন অনুশোচনার একটা শয়তানী হিমেল স্পর্শ তাঁকে কম্পনে ক্ষিপ্ত করেছে।

সেইজন্য তিনি দিল্লীর হারেমে আদেশ দিয়েছিলেন। 'কেউ কাঁদবে না। কারও চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে না। আমার বিনা হুকুমে যে কাঁদবে, যার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে, যার মনে শোকের ছায়া পড়বে তাকেই বাদশাহের আদেশে মৃত্যু দণ্ডাদেশ গ্রহণ করতে হবে। তাই কেউই কাঁদেনি। কিন্তু দারুণ এক স্তব্ধতা দিল্লীর হারেমে বিরাজ করেছিল। সবাই ছিল, কাজ ঠিকই সমাধা হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সে নিঃশব্দ মুখে কথা না বলে।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব হারেমের এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার

আস্ফালন করে বাঁদীদের শাসন করে শেষকালে সিংহাসনের কিছুদূরে 'নাকাড়াখানা' মঞ্চে যে বৃহৎ কাড়ানাকাড়া, দুন্দুভি, সানাই, কাঁসা ও লোহার মন্দিরাগুলি দিনরাত্রির নির্দিষ্ট ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানারকম সংকেতধ্বনির জন্য বাজানো হত, সেগুলিকে অহরহ বাজানোর জন্যে আদেশ দিলেন। খানিকটা কণ্ঠরুদ্ধ নিস্তব্ধতা কেটে কলরব সৃষ্টি হল বটে কিন্তু কৃত্রিম উপায়ের এই গোলমালে আসল উপলব্ধি চাপা পড়ল না। শুধু অসহ্য কোলাহল হতচকিত করে দিল সবাইকে।

তাই বাদশাহ তাও বন্ধ করে দিলেন।

শেষকালে হঠাৎ গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুরাদের পলায়নের সংবাদ এল। এবং তাকে পুনরায় ধৃত করা হয়েছে শুনে কাল বিলম্ব না করে তাঁর বিচারের আসনে বসলেন। কোরাণের নির্দেশ—কোন মানুষকেই বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তাই মুরাদের দোষ প্রমাণ করবার জন্যে ঔরঙ্গজেব এক অভিযোগকারীকে রাজদরবারে উপস্থিত করলেন। সেই ব্যক্তির অভিযোগে প্রকাশ হল, শাহজাদা মুরাদ অত্যন্ত নির্মমভাবে আলী নকীর নামে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন! হত্যাপরাধে মুরাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল।

তারপর আর ঘটনা কী—বধ্যভূমিতে সম্রাট শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র, মমতাজমহলের প্রিয়সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ মুরাদ বক্স বীরের মত যূপকাষ্ঠে নিজের মাথাটা স্থাপন করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গেল রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডটি কয়েক হাত। দারা ভাইজানের কাছে প্রাণভিক্ষা করেছিলেন কিন্তু মুরাদ নিজের প্রাণ ধরে রাখতে ঘৃণাবোধ করেছিলেন। যে ভাইয়ের ধর্মবিশ্বাস তৈমুর বংশের সম্মানকে কলুষিত করে মনুষ্যত্বকে লুটিয়ে দেয়—তাঁর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা—অন্ততঃ কলিজায় মানুষের শোণিত থাকতে নয়।

মুরাদের পুত্র ইজাদ বক্স ও কন্যা দোস্তার বানুকে বাদশাহ নিজের অধীনে নিয়ে এসেছিলন।

তখন দিল্লীর দরবারে শুধু মৃত্যুর মহোৎসবের খেলা চলছে। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে এতটুকু স্থির নন। তিনি প্রত্যেককে প্রবঞ্চনা করে সিংহাসন অধিকার করেছেন। দারা, সুজা, মুরাদ দুনিয়া থেকে অপসারিত হয়েছে। দারা শুয়ে আছেন তাঁর পিতৃপুরুষ হুমায়ুনের সমাধির একান্তে ঘাসের বিছানার তলায়। যদি কখনও দারা আবার জেগে উঠে

ছুটে আসে সিংহাসন অধিকার করতে? এই অদ্ভুত চিন্তায় মাঝে মাঝে ঔরঙ্গজেব রাত্রে নিদ্রা না গিয়ে কোষমুক্ত তরবারী হাতে ধরে অলিন্দের সামনে দাঁড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দারার বীভৎস ছিন্নমুণ্ডটা হঠাৎ যেন বাজপাখীর মত চোখ দুটিতে আগুন জেলে দাঁত বের করে হা: হাঃ অট্টহাসি হেসে ঔরঙ্গজেবের দিকে এগিয়ে আসে। তিনি চীৎকার করে অন্ধকারেই নিজের তরবারী আকাশমুখী তুলে বাতাসকে কেটে ছিন্নভিন্ন করেন। চীৎকার করে বলেন—'তুমি বিধর্মী, তুমি ইসলামের শক্র। মোগল সিংহাসনে ইসলামের শক্রকে বসতে দিলে তৈমুর বংশের শৌর্যবীর্যের অবমাননা হবে বলেই আমি তোমার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? রাত্রি শুধু অন্ধকার বুকে নিয়ে স্তব্ধতার নিবীড় গহনে বিরাজমান। ঔরঙ্গজেব শুধু রাজবেশ পরে মুক্তার কণ্ঠহারে কণ্ঠ শোভিত করে বুকের মধ্যে জ্বালা নিয়ে ক্ষিপ্ত। সেদিনের সেই রাত্রিগুলি, দিনগুলি ইতিহাসকার যদি তাঁর মনের রোজনামচা লিখতেন, তাহলে পেতেন পিশাচ-মনা ঔরঙ্গজেবের সত্যিকারের মনের তল। সে মনটি কত দুর্বল। নিজের দুর্বলতা লুকাবার জন্যে বারবার তিনি হত্যায় হাত কলুষিত করেছেন। কিন্তু কে জানত তাঁর সেই দুর্বলতা—জানত একজন, সে হল ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠকন্যা জেবুন্নিসা। সে এমনি একদিন পিতার কক্ষে রাত্রিবেলা প্রবেশ করে অশান্ত পিতার মস্তকে নিজের করপুট স্থাপন করে তাঁকে নিঃশব্দে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। নিঃশব্দে কেঁদেছে জেবুন্নিসা। এতটুকু শব্দ বের হতে দেয়নি। পিতার শয্যার পাশে বসে পিতার সমস্ত শরীরে হস্তপ্রলেপ দিয়ে পিতাকে নিদ্রার কোলে নিমজ্জিত করেছে। এমনি কতদিন রাত্রিতে জেবুন্নিসা পিতার শয্যাপার্শ্বে বসে কাটিয়েছে তার ইয়ত্যা নেই।

দিল্লীর হারেমের নতুনমহলের সুসজ্জিতকক্ষে উদিপুরী সম্রাজ্ঞীর পদ-গৌরবে তাঁর অপরূপ ভিন্নদেশীয় রূপের রক্তাভ রোশনাই জেলে নিজেকে মেলে দিয়েছেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁর কথা রেখেছেন। নীলনয়না উদিপুরীর অঙ্গে উঠেছে সম্রাজ্ঞীর বেশবাস, অলঙ্কারের জৌলুষ, জহরতের ঐশ্বর্য। তিনি তাঁর স্পর্দ্ধিত যৌবন দেহভার নিয়ে নবীন সম্রাটকে সম্পূর্ণ বশ

করেছেন। তাঁকে দেখলে আর মনেই হবে না একদিন ইনি অন্য একজনকে ভালবাসতেন, স্বামীর মৃত্যুতে তিনি দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নতুন যৌবনে পুষ্ট সজীব আওরৎ। ঔরঙ্গজেব নিজেও বিস্মিত হয়েছেন। এমনভাবে উদিপুরীর কাছ থেকে সম্ভাষণ পাবেন তিনি ভেবেই পাননি। প্রথম সাক্ষাতেই নবীন বাদশাহের বাহুবন্ধন নিজের করপুটে ধরে অধরে মিষ্টিহাসির আগুন জেলে পুড়িয়ে দিয়ে আকর্ষণ করলেন। মুগ্ধ করলেন। পুরুষের মুগ্ধবিস্ময়ের তীর্থে উন্নিতা হয়ে মদালসার মত মোহিনীমায়া সৃষ্টি করে নবীন বাদশাহকে নেশার সপ্তমার্গে পৌঁছে দিয়ে বাদশাহকে বশ করলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রকৃতস্থ হলে মনে মনে স্বীকার করলেন—উদিপুরীকে গ্রহণ করে তিনি ভুল কাজ করেন নি। দারা যে রত্ন ভোগ করত, দারা তাঁর উপযুক্ত নয়। আজ উপযুক্ত ব্যক্তির কাছেই উদিপুরী এসেছে। এবার উপযুক্ত আসন পেয়ে তাঁর রূপের সম্মান পাবে। উদিপুরীও স্বীকার করলেন তিনি আজ অত্যাধিক খুসী। আসমানকী তারা আসমানে প্রতিষ্ঠিতা না হলে তার যোগ্যসমাদর হয় না।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি কখনও অসংযমী হয়ে পড়তেন না। সংযম রক্ষা করা তাঁর স্বভাবের প্রধান অঙ্গ। সেইজন্যে তিনি ভবিষ্যতের ইমারত তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। উদিপুরীকে তিনি ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন। তাঁর কৈশোর আস্তে আস্তে রঙ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে যৌবনের প্রথম চুম্বন গ্রহণ করেছে। দারার কিনে আনা সম্পদ দারার ভোগের জন্য। দারা ভোগ করেছে। আর ঔরঙ্গজেব দেখেছেন। কিন্তু তখন উদিপুরীকে অধিকার করে একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করতে চান নি। শুধু মনে মনে তাঁর সঙ্কল্প ছিল যদি কখনও সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহলে ঐ অসামান্য যৌবন ঐশ্বর্য তাঁর লোমশ বক্ষের নিবিড় অংশে চেপে ধরবেন।

সেদিনের সেই সঙ্কল্প কাজে পরিণত হতে আজও তাঁর মধ্যে তেমন কোন উন্মাদনার প্রকাশ দেখা যায় না। তিনি শান্ত। তিনি সংযত, উচ্ছ্বাসবিহীন। তবে খুসী ও মুগ্ধ।

ঔরঙ্গজেবের রাজপুতমহিষী সুলতান মহম্মদের জননী নবাববাই স্বামীর এরূপ ব্যবহারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু তাঁর করার কিছু থাকল না। তিনিই

ছিলেন বাদশাহের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী এবং প্রথম মহিষী। তাঁর চোখের সামনে এক অপবিত্র বিধর্মী রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট সেই বিধর্মী বাইজী কন্যাকে বাদশাহের প্রধানা বেগম করলেন—এসব দেখে শুনে রাজপুত কন্যা নবাববাই অধোবদনে মুখ ঢাকলেন। শুধু তার প্রিয়তম পুত্র সুলতান মহম্মদের জন্য মনে দুশ্চিন্তা। সে না শেষপর্যন্ত পিতার রোষনয়নে পড়ে জীবনাহুতি দেয়। ইদানীংকালে বাদশাহের তখ্‌তে বসে ঔরঙ্গজেব একেবারে সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। জেবুন্নিসার জননী দিল্‌রস্‌বানু বেগমও স্বামীর পরবর্তী আচরণে তাঁর নসীবের জমিনে করাঘাত করেছেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব জানতেন এরা সকলেই তাঁদের অধিকার থেকে বিচ্যুত হলে ক্ষুব্ধ হন কিন্তু বাদশাহের মরুভূমিসম হৃদয়ে কোথাও এতটুকু মমতা আঁকলে যে বাদশাহকে বশীভূত করা যায়—এর সন্ধান রাখেন না। তাই যখন তিনি হত্যালীলা তাণ্ডব চালিয়ে নিজের দেহ মনের বিক্ষুব্ধ ভাব শান্ত করতে এদের সাহচর্য কামনা করতেন—তখন বাদশাহী বেগমদের সম্মানের ফরমাইসী ভঙ্গি দেখে তাঁর চিত্ত আরও তিক্ত হয়ে উঠত—তিনি মনে মনে হা-হুতাশ করতেন।

সেই সময় কোন একটি কোমল রমণীর সাহচর্য যখন আকাঙ্ক্ষা করেছেন, সামনে সেবার ভূমিকায় উপস্থিত হতে দেখেছেন তার কন্যা জেবুন্নিসাকে। তাঁরই সৃষ্টি একটি রমণীরত্ন। মোগল হারেমে এমন একটি পুষ্পরত্ন জন্ম নিয়েছে যার সৌরভ মনোমুগ্ধকর, রূপ বেহেস্তের জৌলুষ। তা'ছাড়া রমণীর সত্যিকারের স্বভাবের মধ্যে সেবা একটি ধর্ম। সেই সেবার রূপ বাদশাহ নিজের কন্যার মধ্যে দেখে তিনি ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে অন্তত হারেমের সমস্যাকে ভিন্ন করে রাখলেন।

পিতা পেলেন কন্যার কাছ থেকে সান্ত্বনা। কিন্তু কন্যার মনের অবস্থা পর্যালোচনা করার চিন্তা কেউ করল না। জেবুন্নিসা মনে মনে পিতাকে তাঁর কাজের জন্য দারুণভাবে ঘৃণা করত। একথা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। সকলে জানত পিতা-পুত্রীর মধ্যে মিলনই ছিল তাদের সেতু। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ও জেবুন্নিসার স্বভাবের মার্জিতরূপকে কল্পনা করলে পিতার ওপর তাঁর ঘৃণার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

জেবুন্নিসা ছিল শালিমারবাগের বাতাসে দোদুল্যমান পুষ্পের মত কোমল-প্রাণা। তাঁর ভালবাসা ছিল পিতার ওপর সাংঘাতিক। জীবনে গর্ভধারিণী

জননীকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তার মেটেনি বলে তার সমস্ত স্নেহ পিতার ওপর অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু পিতার বাদশাহ হবার আকাঙ্ক্ষায় ইসলামের ধর্মমতকে ছুরি দিয়ে রক্তাক্ত করে নারকীয় ঘটনার শ্রেষ্ঠ নায়ক হতে— জেবুন্নিসা পিতাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আবার সেই পিতাকেই সে গ্রহণ করল।

কারণ বাঁচতে গেলে পিতার সাহচর্য না পেলে তার রমণীধর্ম অনস্বীকার্য। হারেমে শাহজাদী রোশেনারা। আবার নতুনভাবে সম্রাজ্ঞী হয়ে এসেছেন উদিপুরী। এই উদিপুরীর সাহচর্য নিয়ে রোশেনারার দম্ভের সিংহাসন চূর্ণ করতে হবে। সুতরাং পিতার অন্যায় কাজের সমালোচনা না করে নসীবে যা লেখা ছিল, হয়েছে বলে সান্ত্বনা নিয়ে পরবর্তী জীবনের কর্মধারা ঠিক করে নিতে হবে।

জেবুন্নিসার ফুলের মত সৌরভভরা, রূপের রোশনাই জ্বালা অন্তরে আস্তে আস্তে মানুষের ছদ্মবেশে শয়তানের ছায়াও প্রতিফলিত হতে লাগল।

জেবুন্নিসা তার জন্যে কাঁদল না। হা-হুতাশ করল না। বরং আগে দুঃখ করেছিল বলে আফশোষ করল। দারার ছিন্নমুণ্ড যেদিন প্রাসাদে এসেছিল। রক্তাক্ত মুণ্ডের সেই বীভৎসতা দেখে ছোটবেলাকার কতকগুলি স্মৃতি তাকে বার বার আঘাত করেছিল। দারা চাচা গল্প বলতেন। কত দেশবিদেশের সে গল্প। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথার সংযোজন করে তিনি কী সুন্দরভাবে হেসে হেসে বলতেন। শাহাজাদী জাহানারাও মাঝে মাঝে ভ্রাতার ভুল সংশোধন করে দিতেন। কী অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন এই দারা চাচা ও জাহানারা।

রক্তাক্ত মুণ্ডটি দেখে যখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে চোখে জল এসেছে সেই সময় কে যেন ফিসফিস করে কানে কানে বলল—'তুমি বাদশাহ কন্যা। রক্ত দেখে ভয় পেলে হবে না। মনের মমতার ওপর বর্ম রেখে অন্তত বেঁচে থাকার সাধনা কর। দুনিয়ায় অনেক ভালমন্দ জিনিসের আবির্ভাব ঘটছে। তার কোনটা তোমার সমর্থন পাবে, কোনটা পাবে না। যেটা সমর্থন পাবে না সেটাই তোমার মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।'

তবু জেবুন্নিসা নিজেকে একেবারে শান্ত করতে পারে নি। বিক্ষুব্ধ অন্তরে চলে এসেছিল তার সবচেয়ে সান্ত্বনার ক্ষেত্র সেই শালিমার বাগের বিশ্রাম মঞ্চে। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আসমানের বিশালতাকে মাপবার চেষ্টা করেছিল।

বুকের ভেতর থেকে তার দারুণ একটা কম্পন শরীরকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে আসতে চাইছিল। চোখের দুকোণে বার বার অশ্রুস্রোত এসে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

বার বার জেবুন্নিসার মনে জাগছিল—এরই প্রধান নায়ক তাঁর পিতা নিজে। পিতা শয়তানের আসনে বসে তৈমুর বংশের ইজ্জতকে আরও যশস্বী করছেন। 'মোগল সাম্রাজ্যের কোথায়ও যেন এই হত্যার ব্যাপারে কোন বিদ্রোহ, শোক, কান্নার সৃষ্টি না হয়।' এ কথা বাদশাহ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। 'সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্রের নৃশংস মৃত্যু সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। সেখানে কোন মমতার স্থান নেই।'

এ কথা শুনে রাজ্যের লোকেরা হয়ত ভয়ে ভয়ে নিজেদের বশীভূত করেছে। কিন্তু জেবুন্নিসা জানে—আজ সমস্ত হিন্দুস্তানের লোক কি বলছে? প্রাসাদে ও হারেমে কোন কান্না নেই এমন কি দারা চাচার কন্যা জানীর কান্নার শব্দও একটি পাথরের ব্যুহ ভেদ করে নি। শুধু দারা চাচার কনিষ্ঠ পুত্র সিপ্‌হর নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি। চোখের সামনে পিতার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হতে দেখে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

তার সেই চীৎকারে সমস্ত প্রাসাদের নিস্তব্ধতা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কয়েকমুহূর্ত মাত্র। সম্রাট ঔরঙ্গজেব সিপ্‌হরের সামনে দাঁড়িয়ে কোষ থেকে তরবারী উন্মোচন করে বাতাসে আন্দোলিত করে ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিলেন—আর চীৎকার করলে তোমার মুণ্ডও পিতার মত ভূমিস্পর্শ করবে।

সাহসী পিতার সাহসী পুত্র। সিপ্‌হর বয়সে তরুণ হলেও পিতার হত্যাকারীকে সহ্য করতে পাচ্ছিল না, সেও ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিল—মৃত্যুকে শাহজাদারা ভয় করে না এ কথা কী আপনাকে নতুন করে শেখাতে হবে! আল্লা আপনাকে এর জন্যে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। আমার বিনাপরাধী পিতাকে আপনি হত্যা করে যে অপরাধ করলেন, সারাজীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেও দুনিয়ার ক্ষমা পাবেন না।

ঔরঙ্গজেব এই তরুণের কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন। ক্ষুদ্রাকার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ভয়াল ছায়া আস্তে আস্তে পাকিয়ে পাকিয়ে তাঁকে আবার একটা ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়কে পরিণত করতে চাইছিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সম্রাট আলমগীর। ভুবনের জ্যোতি। তারপর শয়তানের কুটিল

বিশ্রী চিন্তা থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে, মোহমুক্ত হয়ে, সিপ্‌হরকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু মনে মনে বললেন—'মোগল রাজবংশের কোন শাহজাদাই সম্রাট আলমগীরের বিচারে ক্ষমা পাবে না, এমন কী নিজের পুত্ররাও নয়। তারই প্রমাণ নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। সুতরাং বর্তমানে সিপ্‌হরের এই স্পর্দ্ধা ক্ষমা করে ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক্।'

শালিমার বাগের সেই উদ্যানে বসে সেদিন জেবুন্নিসা উপলব্ধি করেছিল, সে হঠাৎ একটা দারুণ অসম্ভব শক্তি আয়ত্ব করছে। যেন আসমান থেকে খোদা মেহেরবাণী করে তাকে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকবার জন্যে সে শক্তি দান করলেন।

দুঃখে, ঘৃণায়, প্রতিশোধের স্পৃহায় যখন রক্ত ঘনীভূত, মন বিক্ষুব্ধ, ব্যথার ভার অসহ্য মনে হচ্ছে, সেই সময় জেবুন্নিসা উপলব্ধি করল এক ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা। তার স্থূলদেহের ভার যেন লাঘব হয়ে সূক্ষ্ম-দেহে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। দেহ যেন বায়ু, জল, অগ্নির সমতুল। রক্তমাংসের শরীর বিমুক্ত হয়ে অন্য এক অপার্থিবলোকের জীব বলে মনে হচ্ছে।

যেন মনের মধ্যে সুন্দর ছাড়া আর কোন বস্তু বা চিন্তার স্থান নেই। এই দুনিয়ার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর সৌন্দর্যই চোখের ওপর উপলব্ধির সুখ জাগাচ্ছে। উদ্যানের পুষ্প সৌরভ, মলয়ের মৃদুমন্দ বাতাস, যমুনার শান্ত প্রবাহমান কল-ধ্বনি। কলধ্বনির সুস্বর অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে চিত্তের আনন্দ স্থায়ী করে রাখছে। দিল্লীর নহবৎখানায় মাত্র একটি মানুষের বাক্যধ্বনি বহু মানুষের ক্রন্দনকে কবরিত করে প্রচারিত হচ্ছে।

জেবুন্নিসা যেন সেইমুহূর্তে কোন এক অমৃতলোকের দেশে চলে গেল। কবিতার ভাবময় অমৃতলোকে কোন সংঘাত নেই। শুধু একটি সুর, একটি চিন্তা। যমুনার স্রোত যেমন নিয়ে চলে তার অসংখ্য স্রোত একই কেন্দ্রে তেমনি তারও জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা একই স্রোতে একই কেন্দ্রে এসে মিলছে। জেবুন্নিসা মনে মনে দারুণ পুলকিত হল। আর পরক্ষণে সে অনুভব করল সে আর মোগল হারেমের কঠিন অবরোধের মাঝে বাস করছে না। যমুনার উজানে বয়ে চলেছে বহুদূরে, জীবন নদীর এই তীরে আর নয় ঐ দূরে—দূরে। যেখানে আসমান আর দরিয়ার পাণি মিলেছে একসূত্রে।

জেবুন্নিসা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে দেখল—সমস্ত জগত আলোকময়। সেখানে অন্ধকারের এতটুকু কালিমা নেই। এমন কি পিতাও কোন এক মুহূর্তে ক্ষমা পেয়েছেন।

যখন জেবুন্নিসা এমনি এক আলোকময় অপার্থিব জগতের সন্ধান পেল, ঠিক তারপরই সে একদিন গভীর রাত্রে অলিন্দে পায়চারী করতে করতে পিতার শয়ন ঘরে উঁকি দিয়েছিল। আর পিতাকে দেখেছিল, রাতের নিরালায় অধোবদনে মুখ ঢেকে কাঁদতে। আশ্চর্য হয়েছিল। স্তম্ভিত হয়েছিল। যে পিতাকে লোকে পাষাণ ছাড়া কিছু বলে না তাঁর মধ্যে রক্তমাংসের সন্ধান পেয়ে জেবুন্নিসা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। আর সেইজন্যে নিঃশব্দে দিয়েছিল সান্ত্বনা। নিজের কোমল হস্তের স্পর্শানুভূতি।

মৃত্যুর মহোৎসবের রেশ আস্তে আস্তে দিল্লীর প্রাসাদ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে খুব ধীরগতিতে আবার আনন্দ এসে রাজপ্রাসাদের গম্ভীর আবহাওয়া সহজ করে দিচ্ছিল। দারার পুত্র সিপ্‌হর ও মুরাদের পুত্র ইজাদ বক্সের শোকমোচনের ভার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দুই কন্যা জুবাইদ ও মিহর গ্রহণ করেছিল।

তারা এই দুটি তরুণ রাজকুমারের হৃদয়ে-মনে নিজেদের রমণীর রমণায় স্পর্শ আঁকল। জুবাইদ ও মিহরের তারুণ্য হৃদয়ের চঞ্চলতা এখানে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা বহুকাল পরে দেখল এই দুটি তরুণকে। দেখল যখন তখন তারা প্রত্যেকেই যৌবনের প্রান্তঃসীমায়। ছোটবেলায় অবশ্য দেখেছিল অন্য চোখে। কিন্তু বর্তমানের চোখে ছিল রঙের আভাস। আর যখন তারা জানত চাচার ছেলের সঙ্গে মহব্বত করলে কোন অন্যায় হয় না, তখন তাদের যৌবনপুষ্ট মন শাহজাদাদের ইন্তেজারে লেগে পড়ল।

জুবাইদের পছন্দ সিপ্‌হরকে। ঠিক তার পিতার মত সুন্দর মরদ। পিতার মত উন্নত নাসিকা, দীর্ঘায়ত চোখ, সমুদ্র সমান বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, বলিষ্ঠ সুঠাম গড়ন। ভবিষ্যতে ময়ূর সিংহাসনে বসলে যে লাখো ঐশ্বর্যের মধ্যে সিপ্‌হরকে মানাবে চমৎকার—এ কথা মনে মনে লাখোবার কবুল করেছিল জুবাইদ। জুবাইদ মনে মনে সিপ্‌হরকে ভবিষ্যতের একজন বড যোদ্ধা বলে মনে করত।

সে শুনেছিল সিপ্‌হর পিতার সঙ্গে এই অল্প বয়সে সামুগড়ক্ষেত্রে এক বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

মোগল রাজপুরুষের উপযুক্ত সাহসের পরিচয়ই দিয়েছিল। ভ্রাতা সুলেমান শিকোর মত সাহসী, পিতা দারা শিকোর মত বুদ্ধি ধরে তার সে যুদ্ধের ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করে জুবাইদ সিপ্‌হরকে ভালবেসে ফেলল। জুবাইদ এমনি একটা কিছু চাইছিল। জুবাইদের তারুণ্য সবুজ মনের চঞ্চলতা দমিত না হওয়ার জন্য হারেমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে সে নির্ঘুম চোখ নিয়ে ছটফট করত। এমনি অনেক গোপন অপরাধ জুবাইদ করেছিল যা মোগল শাহজাদীর পক্ষে অবৈধ। বাদশাহের কন্যা হয়ে জুবাইদের এই অপরাধ অক্ষমনীয়। বাদশাহের কন্যার শয্যাসঙ্গী যদি সামান্য এক সৈনিক পুরুষ হয়, তাহলে নিশ্চয় বাদশাহের অপমান!

কিন্তু এই সদ্যপ্রাপ্ত যৌবন নিয়ে শাহজাদীরা রাত্রের অন্ধকারে নির্ঘুম চোখে বিজাতীয় এক যন্ত্রণা নিয়ে সম্রাট আকবরের মৃত আত্মাকে উদ্দেশ্য করে খেদোক্তি করত—'তৈমুর বংশের শাহজাদীদের শাদী হবে না।' তাহলে তারা বাঁচবে কী নিয়ে? তার চেয়ে তৈমুর বংশে কন্যা জন্মগ্রহণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে—এই বিধান সম্রাট আকবরের দ্বারা ঘোষিত হলে রাজবংশের শাহজাদীরা অন্তত তীব্র এক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেত।

এই যন্ত্রণায় রাজবংশের প্রতিটি শাহজাদী তার আওরৎ জীবনের ব্যর্থতায় হাহাকার করত। ঔরঙ্গজেবের দুই কন্যা জেবুন্নিসা ও জিনৎউন্নিসা তাদের বয়েসের প্রান্তঃসীমা থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল। জিনৎ অবশ্য খোদার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ঐহিক চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়েছিল। কিন্তু জেব্ কিছুই পারে নি—না ঈশ্বরে মনপ্রাণ দিতে—না নিজের যৌবনের রোশনাইয়ে আগুন জ্বালাতে। অথচ তার ইজ্জতের ভীষণ ভয়।

ঔরঙ্গজেবের শেষের দুই কন্যা জুবাইদ ও মিহর সবচেয়ে তরুণ এবং সবার চেয়ে বয়স কম। তারা তাদের উদ্ভিন্ন যৌবনের তীব্র আগুনের প্রদাহে চার-দিক পুড়িয়ে চলেছিল। বিশেষ করে পিতা ঔরঙ্গজেব যখন সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে ব্যস্ত—সেই সময় তাদের কৌমার্য বিতরণ করে তারা আওরৎজীবনের কামনাকে সম্পূর্ণ করেছে।

অবশ্য ঔরঙ্গজেব যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত থাকলে কি হবে—তিনি সবই জানতেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য এই সব সমস্যাকে তুলে রেখে তখন বর্তমানের চিন্তায় ডুব দিয়েছিলেন। তাঁর অবশ্য মনে কল্পনা ছিল, তিনি যদি সিংহাসন কায়েমী

করে পান—তাহলে শাহজাদীদের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন। এ রকম কল্পনা দারাও করেছিলেন—তাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী জাহানারার সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের রূপবান সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশাল বুন্দেলার শাদী দেবেন। জাহানারা সেই আশায় সর্বদা আল্লার কাছে প্রার্থনা করতেন—'যেন দারা ভাইজান সিংহাসন পায়। যেন ছত্রশাল দারার সাহায্যে যশস্বী হয়ে ওঠেন।' কিন্তু দারা সিংহাসনও পেলেন না, বুন্দীরাজ ছত্রশাল সামুগড় যুদ্ধেই নিহত হলেন। জাহানারার শাদীর আশা চিরতরে বিলুপ্ত হল।

জেবুন্নিসা পিতা ঔরঙ্গজেব সিংহাসন পাবার পর একটু সাহসী হয়ে উঠেছিল। শাহজাদা রোশোনারা যখন তার নামে ভাইজানের কাছে অনেক অভিযোগ পেশ করল—ঔরঙ্গজেব কন্যাকে কাছে ডেকে হাসতে হাসতে বললেন—বহিন্ রোশোনারা তোমার অনেক অপরাধের সংবাদ আমার কাছে পেশ করেছে। কিন্তু বহিন্ জানে না—আমার কলিজার রক্তের সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠকন্যা জেবুন্নিসার রক্তের যোগ আছে—শুধু তার সাহস দেখে মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হই।

সেদিন থেকেই জেবুন্নিসা বুঝল—পিতা তাকে দারুণ পেয়ার করেন।

তা ছাড়া আরও একদিন ডেকে বললেন—হারেমের ভার আমি প্রকাশ্যে যাকে খুসী দিই। কিন্তু গোপনে সমস্ত ভার তোমারই ওপর থাকল। তুমি গোপনে সবকিছু দেখবে। প্রতিবাদ করবে না। আমার কাছে এসে পেশ করবে। কারণ বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়—রাজঅন্তঃপুর থেকে। বহিন্ রোশোনারা এই হারেমে বাস করেই সিংহাসন প্রাপ্তিতে আমাকে সাহায্য করেছিল।

জেবুন্নিসা সেই থেকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হল।

আর তারপর থেকেই মাঝে মাঝে পিতার কক্ষে পিতার নির্দেশে তার যাতায়াত শুরু হল। তবে রোশোনারার সম্বন্ধে কিছু বলত না। কারণ সে জানে—পিতা তার চেয়ে অনেক বেশী ধূর্ত। রোশোনারার সম্বন্ধে কিছু বললে পাছে পিতা কন্যার মনের অভিসন্ধি বুঝতে পারেন সেইজন্যে রোশোনারার অন্যায়গুলি গোপন করে অন্যান্য আভ্যন্তরিন গোলযোগ পেশ করত। যেমনঃ—আজ একটি বাঁদী আর এক খোজাকে দারুণভাবে মারধর করেছে। বাঁদীটি এমন মার মেরেছে যে খোজাটি আর উঠতে পাচ্ছে না।

ঔরঙ্গজেব হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—খোজাকে মেরেছে বাঁদী! মানে এক আওরৎ এক খোজাকে প্রহার করেছে!

জেবুন্নিসা বলল—তাইতো দেখলাম। আমিও অবশ্য অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ঔরঙ্গজেবের হাসি প্রশমিত হলে বললেন—সেই বাঁদীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, আমি তাকে পুরস্কৃত করব। আর খোজার বিচার করে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেব।

এমনি একদিন ঔরঙ্গজেব নিজের কক্ষে বসে সুলতান মহম্মদের সঙ্গে আলাপ করছেন, জেবুন্নিসা এসে কক্ষে প্রবেশ করল। সুলতান মহম্মদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বেশ জোরালো স্বরে আলাপ হচ্ছিল। জেবুন্নিসা কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে যেটুকু শুনেছিল তাতে সুলতান মহম্মদের আর্জি শুনে চমকিত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে কক্ষময় পায়চারি করতে করতে বলছেন—না না এ অসম্ভব! তুমি এই সেদিন সুজার কন্যা গুলরুক বানুকে শাদী করলে। আবার বলছ, মুরাদের কন্যা দোস্তারকে শাদী করবে? তুমি কী ঠিক করেছ হারেমে যতগুলি জোয়ানী আওরৎ আছে সবগুলিকে শাদী করে তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ের সুখ চরিতার্থ করবে? জানো, আমি ইসলামের প্রেরিত পুরুষ। মানুষের এই অতিরিক্ত প্রবৃত্তিগুলি ধ্বংসের জন্য খোদার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছি। তুমি সংযত হয়ে এসব অভ্যাস ত্যাগ কর—না হলে ভবিষ্যতে তোমার প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা পিতা বাদশাহ আলমগীরেরও থাকবে না।

সুলতান মহম্মদ তবু পিতার কথার প্রতিবাদ করে বলল—কিন্তু অন্যায়টা কী আমাকে বুঝিয়ে দেবেন সম্রাট? আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেকেই অসংখ্য শাদী করেছেন। সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর বেগম ছিল তিনশত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আরও বেশী ছিল। তিনি সমগ্র হিন্দুস্তান তথা বিদেশী মেয়েদেরও শাদী করে হারেমে নিয়ে এসেছিলেন। দাদু শাহজাহানের কথা আপনি জানেন। এবং ভবিষ্যতে যারা সিংহাসনে বসবে তারা যে পূর্বপুরুষকে অনুসরণ করবে না তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তাহলে আমি এমন কি অপরাধ করছি—যার জন্যে পিতার ক্রোধ আমার ওপর আরোপিত হবে! আমি তো আমার বাদশাহ পিতার অনুমতি ভিক্ষা করছি।

ঔরঙ্গজেব মহম্মদের দিকে পিছন করে মুখ উচু করে চোখ বুজিয়ে শুনছিলেন, মহম্মদের কথা সমাপ্ত হলে এদিকে দ্রুতগতিতে ফিরে ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন—তোমার জননী নিশ্চয় তোমার এই কার্যের সমর্থন করেন?

মহম্মদ মাথা নেড়ে বলল—আম্মা শুধু বলেছেন তোমার পিতার অনুমতি নিয়ে এই কার্য সমাধা করবে। তাই আমি এসেছি।

না হলে আসতে না?

থতমত খেয়ে মহম্মদ স্তব্ধ হয়ে পিতার দিকে তাকাল, তারপর বলল—প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। অন্তত সে স্বাধীনতা বাদশাহ পিতা নিশ্চয় সঙ্কোচন করবেন না।

আমার সংশোধিত নিয়মকানুন এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি। হলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। কিন্তু আমার পুত্রদের স্বাধীনতা না দেওয়ার অধিকার আমার আছে যেহেতু আমি পিতা। পিতা সর্বদাই পুত্রদের শাসনে রাখে—এ নিশ্চয় তোমার জানা আছে!

হ্যাঁ জানা আছে। যতদিন পুত্র নাবালক থাকে, বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। সাবালক হলে পিতা যদি পুত্রের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার না করেন তাহলে পুত্র পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে। কেন আপনি কি শাহাজাদা খসরু ও তাঁর পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবাদের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? আজ যদি শাহজাদা খসরু উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারত, তাহলে কী তাঁর পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসন পেতেন?

ঔরঙ্গজেব যখন দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন তখন মুখের ওপর তাঁর এতটুকু রেখা ফুটে উঠত না। ক্ষুদ্রাকার চোখ দুটি শুধু কাঁপত আর ঠোঁট দুটি দ্রুত বেগে আন্দোলিত হত—কিন্তু মুখমণ্ডল শান্ত। কোন রঙের আভাসও না। এখানেও সেরূপ হল। ঔরঙ্গজেব শান্ত ও সংযত অথচ কম্পিত ক্ষুদ্রাকার চোখের দৃষ্টিতে নিজের দক্ষিণ বাহুটি উত্তোলিত করে দেখলেন, তারপর হাতের অঙ্গুলিগুলি পর পর এক এক করে তুলে কেমন করে হাতে তরবারী ধরেন, ঠিক সেইভাবে তরবারী ধরার মত হাতটি বার কয়েক নাড়াচাড়া করলেন, তারপর হঠাৎ মহম্মদের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে বললেন—'কিন্তু শাহাজাদা খসরুকে তার মামা মহারাজা শয়তান মানসিংহ সাহায্য করেছিল—তোমাকে কে করবে? তারপর হঠাৎ দারুণ চীৎকার করে

বললেন—তুমি কী তোমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার জন্যে কোন শক্তিমানের সাহায্য পেয়েছ?

মহম্মদ হঠাৎ পিতার ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে পারল না, সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণে চমকে উঠল পিতার কথার অর্থ চিন্তা করে। সুলতান মহম্মদ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলল—না না জাঁহাপনা, আমার মনে আদৌ সে ধরনের কোন চিন্তা নেই। সুলতান মহম্মদ তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বাদশাহকে হাজারো সেলাম পেশ করল।

কিন্তু বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাতেও এতটুকু দমিত হলেন না, শুধু একটু কণ্ঠের স্বর নামালেন, নামিয়ে বললেন—তাহলে শাহজাদা খসরুর দৃষ্টান্ত পেশ করলে কেন? তুমি নিশ্চয় তার মত পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার চিন্তা কর না?

সুলতান মহম্মদ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল—ক্ষুব্ধ-স্বরে পিতার সামনে যা পেশ করেছে তা তার মনইচ্ছা না হলেও মাঝে মাঝে যে মনের মধ্যে স্বপ্ন জাগে না তা নয়। কিন্তু আজকে সে ধরনের কোন ইচ্ছাই তার মনে ছিল না। আজ শুধু দোস্তারকে শাদী করবার অনুমতির জন্যেই সে এসেছিল। দোস্তারের পেয়ারী মন, পেয়ারী কথার আবেদনে সে পাগল হয়েছে। আজ পিতা বাদশাহ, তার পুত্র হয়ে দোস্তারকে গ্রহণ করার কোন বাধা নেই। সে যখন নিজে বাদশাহজাদা তখন তার অধিকার আছে। তাছাড়া সেই তো ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু পিতার সামনে হঠাৎ লুকানো গোপন স্বপ্নটা পেশ হয়ে গেল।

মা নবাববাই বার বার নিষেধ করে দিয়েছিলেন—বেটা, খবরদার পিতার কাছে ঘুণাক্ষরে ক্রোধ প্রকাশ করবে না! নতুন বাদশাহের তখ্‌তে পিতা আসীন। তাঁর মেজাজ নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছ। তাছাড়া এরূপ একটা জনরব চারদিকে প্রচারিত হয়েছে যে রাজবংশের কোন শাহজাদাকে বর্তমানের বাদশাহ পৃথিবীতে রাখবেন না। এমন কি তাঁর পুত্ররাও কেউ ক্ষমা পাবে না। পুত্র বলতে উপযুক্ত এখন তুমি! তোমার ওপরই ক্রোধ তাঁর বেশী। মুজ্জাম, আজম, আকবর এখন ছোট। তারাও যে শেষপর্যন্ত ক্ষমা পাবে—মনে হয় না।

সুলতান মহম্মদ পিতার ক্রোধের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা চিন্তা করতে লাগল আর মনে মনে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তাছাড়া সে

জানে, পিতা কখনও কাউকে শাস্তি দিলে সামনে দাঁড়িয়ে দেন না। ছোট-বেলাকার একটা কথা মনে পড়ল সুলতান মহম্মদের। দৌলতাবাদের দুর্গে তখন তারা সবাই। পিতা আদেশ দিয়েছিলেন প্রত্যহ প্রত্যুষে তাকে তরবারী চালনা শিখতে। একদিন সে প্রত্যহের এই অভ্যাসে গাফলতি করেছিল—পিতা জানতে পেরে তাকে সামনে ডেকে শাসন করলেন না; একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার কাছে একদিন পাঠিয়ে দিয়ে তাকে তরবারী শিক্ষার মহড়া দিতে বললেন। সেই যোদ্ধাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন শাহজাদা সুলতান মহম্মদকে শায়েস্তা করতে—কে জানতো। যোদ্ধা সেদিন অবলীলাক্রমে তরবারী চালনা করতে করতে মহম্মদের দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে ছেদন করে দিল। পিতা হাসতে হাসতে বললেন—আমি অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলাম তুমি অভ্যাস ঠিকমত আয়ত্ত কর না—গাফিলতি কর, সেইজন্যে এই শাস্তি!

রুধিরাক্ত ছেদন অঙ্গুলি চেপে ধরে সুলতান মহম্মদ সেদিন আম্মাজানের কাছে ছুটে চলে গিয়েছিল। পিতার নৃশংসতার পরিচয় সেদিন পেয়ে মহম্মদ অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। আজ সে কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়তে সে আফশোষ করতে লাগল—পিতা নিশ্চয় তার এই অপরাধ ক্ষমা করবেননা। তাছাড়া আরো একটি অপরাধের জন্য পিতার তিরস্কার জমা ছিল—যুবরাজ সুজা যখন খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানে পলায়ন করলেন—তখন পিতা তাকে যুবরাজের পিছনে ধাওয়া করে তাঁদের বন্দী করতে বলেছিলেন। কিন্তু আরাকানে পৌঁছবার আগেই সুজা দস্যু কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন এবং তাঁর বেগম পিয়ারীবানু আরাকানের বর্বর রাজার নিকট থেকে অসম্মানজনক প্রস্তাব পেয়ে রাজার বন্দী কক্ষে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করেছিলেন। পিতা ঔরঙ্গজেব এই পিয়ারীবানুকে জীবিতাবস্থায় অধিকার করতে চেয়েছিলেন, এবং নিজের অঙ্কশায়িনী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পারলেন না শুধু তার পুত্রের দোষের জন্য। শুধু সেদিন সুলতান মহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'অপদার্থ পুত্র তুমি, এ কার্যে আমার বীরশ্রেষ্ঠ সেনানী মীরজুমলাকে পাঠালে নিশ্চয় এরূপ দুঃসংবাদ শুনতে হত না।'

ঔরঙ্গজেব কক্ষময় পায়চারী করতে করতে আজ সে কথা বললেন—তোমার সেদিনের সেই অপরাধও তোলা আছে। শুধু তোমারই জন্যে আমার

প্রিয়তম দ্বিতীয় ভ্রাতা শাহ সুজা সমাধি লাভ করল না। তাঁর পত্নী পিয়ারী পিয়ারীবানু এক বর্বর রাজার হাতে ইজ্জত দেবার ভয়ে অতি নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যা করল।

ঠিক এই সময় জেবুন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে ঔরঙ্গজেব একটু শান্ত হলেন,হয়ে মহম্মদকে বললেন—এখন যাও, পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। সুলতান মহম্মদ বেরিয়ে গেলে ঔরঙ্গজেব ঘণ্টাধ্বনি করে রক্ষীকে কক্ষে ডাকলেন। রক্ষী এলে তাকে নির্দেশ দিলেন—এখুনিই শাহজাদা সুলতান মহম্মদকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ কর। উজিরকে গিয়ে এই ঘোষণা পেশ করে বাদশাহী মোহরাঙ্কিত আদেশ প্রচার করতে বলবে। রক্ষী চলে গেলে পরক্ষণে কন্যার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'জেব্ তোমার আর্জি পেশ কর।' যেন কিছু হয় নি। কোন আলোড়ন না। কোন অনুশোচনা না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মানুষ।

জেবুন্নিসা শুধু পিতার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। আর ভাবতে লাগল—কি অসম্ভব শক্তিধরপুরুষ এই পিতা তার। নিজের সন্তানকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। আবার পরক্ষণে আর এক কন্যার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—তোমার সংবাদ কি জেব্?

কিন্তু জেবুন্নিসা যে বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে প্রকাশ করল না। শুধু কক্ষে আসবার পর যা শুনেছিল সেই সুর ধরে জিজ্ঞেস করল—জাঁহাপনা, গোস্তাফি যদি মাপ করেন তাহলে জিজ্ঞাসা করি—সুলতান ভাইজানকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন কেন?

ঔরঙ্গজেব তখন বুকের ওপর হাত দুটি আড়াআড়িভাবে স্থাপন করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বাইরে আসমানের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে হয় তিনি আল্লার নির্দেশ শোনবার জন্যে কান সজাগ করে নিঃশব্দ হয়েছেন। মুহূর্ত-কয়েক এই অবস্থায় থাকবার পর বললেন—তুমি জিজ্ঞেস করছ ভাইজানকে কয়েদ করলাম কেন? তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সে অনেক কথা। আজ আমি আমার প্রথম সন্তানকে কয়েদ করলাম কেন সে জবাব আমিও দিতে পারব না। তবে তাকে কয়েদ করার একটি হেতু মাথায় এসেছে—মহম্মদ বিদ্রোহী হতে চায়। তাকে যদি বাইরে মুক্ত আলোয় বিচরণ করতে দিই তাহলে তার অনেক সুহৃদ আছে তারা প্ররোচনা দিয়ে মহম্মদের মাথা খারাপ করতে পারে। এমন কী মহম্মদের জননী নবাববাইও আশা করেন

তাঁর প্রথম সন্তান মোগল সিংহাসনে আরোহণ করুক। নবাববাইয়ের ইচ্ছা বড় অদ্ভুত। শুধু সেই কারণেই তিনি তাঁর সম্রাজ্ঞীর পথ থেকে বঞ্চিতা হয়ে অবহেলিতা হয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেব আর একবার কার্পেট বিছানো মেঝের ওপর পায়চারী করে দাঁতে দাঁত চেপে জেবুন্নিসার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন—হিন্দুরমণী কাফেরের রক্ত নবাব বাইয়ের শোণিতে প্রবাহিত। শয়তানী মতলব ওদের শিরায় শিরায়। আমি যদি পারতুম তাহলে রমণীরক্তে হাত কলুষিত করে নবাববাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু তা পারব না। নবাব-বাইয়ের গর্ভে আমার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। মহম্মদ বিদ্রোহী হলেও মুজ্জাম কোন দোষ করে নি। মুজ্জামের মা হবার জন্যেই শুধু আমি নবাব-বাইকে ক্ষমা করেছি। কারণ মুজ্জামকে আমি স্নেহ করি।

মহম্মদের দোষ অনেক। মহম্মদের অপরাধের সীমা নেই। তার জন্যেই সুজা এক অপরিচিত লোকের হাতে মৃত্যুবরণ করল। সম্রাট শাহজাহানের যুবরাজ পুত্র হয়ে অত্যন্ত অবহেলিতভাবে তার মৃত্যুতে আমার মনে লেগেছে। এমন কি সে মাটিও পেল না। মুসলমানের সন্তান হয়ে তার সমাধিও হল না। তার বেগম পিয়ারীবানুর আত্মহত্যা নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়েছে। উপায় ছিল না বলে সেই রাজবংশের আওরৎ নিজের ইজ্জতকে বাঁচিয়েছে নিজের প্রাণ দিয়ে। আর এ সবের জন্য দায়ী মহম্মদ। তাকে পাঠিয়েছিলাম সুজার পিছন পিছন। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই সব শেষ। আজ এসেছে আমাকে শিক্ষা দিতে—। আমার পূর্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র শাহজাদা খসরুর দৃষ্টান্ত পেশ করতে—। তার অর্থ সেও ভবিষ্যতে এই শাহজাদা খসরুর পথাবলম্বন করবে। পিতার উপযুক্ত পুত্রই সে।

তারপর আবার পায়চারী করে বললেন—না-না এ অসম্ভব। মুরাদের কন্যা দোস্তারকে শাদী করে, করুক সে। কিন্তু পিতার প্রতি তার এই অহেতুক আক্রোশ মনের মধ্যে ধূমায়িত হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।·······তারপর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন—ইসলামের প্রেরিত প্রথম পুরুষ মহম্মদের নামানুসারে আমার এই প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ আর কথা বললেন না সম্রাট আলমগীর পাদিশাহ। শুধু পিছনে দুটি হাত দিয়ে পিতা শাহজাহানের মত কক্ষময় বারকয়েক পায়চারী করলেন। জেবুন্নিসা মুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল পিতার দিকে।

লোকে বলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মনটা পাথর। কিন্তু তাদের একবার দেখাতে ইচ্ছা করে—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মন কত নরম—কত দুর্বল! পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখের অশ্রু রোধ করছেন। হয়ত এই পুত্র একদিন বিদ্রোহী হবার শাস্তি প্রাণদণ্ড পাবে। এই পিতা নিজের হাতেই দেবেন সেই বিচারের রায়। বিচারের আসনে বসে কঠিন অপরাধের শাস্তি দিয়ে নিজের কক্ষে এসে অধোবদনে মুখ ঢেকে কান্না থামাবেন। কে জানে এই মানুষটিকে? জানে মাত্র একমাত্র জেবুন্নিসা নিজে। এমন অন্তর দিয়ে সম্রাটকে কোন বেগমও চিনতে চান নি। জেবুন্নিসার তাই সবচেয়ে মনে পড়ে—দারা-হত্যার পরের দিনগুলির ইতিহাস।

রাজ্যাধিকার করতে গেলে উত্তরাধিকারীকে পথ থেকে না সরালে নিজের অধিকার স্বীকৃত হয় না। ঔরঙ্গজেব দোষ করেছেন সত্যি কথা! তাঁর অপরাধের ক্ষমা নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম শয়তানের প্রথম সারিতেই স্থান পাবে। পৃথিবীর মানুষ তাকে ঘৃণা করবে। দারা, মুরাদ, সুজা হত্যার কালিমার সাথে সাথে তার নিষ্ঠুর চরিত্রের নৃশংসরূপ মানুষের মনে ভীতিভাব জাগাবে। পাবে না অনুগ্রহ কারুর কাছ থেকে সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীর। কিন্তু দুনিয়ার একটি মানুষও যদি তাঁর জীবনের সবটুকু বিচার করে তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে—সম্রাট ঔরঙ্গজেব যে অপরাধ করেছেন, সে অপরাধে অপরাধী প্রত্যেকেই হতেন যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মত কেউ সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হতেন।

সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাও পিতাকে প্রাসাদের মধ্যে অবরোধ করে চেষ্টা করেছিলেন সিংহাসন অধিকার করতে। তিনি যদি সমস্ত ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করতেন, তাহলে কী ভাইদের জীবিত রেখে তিনি সিংহাসনে বসে রাজ্যকার্য সমাধা করতে পারতেন? অবশ্য সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মত অতটা নৃশংস হতেন না। মানুষের ধর্মে ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা একটু বেশী। তিনি যে ভাবে ইসলামের দোহাই দিয়ে মুরাদকে বশীভূত করেছিলেন তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বধ করলেন; তাতে তাঁর মানুষের ধর্মের অবমাননা হল। কিন্তু দুনিয়ার সাম্রাজ্যের যিনি সম্রাট তাঁর পূর্বপুরুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ঠিক একই দৃষ্টান্তই লক্ষ্য করা যায়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্বভাবের মধ্যে ছল, চাতুরী, ধূর্ততা—মানুষের কুটিল

স্বভাবের সবগুলি প্রবৃত্তি তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী—কিন্তু তাঁর ধর্মের নানা মতভেদ। ঔরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মকেই পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি নিজে মনে করতেন, তিনি ইসলাম ধর্মকেই তুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন। ধর্মের প্রবর্তককে বহু নির্যাতন সহ্য করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

কিন্তু ধর্মের যিনি প্রবর্তক তাঁর সিংহাসনে বসবার লোভ কিছুতে বরদাস্ত করা যায় না। ঔরঙ্গজেব মনে মনে সর্বদা ঐ ঐশ্বর্যশালী ময়ূরসিংহাসনের জন্য লোভী হয়ে উঠেছেন, দাক্ষিণাত্যে তাঁর বাহিনী গঠন করাতেই প্রমাণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি কালো আলখাল্লায় সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করে মক্কার পথে তীর্থযাত্রা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। সঙ্গে তাঁর সর্বদা কোরাণ থাকত, তিনি সর্বদা কোরাণ উদ্ধৃত করে তাঁর বচনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করতেন।

কন্যা জেবুন্নিসা পিতাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করত শুধু এই কারণে। এবং তার এই ভালবাসার মোহ একদিন কেটে গেল যেদিন সে দেখল পিতা এই আলখাল্লা ছেড়ে রাজবেশ পরলেন। তখন তার মনে হল—পিতা এতদিন তবে ছদ্মবেশ ধারণ করে সবাইকে প্রলোভিত করেছিলেন। আর এই আলখাল্লার ভেতরে ছিল তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। তিনি ছুরিকা শানিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাজ্যজয়ের।

ঘৃণায় জেবুন্নিসার মন রি রি করেছিল। পিতার ওপর তার সমস্ত শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু আবার শ্রদ্ধা জমল, যখন সে দেখল পিতার কলিজায় অনুশোচনার জ্বালা। চোখে জলের প্লাবন। সেদিনও আবার সে বিস্মিত হয়েছিল। এবারে কিন্তু দারুণ বিস্মিত!

জেবুন্নিসা জানে না এও তার পিতার চাতুরী কিনা। তবে গভীর নিশীথে নিজের শয়নকক্ষে অধোবদনে মুখ ঢেকে অশ্রু ফেলা—অন্ততঃ কাউকে দেখাবার জন্যে তিনি ফেলেননি। জেবুন্নিসা আকস্মিক গিয়েছিল বলেই দেখতে পেয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্তানের লোক যখন শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার আলোচনা করছে। তাজমহলের স্মৃতিতে সমুজ্জল মমতাজের গর্ভের তুর্ণাম করছে। সম্রাট শাহজাহানের তুর্ভাগ্যের বিচার করছে। আগ্রার প্রাসাদে

বন্দী শাহজাহান বার বার মৃতপুত্রদের জন্য জীবিতপুত্রের ওপর অভিশাপ দিচ্ছেন, শাহজাদী জাহানারা ভায়ের এই নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করতে না পেরে আগ্রার প্রাসাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে শুধু আক্ষেপ করছেন—'আমি কিছু করতে পারলুম না। আমার দ্বারা সাম্রাজ্যের কোন উপকার হল না! শ্মশান হয়ে গেল সব।'

ঠিক সেইসময় ঔরঙ্গজেব সিংহাসন পেয়ে, ঐশ্বর্য পেয়েও মনের বৃশ্চিক দংশনে তাঁর চিত্তকে কিছুতে শান্ত করতে পারছেন না। শোকে মুহ্যমান হয়ে রাত্রির আঁধারে নিজের কক্ষে নিজেকে লুকিয়ে অনুশোচনায় ছটফট করছেন।

সেই মুহূর্তেই জেবুন্নিসা বুঝতে পেরেছিল—এখন পিতা মানুষের শরীরেই আছেন।

আজকে আবার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন তারই সামনে। পুত্রের অপরাধগুলি পুনরাবৃত্তি করে নিজেকেই জিজ্ঞেস করছেন—আমি কী অন্যায় করলাম? কী মায়া-মমতা পিতার হৃদয়ে এখনও স্তরে স্তরে জমা আছে সেই কথা চিন্তা করেই জেবুন্নিসা বার বার বিস্মিত হতে লাগল। পিতা বললেন, তাকে পুত্রের সমস্ত অপরাধের কাহিনী। অথচ কোনদিন এমন করে ব্যাখ্যা করে কিছু বলেন নি। বরং জিজ্ঞেস করলে বলতেন—'অহেতুক কৌতূহল যে প্রকাশ করে আমার বিচারে তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়।' একথা জেবুন্নিসাও অনেকবার শুনেছে। কিন্তু আজ কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই সব বললেন। তার অর্থ তিনি বললেন না, তাঁর মন তাঁকে বলতে বাধ্য করল।

তাছাড়া জেবুন্নিসা বার বার পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—সে মুখটি কেমন যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। কেমন যেন শোকের ছায়ায় মুখটি শুষ্ক। পিতার মুখাকৃতি সুন্দর নয় কিন্তু বলিষ্ঠতা আছে। সে বলিষ্ঠতাও কেমন যেন নিশ্চিহ্ন।

পিতা কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে অলিন্দের বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শুভ্রবেশ সম্রাটের পরিধানে। তিনি দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসে সমস্ত পোষাক শুভ্রতায় আচ্ছাদিত করেছিলেন। জরির কাজ করা, মণিমুক্তা হীরের জৌলুষে ভরা পোষাকের জাঁকজমকতা অসামান্য। কণ্ঠে একটি বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠহার। বক্ষের সমস্ত অংশ জোড়া করে দোদুল্যমান। মস্তকে এখন আর মুকুট শোভা পাচ্ছে না। শুধু একটি অলঙ্কারভূষিত পাগড়ী,

কোমরবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারী। বামদিকে একটি ইস্পাহানী ছোরা কোমরবন্ধের ওপরে রাখা আছে। সম্রাটের পোষাকে বহুমূল্য মিষ্টিগন্ধ ভরা আতরের খসবু। সেই খসবু কক্ষের বদ্ধবাতাসে ছড়িয়ে চারদিকে লুটোপুটি খাচ্ছে।

হঠাৎ সম্রাট আলমগীর জেবুন্নিসার দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসলেন, হেসে জিজ্ঞেস করলেন—বেটি, তোমার আর্জি কিন্তু এখনও পেশ করনি।

জেবুন্নিসাও পিতার স্নেহসিক্তস্বরের কথা শুনে তার মনের সমস্ত মেঘ অন্তর্হিত হল। সে মৃদুহেসে বলল—জাঁহাপনা পিতা, আমার আর্জি একটু অন্যধরনের—তাই পেশ করতে ডর লাগে। আপনি যদি অভয় দেন, তাহলে পেশ করতে পারি!

সম্রাট আলমগীর কন্যার কথায় আবার হাসলেন, হেসে বললেন—ডর লাগে? কী এমন আর্জি যার জন্যে সম্রাট আলমগীরের প্রিয়কন্যা জেবের ভয়? তুমি কি এইমাত্র আমার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে কারাগারে প্রেরণের জন্য ভীতা হয়েছ? এসব মামুলি রাজকার্যের নিয়ম। এসব দেখে ভীতা হওয়া কিন্তু আলমগীরের কন্যার সাজে না। তোমার আর্জি তুমি অকপটে পেশ কর। যদি সাম্রাজ্যের কোন নিয়মভঙ্গ না হয় তাহলে তোমার সেই আর্জিতে আমার চিত্তের প্রশান্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

জেবুন্নিসা নিম্নস্বরে বলল—কিন্তু জানি না, আমার আর্জিতে সাম্রাজ্যের নিয়মে কোন আঘাত সৃষ্টি হবে কিনা! পিতা, সম্রাট আকবর তৈমুরবংশের শাহজাদীদের শাদী হবে না বলে বিধান সৃষ্টি করে গেছেন। এবং সেই নিয়ম আজ পর্যন্ত পালিত হয়ে আসছে। আপনি এক সময় আমাকে বলেছিলেন, যদি কখনও আপনি রাজত্ব পান তাহলে এই নিয়ম লঙ্ঘন করবেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীর মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু তার আজকে কী এখনই কোন প্রয়োজন হয়েছে, যার জন্যে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছ? আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছি—আমার পাঁচ কন্যার মধ্যে চার কন্যার শাদী দেব। বদর আর বেশী দিন বাঁচবে না। ওর জন্ম থেকেই ও শয্যাশায়ী। ওকে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে না দিয়ে বিষ প্রয়োগে তার সমস্ত যন্ত্রণা শেষ করে দেব। তারপর জেবুন্নিসার দিকে তাকিয়ে বললেন—বল, কোন দ্বিধা না, কোন সঙ্কোচ!

জেবুন্নিসা এবার সাহস পেয়ে বলল—জুবাইদ ও মিহরের শাদীর জন্যে

বলতে এসেছি পিতা। তারা মনে মনে মৃত দারা চাচার কনিষ্ঠপুত্র সিপহরকে ও মৃত মুরাদ চাচার পুত্র ইজাদ বক্সকে পেয়ার করে।

হঠাৎ ঔরঙ্গজেব কন্যার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন—পেয়ার! কিন্তু যাদের সঙ্গে আমার দুই কন্যা পেয়ার করছে, তারা যে দুনিয়াতে বেশীদিন থাকবে না একথা কী আমার কন্যারা জানে?

জেবুন্নিসা পিতার কথায় চমকে উঠল, উঠে কাতর হয়ে বলল—একী বলছেন জাঁহাপনা? ঐ দুটি তরুণ বালক রাজ্যের বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে? না-না এ আপনি করবেন না পিতা!

হঠাৎ ঔরঙ্গজেব গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার আর কী আর্জি আছে জেব? আমি এ আর্জি সমর্থন করতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ জেবুন্নিসার কাছে এসে ক্ষুদ্রাকার চোখ দুটি আরও ছোট করে জিজ্ঞেস করলেন—তুমিও কি মনে মনে কাকেও পেয়ার করেছ? তারপর সরে এসে বললেন—বল, নির্ভয়ে বল। যদি সে রাজ্যের বিচারে অপরাধী না হয় তাহলে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমি সম্রাট আকবরের নিষ্ঠুরবিধান নাকচ করে দিয়ে আমার কন্যাদের শাদীতে রোশনাই জ্বালাবো। শাহজাদী-দের জীবন থেকে অভিশাপ তুলে নেব। বল, জেব। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি। তুমি যে আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, তার জন্যে ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

জেবুন্নিসা মাথা নীচু করে বলল—মাপ করুন জাঁহাপনা! আমার সে রকম কোন ইচ্ছা আজ পর্যন্ত নেই।

কিন্তু রোশোনারা তোমার স্বভাবের অনেক বর্ণনা আমাকে দিয়ে গেছে!

শাহজাদী রোশোনারা? জেবুন্নিসা হঠাৎ পিতার কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব এসে পাশে দাঁড়িয়ে পিঠ চাপড়াতে জেবুন্নিসা সজল চোখে মাথা নীচু করল। ঔরঙ্গজেব শান্তভঙ্গিতে বললেন—আমি বিশ্বাস করিনি। তুমি নিশ্চয় জান, আমার বুদ্ধি বিবেচনা সর্বদা প্রখর থাকে। বহিন্ রোশোনারা তোমার নামে যথেষ্ট আমাকে বলে এই প্রমাণ করেছে যে সে নিজেই একজন দোষী। কিন্তু তাকে বলবার আমার আজকে কিছু নেই। সে আমার রাজ্যপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এবং আমার প্রতিজ্ঞা ছিল তাকে দিল্লীর হারেমের কর্ত্রীর পদ দেব। বেগমসাহিব উপাধি দেব। কিন্তু সম্রাজ্ঞী উদিপুরী নিজেই সে কর্তৃত্ব চায়। সেইজন্যে বহিন্ আজ ক্ষিপ্ত হয়ে

পাগলে পরিণত হচ্ছে। তার যোগ্যতা পিতা শাহজাহানের কাছেও স্বীকৃতি লাভ করে নি। আমাকে এত সাহায্য করেও যোগ্যপদ সে পেল না। তাছাড়া তাকে আজ আমি যথেষ্ট ভয় করি। যে রমণী পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে সিংহাসনের সম্মান অন্যজনকে বিতরণ করে, তাকে দিল্লীর হারেমে রেখে আমি কোন সময় নিশ্চিন্ত নয়। তার দ্বারা যে কোন সময় যে কোন সর্বনাশ আমি প্রত্যাশা করি।

তারপর সম্রাট কন্যার পিঠে নিজের হস্ত স্থাপন করে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—তোমার আর্জি আমি খুব শীঘ্র সম্পন্ন করবার চেষ্টা করব। জুবাইদ ও মিহর সিপ্‌হর ও ইজাদকে যে শাদী করতে চায় তার জন্যে আমি যথেষ্ট আনন্দিত। কারণ আমি চাই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সিপ্‌হর ও ইজাদের পিতাদের মৃত্যু আমার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, এবং তার জন্যে পুত্রদের মনে আমার প্রতি আক্রোশ থাকতে পারে। আমার দুই কন্যাকে তারা যদি শাদী করতে রাজী থাকে, তাহলে বুঝব, তারা আমার ওপর আক্রোশ রাখে নি।

জেবুন্নিসা এরপর জাঁহাপনাকে সেলাম করে বেরিয়ে গেল। পিতার অদ্ভুত প্রশ্ন ও অদ্ভুত বিচারে বার বার তার মন কেমন যেন দোটানায় পড়ে গেল। পিতাকে এক এক সময় দারুণ শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে, আবার এক এক সময় দারুণ ঘৃণা লাগে। আওরতের জীবন নিয়ে পিতাও কম ছিনিমিনি খেলেন নি। ভ্রাতাদের প্রত্যেকটি বেগমের ওপর তাঁর লোভ ছিল। সুজার প্রেয়সী বেগম পিয়ারীকে কাছে পেলেন না বলে নিজের পুত্রের ওপর তিনি ক্ষুব্ধ। দারার তিন মহিষীকে পান নি, শুধু পেয়েছেন উদিপুরীকে। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। মুরাদের দুটি বেগমকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কিন্তু তারা প্রস্তাব শোনবার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। পিতা সব বোঝেন, কিন্তু আওরতের মনের সমজদার নন।

নিজের কন্যা যাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন এইমাত্র তার সঙ্গে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করলেন যাতে কন্যার মন সম্পূর্ণ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। তিনি জেনে নিতে চেয়েছিলেন—কন্যার বর্তমান মনের আকাঙ্ক্ষা কী? সে কি আওরৎ-জীবনের সুখ আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছে না,—গোপনে তার অভিসার রচনা করে চলেছে! কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিদ পিতা রমণী মনের ওপরও তাঁর রাজনৈতিক কৌশল চালাতে চান।

ধিক্কারিত মনে জেবুন্নিসা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাজঅন্তঃপুরের দিকে। একটা কথা বার বার আজ তার মনে আসে, একদিন সে ছোটবেলায় যখন তার মনে প্রথম যৌবন এসেছে, যখন তার দেহে প্রথম আবির্ভূত হয়েছে রমণীর ঐশ্বর্য, সেই সময় সে অন্যায় করে ফেলেছিল। হ্যাঁ, অন্যায়ই সে করেছিল।

অবশ্য তার জন্যে দায়ী তার শিক্ষক মুল্লা আশ্রফ ও পালিতা আম্মাজান মিয়াবাই। তাঁরা না সমর্থন করলে সে কখনও সেই অপরিণত বয়সে এত সাহস করত না। দৌলতাবাদের সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল আসমানের নীচে যখন সে উন্মুক্ত দরবারে কোরাণ মুখস্ত বলার জন্যে পিতার দ্বারা 'হাফেজ' উপাধি পেয়ে প্রচুর পুরস্কার পায়—ঠিক তার কাল ধরে মুল্লা আশ্রফ তখন এসেছেন, এবং ঔরঙ্গজেবকে তাঁর শিক্ষার রোশনাই দিয়ে বশীভূত করেছেন। মুল্লা আশ্রফ ভেবেছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাঁর কথার কোন অবমাননা করবেন না। তাই তিনি তাঁর কন্যার প্রতি নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মুল্লা আশ্রফই একদিন গোপনে এসে জেবুন্নিসাকে বললেন—আমার এক ছাত্র তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। তুমি যদি অনুমতি কর তাহলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করার ব্যবস্থা করি। জেবুন্নিসা তখন এর মধ্যে কোন দোষের কারণ পায় নি। তাছাড়া শিক্ষক, গুরুজন, পিতৃতুল্য তিনি যখন নিজে বলছেন তখন চিন্তার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু জেবুন্নিসা তবু একটু ইতস্তত করেছিল। তারা রাজবংশের কন্যা। তাদের হারেমের কোন রমণীর মুখ-দর্শন—বাইরের লোকের করা নিষিদ্ধ। তবু ঔরঙ্গজেব কন্যাকে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠ নিতে কোন বাধা দান করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন কন্যা তাঁর শিক্ষিতা হোক্। তিনি যখন বাইরের পুরুষের সঙ্গে মিশতে দিতে কোন বাধা দেন নি, তখন শিক্ষকের ছাত্রের সঙ্গে দেখা করলে কোন অপরাধ কিছু হবে না বলেই জেবুন্নিসার ধারণা হয়েছিল। তাই মুল্লা আশ্রফের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল।

কিন্তু মুল্লা আশ্রফ তাঁর ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় করতে ছাত্রকে শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের দুর্গে নিয়ে এলেন না, একদিন সায়াহ্নে চুপি চুপি জেবুন্নিসার হস্ত আকর্ষণ করে বললেন—বেটি ডরও মৎ। আমার সঙ্গে এস। এই দুর্গের বাইরে নগরের অভ্যন্তরে একটি দীনহীন মসজিদে। সেখানে আছে মুবারক। মুবারক তোমাকে দেখবার জন্যে বড় উতলা হয়েছে। জানো, তার সঙ্গে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তোমার সেই উন্মুক্ত দরবারে কোরাণ পাঠের দিন।

সে সেই দরবারে উপস্থিত ছিল। তোমার অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠের মাদকতা শুনে তার চিত্ত উৎফুল্ল হয়েছিল। তুমি ধরতে পার, একমাত্র তার কথাতেই আমি তোমার পিতার সমীপে আবেদন পেশ করে তোমার শিক্ষক নিযুক্ত হই।

সেদিন জেবুন্নিসা কৌতূহল দমন করেছিল। বিশেষ চিন্তা করে নি এই-জন্যে যে, সাক্ষাতে সেই মুবারকের বিচার হবে। অপরের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করে উৎফুল্ল হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

মুল্লা আশ্রফ তারপর যথেষ্ট গোপনতা অবলম্বন করে জেবুন্নিসাকে কালো বোরখায় আচ্ছাদিতা করে সায়াহ্নের মিঠে অন্ধকারের আলো-ছায়ার মধ্যে শিবিকায় তুলে দুর্গের বাহির হয়ে গিয়েছিলেন।

শিবিকার ভেতরে মুল্লা আশ্রফ ও জেবুন্নিসা। বোরখার আবরণ তুলে বড় বড় দুটি আয়ত চোখ শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত করে জেবুন্নিসা জিজ্ঞেস করেছিল—মুন্সিজী, বাপজানকে আমাদের যাত্রার কথা বলে অনুমতি নিয়েছেন?

মুল্লা আশ্রফ হাসলেন শুধু তারপর বললেন—বেটি, তোমার পিতার অনুমতি ভিক্ষা করতে গেলে কী আমাদের এই গোপন-অভিযান সম্ভব হত? আমি তোমার পিতার অজ্ঞাতেই এই কার্য সম্পন্ন করতে অগ্রসর হয়েছি।

জেবুন্নিসা ভীতা হয়ে বড় বড় সুন্দর চোখ আরও দীর্ঘ করে জিজ্ঞেস করে-ছিল—কিন্তু যখন পিতা জানতে পারবেন?

মুল্লা আশ্রফ চিন্তা না করেই বলেছিলেন—অপরাধ আমার, শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আমি আছিই! তোমার পিতা তোমাকে পেয়ার করেন, তোমাকে কিছু বলবেন না।

কিন্তু এ অপরাধ না করলেই কি হত না মুন্সিজী? নাই বা মুবারকের সঙ্গে পরিচয় হত?

মুল্লা আশ্রফ সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জ্ঞানের পরিধি তাঁর অসীম। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব এই জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। মুল্লা আশ্রফ বলেছিলেন—আমি মুবারকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বেটি! সে আমার প্রিয় ছাত্র। কবিতার সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। তুমি যদি তার কবিতা শোন—তাহলে অভিভূত হয়ে যাবে। তাছাড়া সে তোমার প্রতি বড় আকৃষ্ট। জানি না এর শেষ পরিণতি কি? কিন্তু আমি ভবিতব্য

বিশ্বাস করি। নসীব বিশ্বাস করি। দিলের তাড়না বিশ্বাস করি। মুবারকের আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে গিয়ে বেজেছে, তাই আমি এই অন্যায় কাজ করতেও এগিয়ে এসেছি।

অপরিণতা মনে জেবুন্নিসা সব কথার অর্থ বোঝে নি, কিন্তু যখন সে নগরের অভ্যন্তরে মসজিদের সেই একান্তে আলোছায়ার মধ্যে মুবারকের সঙ্গে পরিচিতা হল, তখন সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে একটি রমণী তার প্রথম সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে একটি পুরুষের সামনে মেলে ধরল। ভুলে গেল রমণী-মনের সব লজ্জা। লজ্জা যে ঐশ্বর্য, লজ্জা না থাকলে যে রমণীর স্বভাব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে—এ সবই সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হল জেবুন্নিসা। মনে হল তার—এই তার চোখের সুরমা, হৃদয়ের নিশ্বাস, ওড়নার সুবাস, কণ্ঠের মোতি।

মুল্লা আশ্রফ দুজনের এই বিস্ময়ের মুখোমুখি মৌনব্রতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেও বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁর কর্তব্য এখনও শেষ হয় নি। তিনি এখনও এদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন নি। ইতস্তত করে শেষকালে তিনি তাদের মুগ্ধভাব উন্মোচন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এই প্রথম জেবুন্নিসার জীবনে মহব্বত। তখনও সে ভাল করে জানে না, মহব্বত কাকে বলে? একেবারে সম্পূর্ণ নতুন একটি অনুভূতি! ভাল লাগে। দিলের ধড়ফড় বেশ ভাল করে উপলব্ধি করা যায়। মনটা যেন বার বার শুধু একজনকেই দেখতে চায়। সে এসে সমস্ত দেহটায় স্পর্শ মাখিয়ে দিলে কেমন যেন বেহেস্তের এক অজানা সুখ উপভোগ করা যায়। ইচ্ছে করে, রমণীর দেহে যে নতুন ঐশ্বর্যের নিত্য নতুন সম্পদ রোশনাই জেলে দুনিয়া চমকিত করছে, কেউ এসে সেই সম্পদের অংশীদার হয়ে সমস্ত জীবনের—মনের আকাঙ্ক্ষাকে নিবীড় করে ভরিয়ে দিক্।

সেদিন একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পিতার আশ্রয়ে ফিরে এসেছিল জেবুন্নিসা। তারপর মুবারকের সঙ্গে গোপনে অনেকবার দেখা করেছে। কোনটা মুল্লা আশ্রফ জানতেন, কোনটা জানতেন না। পরে আর জানানর দরকার হয় নি। মুবারক নিজেই বাঁদীকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছিল।

সেই প্রথম যৌবনপ্রাপ্তা জেবুন্নিসার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা

আবেশের ঘোর-তন্ময়তা-ভাললাগা তাকে অভিভূত করে রেখেছিল। জেবুন্নিসা কবিতা লিখল।

'গর্‌চে মান লয়লি আসাসম্ দিল চো মজনু
দার হাওয়াস্ত
সর্ বসাহরা মি জানম্ লেকিন হায়া
জঞ্জির পাস্ত্।'

জেবুন্নিসা মুগ্ধ হয়ে মহব্বতের মেহেদি রঙে আপ্লুতা হয়ে লায়লি-মজনুর প্রেমের গীত গাইল।…'প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হয়ে মরু প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছিল, আমার ইচ্ছা হয় আমি তেমনি করে ছুটে বেড়াই; কিন্তু আমার পা যে সরম সম্ভ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা।'

জেবুন্নিসা দ্বিতীয়বার লিখল।

'বুল্‌বুল্ আজ সাগির দিয়ম্ সুদ্ হম্ নিশিনে
গুল ববাগ্।
দার মহব্বৎ কামিলম্ পরওয়ানা হাম্
সাগির্দে মাস্ত্।
দরনেহা খুনেম্ জাহির গার্‌চে
রঙ্গে নাজ কাম্।
রঙ্গে মন্ দরমন্ নেহাঁ চুন্ রঙ্গে সুরখ্
অন্দার হিলাস্ত।
বস্‌কে বারে গাম বরু আন্দাখ্‌তাম
জামা নীলি কারদ ইনাঁক বিকে পুস্তে
উদোতাস্ত্।
দেখিতারে সাহাম্ ওলেকিম্ রু বসাফর
আওর দা অম্।
জেব্ ও জিনৎ বস্ হামিনম্ নামে মান্
জেব্ উন্নিসাস্ত।'

কত অল্প বয়সের জেবুন্নিসার কবিতার কাব্যসৃষ্টি লক্ষ্য করবার মত। সে ভাবাবেগে মুগ্ধ হয়ে অপরিণতা মনের রঙ ছড়ায়নি। তার ভাবাবেগ পুষ্টহস্তের লেখনীতে মুবারকের কবি মনের রূপকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছিল। অভিভূত হয়েছিল মুবারক। শুধু দেহগত কামনা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে

জবুন্নিসার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার পরিণতা মনের অভিব্যক্তি দিয়ে সে কবিতার রঙে তার মহব্বতের অনুভূতির অর্থ করেছিল অপরূপ—যা কোন আওরতের দ্বারাই সম্ভব নয়। তার কবিতার অর্থ…'ঐ যে বুলবুল সারাদিন ধরে গোলাপের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কানে কানে চুপে চুপে মহব্বতের কথা বলে—এ আমারই কাছে সে শিখেছে।…ঐ যে আমার সম্মুখে কাচের ফানুসের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক, তার স্নিগ্ধজ্যোতিতে মুগ্ধ হয়ে শত শত পতঙ্গ আত্মবিসর্জন দিচ্ছে,সে আত্মত্যাগ তারা আমারই কাছ থেকে শিখেছে।…মেদিপাতার বাইরের স্নিগ্ধ শ্যামলতা যেমন তার ভেতরের রক্ত-রাগকে লুকিয়ে রাখে, তেমনি আমার শান্তমূর্তি আমার মন-আগুনের জলন্তরাগ গোপন রেখেছে।…আমার হৃদয়ের দুঃখভারের কিছু অংশমাত্র আকাশকে দিয়েছি, আকাশ তারই ভারে নীল হয়ে আছে, নত হয়ে পড়েছে।'

তারপর জেবুন্নিসা মহব্বতের শেষপরিণতি কল্পনা করে শেষপংক্তিতে লিখেছে।…'ধন ঐশ্বর্য আমার ভাল লাগে না, দরিদ্রের পীড়ন আমার কাছে বেশ! আমি জেবুন্নিসা অর্থাৎ সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। এইটুকু গৌরবই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

জেবুন্নিসা শেষ পরিণতি কল্পনাই করে রেখেছিল। পিতা ঔরঙ্গজেব একদিন সবই জানতে পারলেন। হয়ত আগেই জেনেছিলেন, শুধু সময় নিয়ে কন্যার কতদূর অগ্রগতি সেইটাই লক্ষ্য করছিলেন। একদিন জেবুন্নিসার কক্ষ থেকেই মুবারককে বন্দী করলেন। বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আর মুল্লা আশ্রফের সাহায্যের জন্য তাঁর বিচারে ঔরঙ্গজেব তীরস্কার করে শুধু এই বললেন—আপনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনার অবমাননা করে আমি নিজেকে নগণ্য করব না। তবে ভবিষ্যতে আমার কন্যার শিক্ষা ছাড়া আর কোন কিছুতে অগ্রসর হলে সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র যুবরাজ ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা পাবেন না।

জেবুন্নিসাকে তিনি কিছু বলেন নি। কিন্তু জেবুন্নিসা সেই থেকে হয়েছে অপরাধিনী। সেদিন সেই প্রথম মহব্বতের রঙীন স্বপ্নের মানুষটির মুণ্ড ধড় থেকে দ্বিখণ্ডিত হলে পিতা একবার তাকে দর্শনের জন্য আহ্বান করেছিলেন। জেবুন্নিসা যেতে চায়নি, কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করার সাধ্য তার ছিল না। দেখেছিল মুবারকের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড। দেখে তার মনের সমস্ত স্বপ্ন, কল্পনা,

আকাঙ্খা দূরীভূত হয়েছিল। উঃ কী নৃশংস পিতার কন্যা সে? চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম মহব্বতের মানুষটির রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড দেখেছে। চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে অন্ধ হয়ে যায় নি। চোখে এমনকি এক ফোঁটা জলও আসেনি।

কিন্তু আজ আসছে।

চোখের দুকোণে কখন জলের ধারা নেমেছে জেবুন্নিসার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ রমনী কণ্ঠের কান্না কানে যেতে তাড়াতাড়ি সে চোখের জল মুছে সেইদিকে এগিয়ে গেল। কান্নার সুর ভেসে আসছে নবাব বাইয়ের মহল থেকে। কে কাঁদছে, জানে জেবুন্নিসা! তাই সে বর্তমানের চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নবাই বাইয়ের মহলের দিকে দ্রুত পা চালাল।

নবাববাই ঠিক আকবরের প্রধানা মহিষী বিহারী মলের কন্যা মরিয়ম জমানী যোধবাইয়ের মত। মুসলমানের স্ত্রী হয়েও এই হিন্দু রমনী হিন্দুর সমস্ত আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন; তাঁর মহলে তুলসী, হোমকুণ্ড, গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ছিল এবং ব্রাহ্মণ পাচক ছিল। তাঁর বাঁদী ছিল হিন্দু। এমন কি কোন মুসলমান ভুলেও হিন্দু মহিষীর মহলে ঢুকে পড়লে তাকে শাস্তি পেতে হত। সম্রাট আকবরের মত ঔরঙ্গজেবও নবাব বাইয়ের এই হিন্দু প্রীতি সহ্য করতেন। কেন করতেন তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তবে সম্রাট আকবর সহ্য করেছিলেন এইজন্যে যে তাঁর সকল ধর্মের প্রতি একই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব যে বিপরীত ছিলেন সে সকলেই জানে। ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে এবং ধর্মকে প্রচার করতে ঔরঙ্গজেব পুরোমাত্রায় হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের ওপর 'জিজিয়া কর' পুনঃ প্রবর্তনেই তাঁর বিদ্বেষ ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারই এক্তিয়ারে হিন্দু হয়ে হিন্দুর সবকিছু বজায় রাখা······!

নবাব বাইয়ের সবকিছু আধিপত্য যুবরাজ থাকাকালীন ঔরঙ্গজেব সহ্য করেছিলেন। বাদশাহ হয়েও তাঁর মহিষীর আধিপত্য ধ্বংস করেন নি। তবে আগের মত আর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল না। বরং তিনি সন্দেহ করতেন—যদি কখনও বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়—তাহলে সে উৎপত্তি মহলের এই কোণ থেকেই উৎক্ষিপ্ত হবে।

জেবুন্নিসা মনে মনে নবাব বাইয়ের বর্তমান অবস্থাটা পর্যালোচনা করল। ভারতেশ্বরী হবার ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আজ নবাব বাইয়ের অবস্থা কি?

শুধু সামান্য ধর্মের ভেদাভেদের ফলে তাঁর নির্দিষ্ট আসন অন্য একজন এসে অধিকার করল। উদিপুরী আজ নবীন বাদশাহের সমস্ত মন জুড়ে। খৃষ্টান রমণী হয়ে শুধু অপরূপ রূপের জন্য তাঁর আসন হল মহামূল্যবান সিংহাসনের পাশে।

নবাব বাইয়ের মহলের সামনে খাসবাঁদী কোয়েলের সঙ্গে জেবুন্নিসার দেখা হল। তাকে দেখে কোয়েল কুর্নিশ জানিয়ে বিস্ময়ে বলল—বাদশাহজাদী আপনি এ মহলে? এ মহলে বলার কারণ, কখনও এ মহলে কোন মুসলমানী আওরৎ প্রবেশ করে না। যদি করে, তাহলে গঙ্গাজল দিয়ে সেইস্থান ধৌত করা হয়।

জেবুন্নিসা মৃদু ম্লান হেসে বলল—কোয়েল, মহলে কাঁদে কে? কান্নার শব্দ শুনেই আমি আর থাকতে পারলুম না, তাই এলুম।

কোয়েল জেবুন্নিসার আরও কাছে সরে এল, এসে চুপিসারে বলল—আপনি কি জানেন না বাদশাহজাদী?

জেবুন্নিসাও চাপাস্বরে উত্তর দিল—কি? যেন সে কিছুই জানে না, কিছুই শোনে নি, এমনি ধারা ভাব করল।

কোয়েল আরও বিস্মিত হয়ে বলল—বাদশাহ আলমগীর মালেকার পুত্র সুলতান মহম্মদ সাহেবকে কয়েদ করেছেন?

অপরাধ?

সে অনেক কাহিনী।

জেবুন্নিসা সে কাহিনী জানাতে বলে আর কোয়েলকে ভীতা করল না। কারণ সে শাহাজাদীর অনুরোধে বলবে বটে সে কাহিনী, কিন্তু সে চারদিকে চোখ রেখে। কেউ শুনতে পায় কিনা এমনি করে কান রেখে তারপর বলবে। কোথেকে কি দোষ হয়ে যাবে এই ভয়ে বাঁদী সর্বদা সন্ত্রস্ত।

তাই সে কাহিনী চাপা দিয়ে জেবুন্নিসা গম্ভীর মেজাজে জিজ্ঞাসা করল—নিহত যুবরাজ মুরাদ বক্সের কন্যা দোস্তার কি তোমাদের মহলে?

না, বিবি সাহেবা! সম্ভবতঃ সুলতান মহম্মদের মহলে।

ওকে একবার ডেকে নিয়ে আসতে পার? তারপর কি ভেবে জেবুন্নিসা বলল—থাক্।

জেবুন্নিসার ইচ্ছে ছিল বিবি সাহেবার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু দেখা করার অনেক ঝামেলা। বাঁদশাহজাদী জেবুন্নিসা মহলে প্রবেশ করলে অবশ্য

কিছু মারাত্মক অপরাধ হবে না। কিন্তু চলে গেলে সমস্ত স্থানে গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া হবে। বাইসাহেবা জোরে জোরে চীৎকার করে করে চাকরাণী দিয়ে সমস্ত স্থান ধৌত করবেন। সেইজন্যে কোনদিন বাইসাহেবার মহলে জেবুন্নিসা প্রবেশ করে নি। একবার তার দুই ছোটবোন মিহর ও জুবাইদ দাক্ষিণাত্যে থাকার সময় বাই সাহেবার মহলে ঢুকেছিল। অবশ্য ঢুকেছিল অসাবধানে। খেলতে খেলতে হঠাৎ অসাবধানে প্রবেশ করেছিল।

নবাব বাই তখন তাঁর মহলে পূজার কাজে ব্যস্ত। পট্টবস্ত্র পরিধান করে তিনি দেবতার স্থানে পূজা নিবেদন করছেন, প্রণাম করছেন। সেই সময়ে চোখের সামনে মিহর ও জুবাইদকে দেখে রোষনয়নে তাদের দিকে তাকালেন।

মিহর ও জুবাইদ এতটা আশা করে নি। হঠাৎ তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। পায়ে পায়ে সরে এসে একেবারে মহলের বাইরে গিয়ে দে ছুট। পরে পিতা ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে তারা ভৎর্সনা পেয়েছিল। তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

নবাব বাইয়ের মহলে একমাত্র শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ ছাড়া আর কারও প্রবেশের হুকুম ছিল না। তাও তিনি যখন তখন প্রবেশ করতে পারতেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় নবাব বাই সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যুবরাজ ঔরঙ্গজেবকে সংবাদ দিতেন। তারপর ঔরঙ্গজেব মহলে আসতেন। এবং ঘণ্টা দুই সময় অতিবাহিত করে চলে যেতেন। সেদিন নবাব বাইয়ের দৌত্য সর্বস্বীকৃত হত। তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করার উপায় ঔরঙ্গজেবেরও ছিল না—কেন যে ছিল না বলা যায় না—বোধ হয় ঔরঙ্গজেব তাঁর এই মহিষীকে যথেষ্ট ভালবাসতেন।

জেবুন্নিসা এবার ফিরে যাবার জন্যে এগিয়ে গেল। তাই দেখে কোয়েল বিস্ময়ে বলল—আপনি দেখা করবেন না বিবি সাহেবার সঙ্গে?

জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে বলল—না। তারপর ম্লান হেসে বলল—দেখা করতে গেলেই ত অনেক ঝামেলা! তোমার মালেকা আবার এই অবেলায় সমস্ত মহল ধোয়ার জন্যে তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন!

কোয়েল এবার মৃদু হেসে বলল—না বাদশাহজাদী। এখন আর অতটা ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক বিবিসাহেবার নেই। তাঁর এখন ভাগ্য পুড়েছে। নতুন বাদশাহের তখ্‌তে বসে আর মালিক মহলে পা দেন না। তার ওপর

মালেকার বড় লেড়কার বেয়াদপি দেখে বাদশাহ চটেছেন। মালেকা বলেন —আমার দম্ভ ভেঙেছে আমার দুই লেড়কা। না হলে আজ আমি সম্রাজ্ঞী। আসলে যে মালেকা হিন্দু বলে প্রধানার পদ পেলেন না সেটা কিছুতে স্বীকার করতে চান না।

বেদনাহত হয়ে জেবুন্নিসা চুপ করে থাকল। কোয়েলের কোন কথার উত্তর দিল না। উত্তর দেবার অবশ্য অনেক কথাই ছিল। শুধু মনের মধ্যে বিবিসাহেবার জন্যে জেবুন্নিসার দুঃখ হল। সুন্দরী রমণী ধর্ম ত্যাগ করে অনেক আশা নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রবধূ হয়ে রাজঅন্তঃপুরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের হারেমে ঢুকে মুসলমানের অঙ্ক-শায়িনী হয়ে হিন্দুত্ব ত্যাগ করতে পারেন নি। তার মধ্যেই বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর নিজের ধর্ম। অবশ্য ধর্মের কিছুই নেই। তবু ধর্মের নামে নিজেকে জড়িয়ে রাখার মধ্যেও বাহাদুরী আছে। আর ঔরঙ্গজেব নিজের ঘরের মধ্যে অপরের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রেরণা দেখে কিছু না বলে সমর্থন করেছিলেন কেন—সেই কথা ভাবলে বেশ আশ্চর্য লাগে। বোধ হয় আওরঙ্গের আকাঙ্ক্ষাকে স্তিমিত করতে চান নি বলে তাঁর এই সমর্থন। কিংবা বেগমের এই ছেলেমানুষী ধরনের ধর্ম বজায় রাখার ইচ্ছাকে হাস্যকর মনে করেই গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু পরেরটি চিন্তা করে—বর্তমানে সম্রাট পিতার মানসিক অবস্থা জেনে এসেছে জেবুন্নিসা ; পিতা এখন তাঁর এই হিন্দু মহিষী নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত।

তখনও মহলের ভেতর থেকে রমণী কণ্ঠের কান্নার শব্দ বাইরে ভেসে আসছিল। কান্নার শব্দ একজনের নয়, অনেক জনের বলেই মনে হয়। মনে হয় অনেকগুলি রমণী একসঙ্গে দল বেঁধে এক সুরে কান্না জুড়েছে। জেবুন্নিসা চিন্তা করবার চেষ্টা করল—কে কে কাঁদতে পারে? সম্ভবত নবাব বাই পুত্রের জন্য কাঁদছেন। সুলতান মহম্মদের এক রাজপুত মহিষী ও এক বেগম কাঁদতে পারে। আর কে কাঁদতে পারে? নিহত শাহজাদা সুজার কন্যা গুলরুক নিশ্চয় কাঁদছে না? সে জানতো এমন ধারা হবে। দোস্তারও কাঁদবে না। সে মা ও বাবাকে হারিয়ে সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গেছে। তার ফুলের মত তনুর দেহের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ শুষ্ক। সুলতান ভাইজান সেই শুষ্ক তনুদেহের ভেতরে কিসের জৌলুষ দেখে এত লোভাতুর হয়ে তাকে শাদী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কে জানে? সম্ভবত আওরং দেখলেই মরদের অধিকার

করবার ইচ্ছা জাগে—সেই জন্যেই হয়ত সুলতান মহম্মদ দেওয়ানা আওরংকে অধিকার করে বাহাদুরী দেখাল। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাইজান নিজের ঔদ্ধত্যের জন্যে সব হারাল। হারাল দোস্তারকে। হারাল স্বাধীনতা। এখন গোয়ালিয়র দুর্গে বসে বসে হয়ত আফশোষ করছে।

সম্রাট বাদশাহ ঔরঙ্গজেব—সুলতান মহম্মদকে একটা সামান্য হেতু দেখিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন কিন্তু আসলে সে হেতু কিছু না, সুলতান মহম্মদের সমর কৌশল দেখেছিলেন ঔরঙ্গজেব। দেখে চমকিত হয়েছিলেন। সিংহাসন পাওয়ার জন্যে যতগুলি কৌশল ঔরঙ্গজেব অবলম্বন করেছিলেন, সবগুলির জয়ে সুলতান মহম্মদের অনেক সাহায্য ছিল। ঔরঙ্গজেব পুত্রের শক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে, সিংহাসন পাওয়ার পর বিচার করে ভীত হয়ে পড়েছিলেন; নিজের পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ঔরঙ্গজেবের বেশ ভয় ছিল; বুঝি তিনিও পুত্রের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অনেক কষ্টের পাওয়া রাজত্ব হারাবেন। তাই তাড়াতাড়ি পুত্রের অপরাধ দেখিয়ে তাকে কারাগারে পাঠালেন। হয়ত সুলতান মহম্মদ শেষ পর্যন্ত প্রাণ দেবেন শুধু এই কারণে। ঔরঙ্গজেবের অন্যান্য পুত্ররা তখন অপরিণত ছিল তাই রক্ষে। তা না হলে তারাও সুলতান মহম্মদের মত অকালে তাদের জীবন-যৌবন চিরকালের জন্য হারাত।

কোয়েলের বিস্মিতদৃষ্টির সম্মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জেবুন্নিসা আর সে দিকে না তাকিয়ে নিজের মহলের দিকে পা বাড়াল। দিনের সূর্য এখন মস্তকোপরে। অপরাহ্নের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদের কিঞ্চিৎদূর থেকে কাড়ানাকড়া, দুন্দভি, মন্দিরা, সানাই প্রভৃতির বিকটশব্দ আর শোনা যায় না। দুপুরের এই সময়টায় বাজনদাররা হাত পালটায় বলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকে এই বাজনা। শোনা যাচ্ছে এই বাজনাও নাকি নবীন বাদশাহ বন্ধ করে দেবেন। কোন গীত বা বাদ্য তার রাজত্বে হবে না। সঙ্গীতের আসর রাজসভা থেকে অদৃশ্য হবে। নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ আর মিঠে বোল তুলবে না। কী এক আশ্চর্য ঘোষণা যে নবীন বাদশাহের মাথায় এসেছে? আশ্চর্যই বটে! সম্রাট পিতা আনন্দের উপাধান, সান্ত্বনার ইন্ধন, দুঃখের লাঘব—রাজ্য থেকে কেন অপসারিত করতে চান কে জানে? তিনি বলেন—এসব মানুষের জীবনে থাকলে মানুষের সমস্ত শক্তি অপসারিত হয়।

আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় তিনি অভিজ্ঞ হয়ে সাম্রাজ্য থেকে আনন্দকে তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর স্তব্ধতা আনতে চান। রাজসভা থেকে শিল্পকর্মের সমস্ত বস্তু আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা শোনা গেল নবীন বাদশাহের অবহেলা পেয়ে চলে যাচ্ছেন। অথচ জেবুন্নিসা মনে মনে ঠিক করেছে সে এইবার তার বাকী জীবন কবিতার রঙে নিজেকে ডুবিয়ে কবিমনা হয়ে উঠবে।

আওরতের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা তো তার মিটবে না। পিতা তাকে অবশ্য শাদী করবার জন্য আদেশ দিয়েছেন—কিন্তু সে আদেশের মধ্যে আছে পিতার ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ। পিতা দেখতে চান, তাঁর কন্যা সাধারণ আওরতের মত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলাফেরা করে, না কোন অসাধারণ বুদ্ধির চিন্তা নিয়ে কালাতিপাত করে। তাই জেবুন্নিসা নিজের বাকী জীবনের যে অবশিষ্ট যৌবন আছে, সেই যৌবনের রঙ দিয়ে সে আঁকবে কবিতার মধ্যে দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। তার বেগুনা বহিন্ জিনৎ যেমন প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনের বাকী দিনগুলি জাহানারার জুম্মা মসজিদের সেবাদাসী হয়ে কাটাবে —তেমনি সেও তার বাকী জীবনটা কবিতা লিখেই কাটিয়ে দেবে। অন্তত জগতে তার নাম রাখার একটা সামান্য ইঙ্গিতও থাকবে—যাতে কেউ না কেউ তার কবিতাগুলি পড়ে তার আজকের মনের ছবি দেখে কাঁদে, শোক করে, জেবুন্নিসা বলে একটি দীনা আওরতের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

হঠাৎ অলিন্দের মুখে কাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে জেবুন্নিসাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। চেয়ে দেখল তার বিবশ চোখের মেদুর চাউনি নিয়ে। সামনে হাস্যমুখরিতা তার দুটি ছোট বহিন্—জুবাইদ ও মিহর।

জুবাইদ ও মিহর তখনও হাঁপাচ্ছিল। জেবুন্নিসাকে দেখে বলল—তুমি কোথায় ছিলে বহিন্? আমরা সারা তল্লাটে ঘুরে তোমার ঠিকানা পাচ্ছিলাম না।

জেবুন্নিসা তাদের কোন কথার উত্তর দিল না। শুধু ম্লানকণ্ঠে বলল—তোমাদের আর্জি বাদশাহ পিতা মঞ্জুর করেছেন।

সমস্বরে দুজনে আনন্দ প্রকাশ করে বলল—করেছেন? বহুৎ সুক্রিয়া বহিন্। খবর বহুৎ আচ্ছি। এই বলে তারা আর অপেক্ষা না করে নাচতে নাচতে অন্তর্ধান করল।

জেবুন্নিসা তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ব্যথিতস্বরে বলল—বেচারী। বড় ছেলেমানুষ! কিছু বুঝতে চায় না। নিজেদের আনন্দকে আপন করতে তাদের আর কোন সমস্যা তাদের ব্যথিত করে তোলে না। কিন্তু তারা যদি জানত—বাদশাহ পিতা তাদের বহিন্‌কে কত ব্যথা দিয়ে তারপর তাদের আর্জি মঞ্জুর করেছেন! পিতার বুকের মধ্যে মমতা যে কতখানি আছে, একবার যদি তার সন্ধান পাওয়া যেত তাহলে নিজেকে সাবধান করে নিতে পারত জেবুন্নিসা।

মমতাহীন পিতার কন্যা সে। অথচ খোদা তার দিলের মধ্যে এত মমতা দিলেন কেন? রাজবংশে জন্মে তার এই মমতা যে মূল্যহীন। যার স্বাধীনতা নেই—তার মমতার মূল্য কি? ইচ্ছে করে, আসমানের ওপর দিয়ে যে সব পাখী দূর উজানে উড়ে যায়, তাদের একান্তে এনে নিজের স্নেহের স্পর্শ দিয়ে ধরে রাখে। যে সব কয়েদীরা বাদশাহের বিচারে শাস্তিভোগ করে—তাদের চোখের কাতর দৃষ্টি দেখলে কেমন যেন বুকের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগে। ইচ্ছে করে, বাদশাহকে বলে তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের বাঁচবার সুযোগ দেয়।

কেন এই মমতার পাহাড় দিলের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে তাকে বিদ্রূপ করে? খোদা কি ভুলে গেছেন—সে নিষ্ঠুর মানুষের কন্যা? তার মনটাও যে নিষ্ঠুর-ভাবে তৈরী হলে পিতার সম্মান রক্ষা পেত!

নবাববাই তার আপন কেউ নয়। বরং আম্মাজানের শত্রু। অথচ আজকে তাঁর দুঃখে হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। যদি সে তাঁকে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারত! আর যদি সে সান্ত্বনায় বিবিসাহেবার মন শান্ত হত, তাহলে তার চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেউ হত না। কিন্তু বিবিসাহেবার কাছে গেলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন, এই ভয়ে সে মহলের সামনে থেকে সংবাদ নিয়ে চলে এল।

মাথাটার মধ্যে যেন আগুনের প্রদাহ। কেমন যেন আজ অনেক দিন পরে চিন্তার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে মাথার ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত করে তুলেছে। আসমানে সূর্যের প্রখরদীপ্তি। সেই দীপ্তি যেন জেবুন্নিসার মাথার মধ্যে। দেহের মধ্যেও হঠাৎ জ্বালা অনুভূত হল। দেহের সমস্ত পোষাক এই মুহূর্তে খুলে ফেলে এক টব ঠাণ্ডা বরফ জলে খানিকক্ষণ দেহ ডুবিয়ে রাখলে বোধহয় উত্তপ্তভাব কমতো।

হ্যাঁ, কমতো বোধ হয়। এখনই স্নান করে নিলে সমস্ত দেহে কিছুক্ষণের

আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় তিনি অভিজ্ঞ হয়ে সাম্রাজ্য থেকে আনন্দকে তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর স্তব্ধতা আনতে চান। রাজসভা থেকে শিল্পকর্মের সমস্ত বস্তু আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা শোনা গেল নবীন বাদশাহের অবহেলা পেয়ে চলে যাচ্ছেন। অথচ জেবুন্নিসা মনে মনে ঠিক করেছে সে এইবার তার বাকী জীবন কবিতার রঙে নিজেকে চুবিয়ে কবিমনা হয়ে উঠবে।

আওরতের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা তো তার মিটবে না। পিতা তাকে অবশ্য শাদী করবার জন্য আদেশ দিয়েছেন—কিন্তু সে আদেশের মধ্যে আছে পিতার ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ। পিতা দেখতে চান, তাঁর কন্যা সাধারণ আওরতের মত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলাফেরা করে, না কোন অসাধারণ বুদ্ধির চিন্তা নিয়ে কালাতিপাত করে। তাই জেবুন্নিসা নিজের বাকী জীবনের যে অবশিষ্ট যৌবন আছে, সেই যৌবনের রঙ দিয়ে সে আঁকবে কবিতার মধ্যে দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। তার বেগুনা বহিন্ জিনৎ যেমন প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনের বাকী দিনগুলি জাহানারার জুম্মা মসজিদের সেবাদাসী হয়ে কাটাবে—তেমনি সেও তার বাকী জীবনটা কবিতা লিখেই কাটিয়ে দেবে। অন্তত জগতে তার নাম রাখার একটা সামান্য ইঙ্গিতও থাকবে—যাতে কেউ না কেউ তার কবিতাগুলি পড়ে তার আজকের মনের ছবি দেখে কাঁদে, শোক করে, জেবুন্নিসা বলে একটি দীনা আওরতের জন্য একফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

হঠাৎ অলিন্দের মুখে কাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে জেবুন্নিসাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। চেয়ে দেখল তার বিবশ চোখের মেদুর চাউনি নিয়ে। সামনে হাস্যমুখরিতা তার দুটি ছোট বহিন্—জুবাইদ ও মিহর।

জুবাইদ ও মিহর তখনও হাঁপাচ্ছিল। জেবুন্নিসাকে দেখে বলল—তুমি কোথায় ছিলে বহিন্? আমরা সারা তল্লাটে ঘুরে তোমার ঠিকানা পাচ্ছিলাম না।

জেবুন্নিসা তাদের কোন কথার উত্তর দিল না। শুধু ম্লানকণ্ঠে বলল—তোমাদের আর্জি বাদশাহ পিতা মঞ্জুর করেছেন।

সমস্বরে দুজনে আনন্দ প্রকাশ করে বলল—করেছেন? বহুৎ সুকৃরিয়া বহিন্। খবর বহুৎ আচ্ছি। এই বলে তারা আর অপেক্ষা না করে নাচতে নাচতে অন্তর্ধান করল।

জেবুন্নিসা তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ব্যথিতস্বরে বলল—বেচারী। বড় ছেলেমানুষ! কিছু বুঝতে চায় না। নিজেদের আনন্দকে আপন করতে তাদের আর কোন সমস্যা তাদের ব্যথিত করে তোলে না। কিন্তু তারা যদি জানত—বাদশাহ পিতা তাদের বহিন্‌কে কত ব্যথা দিয়ে তারপর তাদের আর্জি মঞ্জুর করেছেন! পিতার বুকের মধ্যে মমতা যে কতখানি আছে, একবার যদি তার সন্ধান পাওয়া যেত তাহলে নিজেকে সাবধান করে নিতে পারত জেবুন্নিসা।

মমতাহীন পিতার কন্যা সে। অথচ খোদা তার দিলের মধ্যে এত মমতা দিলেন কেন? রাজবংশে জন্মে তার এই মমতা যে মূল্যহীন। যার স্বাধীনতা নেই—তার মমতার মূল্য কি? ইচ্ছে করে, আসমানের ওপর দিয়ে যে সব পাখী দূর উজানে উড়ে যায়, তাদের একান্তে এনে নিজের স্নেহের স্পর্শ দিয়ে ধরে রাখে। যে সব কয়েদীরা বাদশাহের বিচারে শাস্তিভোগ করে—তাদের চোখের কাতর দৃষ্টি দেখলে কেমন যেন বুকের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগে। ইচ্ছে করে, বাদশাহকে বলে তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের বাঁচবার সুযোগ দেয়।

কেন এই মমতার পাহাড় দিলের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে তাকে বিদ্রূপ করে? খোদা কি ভুলে গেছেন—সে নিষ্ঠুর মানুষের কন্যা? তার মনটাও যে নিষ্ঠুর-ভাবে তৈরী হলে পিতার সম্মান রক্ষা পেত!

নবাববাই তার আপন কেউ নয়। বরং আম্মাজানের শত্রু। অথচ আজকে তাঁর দুঃখে হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। যদি সে তাঁকে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারত! আর যদি সে সান্ত্বনায় বিবিসাহেবার মন শান্ত হত, তাহলে তার চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেউ হত না। কিন্তু বিবিসাহেবার কাছে গেলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন, এই ভয়ে সে মহলের সামনে থেকে সংবাদ নিয়ে চলে এল।

মাথাটার মধ্যে যেন আগুনের প্রদাহ। কেমন যেন আজ অনেক দিন পরে চিন্তার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে মাথার ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত করে তুলেছে। আসমানে সূর্যের প্রখরদীপ্তি। সেই দীপ্তি যেন জেবুন্নিসার মাথার মধ্যে। দেহের মধ্যেও হঠাৎ জ্বালা অনুভূত হল। দেহের সমস্ত পোষাক এই মুহূর্তে খুলে ফেলে এক টব ঠাণ্ডা বরফ জলে খানিকক্ষণ দেহ ডুবিয়ে রাখলে বোধহয় উত্তপ্তভাব কমতো।

হ্যাঁ, কমতো বোধ হয়। এখনই স্নান করে নিলে সমস্ত দেহে কিছুক্ষণের

জন্য আরাম অনুভূত হবে। জেবুন্নিসা নিজের কক্ষে ঢুকে হঠাৎ তার খাস-বাঁদীকে দেখতে না পেয়ে চীৎকার করে ডাকল—ইখ্‌তি! ইখ্‌তি!

কিছুক্ষণের মধ্যে ইখ্‌তি এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে জেবুন্নিসা বিরক্ত হয়ে বলল—কোথায় যাস্? ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

ইখ্‌তি কাঁচুমাচু হয়ে বললে—মালেকা, কুলসম এসেছিল আপনাকে খোঁজ করতে? শাহাজাদী রোশোনারা জানী বেগমের ওপর ভীষণ অত্যাচার সুরু করেছেন—এখনি না গেলে সে বুঝি মারা যায়!

হঠাৎ জেবুন্নিসা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলল—তা আমি কি করব? আমার কী ক্ষমতা আছে? দুনিয়ার সমস্ত অত্যাচার নিবারণের জন্য সবাই আমার কাছে আসবে—তোরা আমাকে ভেবেছিস্ কী? যা-যা বেরো বেরো। তোদের মুখ দেখলে আমার পাপ হয়।

এমন উগ্রমূর্তি কখনও দেখেনি ইখ্‌তি তার মালেকার। তাই সে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি কক্ষ থেকে সরে পড়ল।

জেবুন্নিসা তখনও চীৎকার করছে—দুনিয়ার সবার সবকিছু ব্যবস্থা আমি করব। অথচ তার বিনিময়ে আমি কি পাব? আমি শুধু নিষ্ঠুর বাদশাহ পিতার ব্যঙ্গের পাত্রী হব? আমার দিল্ বিগড়ে যাবে। কলিজার খুন শুখিয়ে যাবে। ফুলের সৌরভ নষ্ট হয়ে মৃতবৎ হবে। আমার এই ক্রুদ্ধমনের আকাঙ্ক্ষা কে শান্ত করবে? আমার আশা কে পূর্ণ করবে? আমি কী আওরৎ না? আমার কী দিলে মহব্বত নেই?

না-না আমার কিছু নেই। আজ আমি বাদশাহজাদী। আজ আমি নতুন সম্মানে সম্মানী হয়েছি। সবাই আসবে আমার কাছে। দরবার করবে আমার কাছে। আমি তাদের প্রার্থনা পূরণ করব। আমার সমস্ত আর্জি পিতা শুনে তার রায় দেবেন অদ্ভুত।......হ্যাঁ, হ্যাঁ অদ্ভুত সে রায়। হঠাৎ হো হো করে চোখে দুটো হাত চাপা দিয়ে জেবুন্নিসা কাঁদতে লাগল। ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার উত্তাল বক্ষ। ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তার দেহের সমস্তবাঁধ। পালঙ্কের ওপর ভেঙে পড়ে জেবুন্নিসা পরমশান্তির কোলে নিমজ্জিত হল কিছুক্ষণের জন্য।

সেদিনই গভীর রাত্রে হঠাৎ প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে দারুণ হট্টগোল হারেমের নিস্তব্ধতা নষ্ট করল। যারা ঘুমিয়েছিল সচকিত হল। যারা

ঘুমোয়নি, তাঁরা কৌতূহলী হল। খোজা প্রহরী প্রাসাদের সিংহদ্বারের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল—হুঁশিয়ার! তার চীৎকারের প্রতিধ্বনি সমস্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল হুঁশিয়ার ধ্বনিতে দিকবিদিক মুখরিত করে। তারপর প্রাসাদের বহির্ভাগে অনেকগুলি অশ্বখুরের শব্দ উত্থিত হল। কারা যেন চুপিসাড়ে প্রাসাদের সিংহদরজা দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল।

জেবুন্নিসা তার কক্ষের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইখতির আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ইখতিকে সে পাঠিয়েছে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষের কাছে। ইখতির না ফেরা পর্যন্ত তাই তার হাজারো হাজারো সংশয়।

হঠাৎ প্রাসাদের ভেতর থেকে এইরকম শব্দ আসতে সে সন্দিগ্ধ হল। অন্তঃপুরের প্রায় আলোর দীপ রাতের স্তব্ধতার জন্য নিবানো হয়ে গিয়েছিল। কিছু আলো ছিল অলিন্দের খিলানে খিলানে। তাই থেকে যা আলো বিকীরণ করছিল তা পর্যাপ্ত না হলেও অপর্যাপ্ত নয়।

বাইরে আসমানে আজ প্রচণ্ড অন্ধকার। আজ কি তিথি কে জানে? বাইরের অন্ধকারের জন্য অলিন্দের আলোর পাশে জমাট অন্ধকারের কুহেলী। প্রাসাদের ভেতর হঠাৎ এতরাত্রে কারা এল জানবার জন্যে জেবুন্নিসা বড় কৌতূহলী হয়ে উঠল। অন্তঃপুরের মাঝখানে একটি প্রাচীর ছিল। আর সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে কিছু ফোকর ছিল। সেই ফোকর দিয়ে ওপাশের সব দেখা যায়। জেবুন্নিসা ছুটে গেল সেই ফোকরের কাছে। কিন্তু যা দেখল তাতে তার মাথা ঘুরে গেল। অন্ধকারে সে অল্প আলোর মধ্যে ঠিকই দেখেছে, দারা চাচার অতি আদরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান শিকোকে হাতে-পায়ে লৌহশৃঙ্খল পরিয়ে মোটা শিকল দিয়ে অশ্বের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে এসেছে কয়েকজন সৈনিক। আর ঔরঙ্গজেব তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে চুপিসারে কি বলছেন!

হঠাৎ এ পাশে হারেমের মধ্যে অনেকগুলি খোজাপ্রহরী, তাতার প্রহরিণী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। তারা চীৎকার করে প্রতিটি কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—সম্রাট আলমগীরের হুকুম, আজ রাত্রে কেউ তাঁর কক্ষ থেকে বের হবেন না, বলতে বলতে তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে গেল অন্যদিকে।

জেবুন্নিসা তার কক্ষে ফিরে এল। 'পিতা এত গোপনতা অবলম্বন করতে চান কেন?' তবে কি সুলতান শিকো ধরা পড়েছে, একথা তিনি বাইরে

প্রকাশ করতে চান না? কিন্তু কেন? দুর্নামের ভয়ে? মানুষের অশ্রদ্ধার ভয়? কিন্তু তিনি কি মানুষের শ্রদ্ধা চেয়েছেন? আজ অনেকগুলি হত্যা করে তিনি কলুষিত করেছেন নিজেকে—আবার নতুন করে কি করবেন? আর কালিমা মাখতে চান না? তাই যদি হয়—তাহলে দারার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁর জীবনের একমাত্র সম্পদকে ধরে নিয়ে এসে তার কি উপকার করবেন?

একথা কখনই চিন্তা করা যায় না, যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব আজ ভাইজানের জন্যে অনুশোচনায় তাঁর পুত্রকে স্নেহদান করবেন? স্নেহ যদি দান করতেন —তাহলে ঐরকমভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলের বন্ধনী দিয়ে ধরে এনে প্রাসাদের সবার অগোচরে রাখতে চাইতেন না!

কিন্তু কেন যে এমনি অগোচরে রাখতে চান—সে কথা ভেবে কিছুতে ঠিক করতে পারল না জেবুন্নিসা। প্রাণদণ্ড হবেই সুলতান শিকোর। ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটবে—একথা সকলেই জানে। দারার সন্তান। বিধর্মীর সন্তান—অবশ্যই ধর্মচ্যুত। মুসলিম রীতি অনুসারে নিরীশ্বরবাদীর অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডের নিদর্শন আছে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়, দারাকে ঐ নামে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বটে কিন্তু দারা 'নিরীশ্বরবাদী' ছিলেন না, তাঁর মত ঈশ্বর বিশ্বাসী জগতে দুর্লভ। অথচ শুধু এই দুর্নামে তাঁর প্রাণদণ্ড হল। তাঁর পুত্র সুলতান শিকোর ওপর আসল আক্রোশ—সে চাচার রাজ্যাধিকারে বাধা দিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে।

জেবুন্নিসার বেশ মনে আছে—তাঁর পিতা তখন তাঁর বাহিনী নিয়ে আগ্রার 'নুরমঞ্জিল' উদ্যান থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি তাঁর গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেন—দারা দিল্লীতে অপেক্ষা করছেন, শুধু তাঁর পুত্র সুলতান শিকোর ফেরবার অপেক্ষায়। সুলতান শুকো গিয়েছে গুজরাট প্রভৃতি স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে। ঔরঙ্গজেব শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতগতিতে তাঁর বাহিনী দিল্লীর পথে ছোটালেন। সুলতান শুকো ফেরবার পূর্বেই তাঁকে দিল্লীর প্রাসাদ অবরোধ করতে হবে। তা নাহলে পিতাপুত্রে এক জায়গায় হলে আর দিল্লীর প্রাসাদ অবরোধ করা যাবে না।

সেই সুলতান শিকো আজ ধৃত। সাম্রাজ্যের এতবড় একটি শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে নবীন বাদশাহ তাঁর রাত্রের নিদ্রা হারাবেন?

হঠাৎ রাত্রের স্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল মৌন ধ্যানের তপস্যা। অন্ধকারের বুক চিরে যেটুকু আলো আরও

রহস্যময়ের রূপ নিয়ে প্রাসাদপুরীর অস্তিত্বকে জাগিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাও অন্তর্হিত হল। নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে দারুণ একটি চীৎকার উঠে বিশাল প্রাসাদের সমস্ত পাথরের প্রাচীরগুলি যেন একমিনিটে থর থর করে কাঁপিয়ে দিল।

আর্তস্বরের ভাষা বোঝা গেল না কিন্তু কান্নাস্বরের কাতর প্রার্থনা বেশ স্পষ্টাক্ষরে মরমে গিয়ে তীব্র আলোড়ন জাগাল। জেবুন্নিসা ভাল করে কান দিয়ে শোনবার চেষ্টা করল। না কিছু শোনা যায় না।······কিন্তু হঠাৎ মরীয়া হয়ে আগন্তুকের কণ্ঠের ভাষা স্পষ্ট হয়ে প্রাসাদের গম্বুজমিনারে ধাক্কা লেগে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল।······'চাচা, আমাকে হত্যা করার আদেশ দাও কিন্তু 'পপীর' সরবৎ পান করতে দিও না। আমাকে 'পপীর' সরবৎ পানের অপমান থেকে নিষ্কৃতি দাও।'

আর সহ্য করা যায় না। মানুষের হৃদপিণ্ডের ধুকধুকুনি কি স্তব্ধ হয়ে যায় না? যায় না এই দুনিয়া এই মুহূর্তে উল্‌টে—। এমনি করে আকুতিভরা সুরের প্রার্থনা······! সে প্রার্থনায় যে কঠিন নিষ্প্রাণ পাথরের বুকেও এতটুকু আঁচড় লাগে। সেও যে মুহূর্তের জন্য একটু কোমল হয়।

জেবুন্নিসা আর সহ্য করতে পারল না। তার দেহের ভেতরে দারুণ আলোড়ন কম্পনের মধ্যে দিয়ে তাকে অস্থির করে তুলল। চোখের দুটি সমুদ্রনীলে অজস্র জলের প্লাবন। গাল বেয়ে তারা আপনগতিতে নেমে চলল।······'না না এ সহ্য অতিরিক্ত! আমি বাদশাহী। আমার ক্ষমতা আছে—এ অন্যায়ের প্রতিকার করা। তার জন্যে যদি মৃত্যুও গ্রহণ করতে হয়—তবু ভাল। তবু জানব মনুষ্যত্বের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে মানুষের অন্তরের আকাঙ্খা মিটিয়েছি।'

জেবুন্নিসা বেগে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে গেল কিন্তু অন্ধকারে দরজার মুখে বাধাপ্রাপ্ত হল। খোজা প্রহরী কোষমুক্ত তরবারী তুলে জেবুন্নিসাকে নিষেধ করে বলল—গোস্তাফি মাপ হয় শাহজাদী! সম্রাট আলমগীর বাদশাহের আদেশ, বিনাহুকুমে আজরাত্রে কেউ কক্ষ ত্যাগ করবে না।

জেবুন্নিসা ইচ্ছে করল—এখুনি তার কামিজের তলা থেকে তার তীক্ষ্ণধার ইস্পাহীন ছোরাটা বের করে এই খোজা প্রহরীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু লাভ কি? একটি খোজা বধ হলে মোগলবাদশাহের লাখো লাখো খোজা রোজ তৈরী হচ্ছে, তারা এসে পর পর দাঁড়িয়ে যাবে। সে যদি

পারত, আজকের বীভৎস পরিস্থিতি ও তার প্রধানকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে—তাহলে এ মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত রহস্যময় দুর্ভেদ্য কুয়াশাজাল ছিন্ন হত? কিন্তু তা হবার নয়। তাও সে পারবে না।

এই পিতাকে সে ভালবাসে, পেয়ার করে। এই পিতার একদিকের কলিজায় যে মমতা আছে, সেখানে সে হাত বুলোয়। কিন্তু একদিকে যে শয়তানের কুটিল ঘৃণ্য ক্ষত সর্বদা দুর্গন্ধ নিয়ে সুগন্ধময় বাতাসকে দূষিত করছে,—কই তার বিরুদ্ধে তো পিতাকে কিছু বলতে পারে না? পিতার যখন শয়তানী মুখটি, ও তাঁর ক্ষুদ্রাকার চোখে ভয়ঙ্কর এক বিশ্রী মতলব তাঁকে আরও বিশ্রী করে তোলে, সে মুখও দেখেছে জেবুন্নিসা—কই পিতাকে তো সেই মুখের জন্য কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেনি! কেন করেনি? ভয়! হয়ত ভয়। পিতার রোষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি দুনিয়ার কোন মানুষের নেই—সম্রাট আলমগীরের কন্যার নেই তাতে আর আশ্চর্য কি? সম্রাট আলমগীর স্তুতি চান, তাই পেলে খুশী। কখনও প্রতিবাদের ভাষা শুনলেই ভাববেন—কন্যা তার বিদ্রোহিনী হবার মতলব আঁটছে? জেবুন্নিসা ভয় পায় না তার জন্যে। কিন্তু জীবনের দুঃখটা উপলব্ধির সময়—এতবড় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিতা হতে তার প্রাণে ব্যথা বাজে, তাই সে বেঁচে আছে। জাহানারা যেমন ইচ্ছে করে বন্দিনী জীবন নিয়ে পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ করে বন্দীর মানসিক অবস্থা উপভোগ করছেন—তেমনি জেবুন্নিসাও এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে থেকে মনুষ্যত্বের আর কত অবমাননা হতে পারে—তারই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নিয়ে দুঃখের বিরাট গভীরে নিমজ্জিত হয়ে আত্মসমর্পণ করছে।

কিন্তু এরই কি নাম অভিজ্ঞতা? হায়—এ যদি অভিজ্ঞতা হয় তাহলে পৃথিবীর আর কি অসম্ভব সংঘটন সাধিত হতে পারে—যা মানুষ সহ্য করে তবু স্পন্দন নিয়ে, অনুভূতি নিয়ে উপভোগের অভিজ্ঞতায় বেঁচে থাকে?

জেবুন্নিসা দরজার কাছ থেকে সরে এসে স্বল্পালোকে পালঙ্কের ওপর এসে বসল। বসে চুপি চুপি সে নিজের বক্ষের কৌমার্য্য উন্মোচন করল। তাঁর সেই ভরা যৌবনের প্রান্তঃসীমায় যতগুলি গোপন সম্পদ এতদিন রাজৈশ্বর্যের অপরূপ, মণির ছটায় আচ্ছাদিত ছিল তার মধ্যে স্বর্ণময় সুদৃশ্য একটি বাক্স থেকে একটি গোপনতার পুষ্পকোরক উন্মোচন করল।

আজ অবশ্য সে কথা বলার কোন অর্থ নেই। তবু রমণী তার বুভুক্ষু

অন্তরের জ্বালা বাইরে না বের করে দিতে পারলে তার মুক্তি নেই, তাই এই মুহূর্তে জেবুন্নিসা বের করে দিতে মনস্থ করল। কিন্তু জেবুন্নিসার সন্দেহ হয়—যে কথা নিজে ছাড়া পৃথিবীর একটিও ব্যক্তি জানে না, যা স্বর্গীয়, যা অপার্থিব—এমন কি আজ সুলতান শিকো শুনলে হয়ত দারুণভাবে হতচকিত হয়ে যাবে—হয়ত ঘৃণা করবে, কিম্বা শ্রদ্ধা করবে—আসলে যে কি মনে করবে জেবুন্নিসার নিজের চিন্তার বাইরে। সেই গোপন সম্পদটির খোঁজ কি পিতা ঔরঙ্গজেব পেয়েছেন? সেইজন্যে তিনি সুলতান শিকোর ওপর এত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন?

না-না এ সে কি আবোল-তাবোল ভাবছে! সুলতান শিকোকে দারা-চাচার মতই অপরূপ সুন্দর দেখতো। ছোটবেলা থেকে খেলার সাথী হিসাবে তার সঙ্গে খেলা করেছে। সম্রাট শাহ্‌জাহান নিজে সুন্দর ছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ গোলাপী ছিল। সুলতান শিকোর গাত্রবর্ণ গোলাপী। শুধু গোলাপী নয়, সুলতান শিকো যখন যৌবনের অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন —তখন তার সেই গোলাপী আভা থেকে সূর্যের মত প্রখর জ্যোতি বিকীরণ করল।

আজ ঔরঙ্গজেব তাকে হত্যা করছেন খুব সম্ভবত তার এই অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য। ঔরঙ্গজেব নিজে অসুন্দর, তাই তার সৌন্দর্যের প্রতি লোভ হওয়া স্বাভাবিক। লোভ থেকে আক্রোশের ইমারত। সেই আক্রোশেই সম্ভবত পপীর সরবৎ খাইয়ে বিষের তীব্র হলাহলে সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষ চুষে নিতে চান—আর সেইজন্যে তাঁর এই তীব্র আক্রমণ।

তাকেই একদিন মনে মনে ভীষণ ভাল লেগেছিল জেবুন্নিসার। অবশ্য সুলতান সে কথা কখনও ঘুণাক্ষরে টের পায়নি। ও এমন মরদ, হয়ত হা হা করে হাসতে হাসতে এসে জেবুন্নিসাকে বলত—কিরে শুনলুম নাকি তুই আমার সাথে মহব্বত করিস?' তারপর চোখ দুটিতে দুষ্টুমি ভরিয়ে বলত —'এই খবরদার, হুঁশিয়ার! আমি হলাম আসল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র পরভেজের বংশধর। আমার জন্যে জগতের সেরাসুন্দরী বেহেস্ত থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসছে।'

এসব কথা অবশ্য সুলতান বলেনি, তবে বলতে পারত, যদি শুনত জেবুন্নিসার গোপন কথাটি। সুলতান ঠিক এমনি উদাত্তস্বরে আলাপ করতে ভালবাসত। তার আলাপে ছোটবেলার সেইদিনগুলি বড় মধুর ছিল।

একদিকে দারা চাচা একদিকে সুলতান ও জাহানারা। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষের দিকে রাজবংশের অভ্যন্তরে এমনি প্রীতির সম্বন্ধ অনেকদিন ছিল।

তখন জেবুন্নিসা দাক্ষিণাত্যে। সংবাদ পেল সুলতান শিকোর শাদী। না-না সেদিন দুঃখ মনের মধ্যে জমা হয় নি! জেবুন্নিসা তো জানে সম্রাট আকবরের বিধানে তাদের শাদী হবে না। তবে মনে মনে এও কল্পনা ছিল, সুলতান শিকো যদি কখনও জানতে পেরে তাকে অধিকার করবার জন্যে সাম্রাজ্যের সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করে—তাহলে সম্রাট শাহজাহান কখনও বাঁধা দিয়ে এদের দুটিজীবনের আনন্দ নষ্ট করবেন না। কিন্তু সুলতান তো কোনদিনও জানতে পারল না? তাকে যে বলতে পারল না জেবুন্নিসা! কেমন করে বলবে? বলবে সুলতান ভাইজান আমি তোমার সাথে মহব্বত করি? তুমি আমায় গ্রহণ করে আমায় ইস্তেজার কর। ছি ছি কী লজ্জা? শেষকালে আওরৎ হয়ে আওরতের লজ্জাকে ত্যাগ করে বেহায়া হয়ে যাবে? চাইবে দয়িতের কাছ থেকে পেয়ার? আর দয়িত এসে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভরিয়ে দেবে আওরতের বুভুক্ষু আকাঙ্খা?

শুধু সেই লজ্জায় বলা হয় নি। বললে অবশ্য ক্ষতি কিছু হত না! অবশ্য একটু বেলেল্লাপনা প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু লাভ হত অনেকখানি। অন্তত আজকে বুক দিয়ে পড়ে সুলতান শিকোকে বাঁচাতে পারত। পিতা ঔরঙ্গজেব কন্যার জীবনের সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে নিতে গেলে একটু অন্তত ভাবতেন।

না-না এর নাম মহব্বত কি না জেবুন্নিসা জানে না। তবে প্রথম জীবনের প্রথম পুরুষ মুবারকের সেই স্পর্শানুভূতি যেমনি দিলে গিয়ে আলোড়ন জাগিয়েছিল; সকলের অজান্তে সুলতানকে মনের মধ্যে কল্পনা করে তার স্পর্শাতিরিক্ত অনুভূতি যে কতখানি তার একলা থাকার যন্ত্রণা মোচন করে ভাল লাগায় পূর্ণ করে দিয়েছিল—সে কথা কে জানে? যে কথা কোনদিনও কেউ জানে নি, আজ আর তার কোন গুরুত্ব নেই। যে কথা গোপনে আছে, সে কথা সেখানেই গাঁথা থাক্!

তবে একটি মানুষকে কি আজকের নবীন বাদশাহের কবল থেকে উদ্ধার করা যায় না? সুলতান দুনিয়া থেকে চলে গেলে সমস্ত দুনিয়া শূন্য হয়ে যাবে? নিঃস্ব হয়ে যাবে সব। সে থাকুক। বেঁচে থাকুক। অন্ততঃ তার অস্তিত্ব চিন্তা করে বাঁচবার নেশায় আরও কিছুকাল চলে যেতে পারে। কিন্তু এসব চিন্তা

অলীক, মিথ্যা। তাকে বাঁচানো—আল্লার ক্ষমতার বাইরে। জেবুন্নিসার দেহটা ঝাঁকি দিয়ে বার বার কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস বাইরে আছড়ে পড়ল। সম্বিৎ ফিরে এল যখন ইখ্তি এসে পাশে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বলল—মালেকা আপনি কাঁদছেন?

জেবুন্নিসা চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে বলল—এত দেরী হল কেন?

ইখ্তি বড় বড় চোখ করে বলল—আর একটু হলে বাদশাহের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। কে জানে—এত রাত্রে প্রাসাদে এত লোকের আমদানী হবে? জানলে আজ কিছুতে আবদুল্লা খাঁর কাছে যেতাম না।

জেবুন্নিসা আগে ইখ্তির জন্য দারুণ চিন্তিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার কথাতে কোন উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ হল না। শুধু নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করল—পেয়েছিলে শেখ আবদুল্লাকে?

মাথা নেড়ে ইখ্তি বলল—সে পেয়েছে। কিন্তু সে পাওয়ার মধ্যে যে তকলিফ পোয়াতে হয়েছে তার কথা চিন্তা করলে এখনও গা কাঁপছে। এই বলে ইখ্তি আদ্যোপান্ত ঘটনা তার মালেকার কাছে পেশ করল।

আবদুল্লার আস্তানায় গিয়ে তাকে পাওয়া যায় নি, খোঁজ করে প্রাসাদ উদ্যানে এসে দেখে—সেখানে বহু লোক। সবাই সৈনিকের বেশে দাঁড়িয়ে আছে একটি অশ্বের পিঠে কে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধকে ঘিরে, তার মাঝখানে নবীন বাদশাহ আলমগীর পাদীশাহ। বাদশাহের চোখ চারদিকে, আলো খুব বেশী চারদিকে ছিল না, অল্প আলোছায়ার মধ্যে কালো বোরখার ঘেরা-টোপে নিজেকে আচ্ছাদিত করে একটি থামের আড়ালে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্যানের আকস্মিক ঘটনা লক্ষ্য করছিলাম।

বোধ হয় থামের আড়াল থেকে নিজের অস্তিত্ব অল্প একটু বাইরে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—কে ওখানে? আবদুল্লা দেখ তো—কে ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাদের কার্য লক্ষ্য করছে?

আবদুল্লা কি বলল শুনতে পেলাম না, কিন্তু সে খুঁজতে এল না। বোধ হয় সে বাদশাহকে বোঝাল, এত বড় স্পর্দ্ধা কারও হবে না, যে বাদশাহের কর্মনীতি লক্ষ্য করতে নিজের জীবনপণ করে এখানে আসবে। সম্ভবত থামের আড়ালে কিছু নেই, থামের ছায়া পড়ার জন্য আপনার ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

এই ধরণের কোন কথা আবদুল্লা বলেছে কিনা জানি না। তবে আমি আর সেখানে অপেক্ষা না করে দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলাম। চিন্তা করলাম ফিরে যাই। কিন্তু এখন ফিরে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। ধরা পড়লে শুধু আমার সাজা হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার প্রতিও বাদশাহ পিতা বিরূপ হবেন। আর যে এত্তেলা আমাকে দিয়েছিলেন আবদুল্লাকে দিয়ে আগ্রাদুর্গের অধ্যক্ষ রদন্দাজ খাঁ বা খোজাবহ্‌লোলের কাছে পাঠিয়ে দিতে এবং তারা যাতে শাহজাদী জাহানারার কাছে পৌঁছে দেয়। শাহজাদা দারার কন্যা জানী বিবির জন্যে আপনার এই দরদ। একথা বাদশাহ হয়ত না বুঝে আপনার বিশ্বাসঘাতকতায় এক ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

এই সব ভেবেই আমি যাতে ধরা না পড়ি এমনি গোপনতা অবলম্বন করে আবদুল্লার আস্তানায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। এই কিছুক্ষণ আগে আপনার দেওয়া বাদশাহী নিশানা দেখিয়ে তার হাতে আপনার দেওয়া এত্তেলা সুদূর আগ্রাদুর্গে পৌঁছে দেবার জন্যে দিয়ে এলাম। এখন আর পথে কোন লোক নেই। শুধু এক খোজা আমার পিছু নিয়েছিল, কিন্তু আপনার নিশানা দেখাতে ছেড়ে চলে গেল। তারপর ইখ্‌তি বড় বড় চোখ করে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল—মালেকা, আপনি জানেন—ঐ অশ্বপিঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ আদমিটি কে?

শুনলাম প্রাসাদ ও হারেমের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে প্রত্যেক দরজায় প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং বাদশাহের আদেশ প্রচারিত হয়েছিল, কেউ যেন তার কক্ষের বাইরে না আসেন? তাই আমার মনে হয় কোন উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এখানে আনা হয়েছে। এবং সে সংবাদ গোপন রাখবার জন্যে এই আয়োজন।

হঠাৎ জেবুন্নিসা ইখ্‌তির কথায় বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বলল—রাত অনেক হয়েছে ইখ্‌তি। নিদ্ না আসে নিজের কক্ষে গিয়ে আরাম কর, অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করে বাদশাহের ক্ষোভের কারণ হয়ো না।

তাড়াতাড়ি ইখ্‌তি তার মালেকাকে সেলাম পেশ করে বিনয়ে বলল—মাপ করে দিন্ মালেকা! বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা করুন। এই বলে সে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত কক্ষ থেকে আর একবার সেলাম পেশ করে অদৃশ্য হল।

ইখ্‌তি চলে গেলে জেবুন্নিসা ক্লান্ত দেহটা নরম বিছানার ওপর গড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষযামে। প্রাসাদ অরণ্যে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। জেবুন্নিসা দু-একবার নিঃশব্দ হয়ে কান দিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল কিন্তু কোন শব্দ না। প্রাসাদ অরণ্যে সমস্ত শব্দ নিশ্চুপ হয়ে সম্পূর্ণ ধ্যানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। শুধু একটি শব্দ, অলিন্দ থেকে খোজা প্রহরীর প্রহরাকালীন পায়ের শব্দ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করছে।

জেবুন্নিসা ভাবছিল, সুলতান ভাইজানকে পিতা আজ কোথায় কয়েদ করে রাখলেন! নিশ্চয় আজই তাকে সলীমগড় কারাদুর্গে বা গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন নি। সলিমগড় বা গোয়ালিয়র দুর্গে যে আবদ্ধ করে রাখবেন একথা চিন্তা না করেই বলা যায়। ঐ দুটি ভীষণ কারাদুর্গ থেকে পালিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

জেবুন্নিসা দেখেছিল সলিমগড় দুর্গ। তার ভীষণতা সম্বন্ধে বিরাট একটা ধারণা তাকে সর্বদা সশঙ্কিত করত। গোয়ালিয়র দেখেনি, কিন্তু শুনেছে গোয়ালিয়র কারাদুর্গ নাকি সলিমগড় দুর্গের চেয়েও আরও ভীষণ। শাহজাদা দারা ছিলেন সলিমগড় দুর্গে, মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে।

জেবুন্নিসার চোখের ওপর সলিমগড় দুর্গ ভেসে উঠল। যমুনার মধ্যবর্তী এক দ্বীপে শেরশাহের পুত্র সলিমান্‌ বা সেলীমশাহ নির্মাণ করেছিলেন। জানা যায়—পূর্বে এই দুর্গ নূরদ্দীন জাহাঙ্গীর বাদশাহের নির্মিত একটি সেতুর দ্বারা দিল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। মোগল শাসনকালে রাজবন্দীদের আবদ্ধ করে রাখবার কাজেই এই দুর্গ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। দুর্গের পরিখা এত উঁচু যে সেই দুর্গের অভ্যন্তরের কোন কিছুই দেখা যেত না। এক আকাশ উঁচু পরিখার মধ্যে দুর্গের ভেতরে পাথরের উঁচু খিলানের ছোট ছোট কক্ষ। সেই কক্ষের মধ্যে মাত্র একটি ছোট্ট ফোকর ছাড়া কোন আলো বাইরে থেকে ভেতরে যেত না। গোয়ালিয়র দুর্গ নাকি এক পর্বতের সন্নিবিষ্ট ছিল।

জেবুন্নিসা খুব দ্রুত পালঙ্ক থেকে উঠে একখানি কালো কাপড়ে সারা-শরীরটা ঢেকে নিয়ে মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। কোথায় যাচ্ছে জেবুন্নিসা এত রাত্রে? খোজা প্রহরীর জিজ্ঞাসাতে কি ফিসফিস করে বলল বোঝা গেল না কিন্তু সে দ্রুত অলিন্দের পর অলিন্দে অল্প

আলো ছায়ার মধ্যে দিয়ে টপ্‌কাতে লাগল। চলতে চলতে জেবুন্নিসা চিন্তা করল—পিতা কি এখনও এতরাত্রে জেগে আছেন? না তাঁর কোন মহিষীর কক্ষে রাত্রির শেষপ্রহর বিশ্রামের জন্যে প্রবেশ করেছেন? অবশ্য এ সময় নিজের কক্ষত্যাগ করে নতুন মহিষী খাব্‌সুরত উদিপুরী বেগমের কক্ষে ছাড়া আর কোথাও তিনি যাবেন না। কিন্তু পিতাকে নিজের কক্ষে না পাওয়া গেলে সে উদিপুরী বেগমের কক্ষে যাবে না। কারণ এখনও এই বহু ভাগ্যবতী রমণীর সাথে তার আলাপ জমেনি। শুধু একদিন পিতা ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

তবে এসময় কোন অজুহাতেই পিতার বিরক্তি উৎপাদন করতে সে উদিপুরীর কক্ষে যেতে পারে না, যদিও তার সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকত।

ভাবতে ভাবতে কখন সে বাদশাহের কক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হল, বুঝতে পারল না। কিন্তু বাদশাহের কক্ষে ঢোকবার পূর্বমুহূর্তে চৈতন্য হল—সে হঠাৎ এতরাত্রে বাদশাহের কাছে এল কেন? শাহজাদা সুলতান শিকোর মুক্তি কি তিনি তাঁর কন্যার প্রার্থনাতেই মঞ্জুর করবেন? এত সহজ, সরল মন নিয়ে আজকের বাদশাহ তাঁর সিংহাসনে আসীন হন নি।

তাহলে এল কেন? প্রার্থনা পেশ করতে? না কৈফিয়ৎ চাইতে! এল কেন জেবুন্নিসা নিজেও জানে না। মনে হল, পিতার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা করলে বুঝি কোন সর্বনাশের মুহূর্ত থেকে দুনিয়া রেহাই পাবে। সুলতান শুকো বাঁচবে কিনা সে জানে না, কিন্তু একটা অমঙ্গল সঙ্কেত নিস্তব্ধ মুহূর্তে জেবুন্নিসার কানে কানে ফিসফিসিয়ে তাকে টেনে ঘরের বের করে দিল।

সামনে খোজা প্রহরী তরবারী উন্মোচন করে বাদশাহের কক্ষের দ্বার পাহারা দিচ্ছে। জেবুন্নিসা পিতার সংবাদ জিজ্ঞেস করলে প্রহরী বলল—বাদশাহ নয়া বেগমের কক্ষে গিয়েছেন।

জেবুন্নিসা নিজের অনুমান সত্যে পরিণত হতে নিশ্চিন্ত হয়ে পিতার কক্ষপথ পরিত্যাগ করে অন্যপথ ধরল। এবার তার অভিযান-কোথায় বোঝা গেল না, কিন্তু অন্ধকার পথ ধরে একা মাথার অবগুণ্ঠন আরো খানিকটা টেনে দিয়ে সে প্রাসাদ ও হারামের একটি সরু সর্পিল অন্ধকার পথ ধরল, যে পথ দিয়ে প্রাসাদ কারাকক্ষ থেকে বন্দীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে ঘাতকেরা নিয়ে আসে। এইপথে বন্দীদের ছিন্নমুণ্ডের কত রক্ত মাটির বুকে শুকিয়ে আছে

কে জানে? মাঝে মাঝে শকুনেরা এই পথে আনাগোনা করে। প্রহরীরা সেই শকুনদের তাড়াতে তোপ দেগে ভয় উৎপাদন করে।

এখান দিয়ে বন্দীকক্ষে যেতে গেলে সামনে একটি বাঁধানো বড় দীঘি। অনেকে বলে যমুনার চোরা স্রোতধারা এই দীঘির গহ্বর পূর্ণ করেছে। এই দীঘির চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ সাইপ্রাস বৃক্ষের বনভূমি। সুপারি বৃক্ষের সারি দীঘির জলের ওপর ছায়া ফেলেছে। একটি পুষ্পোদ্যানের পাশ দিয়ে অন্ধকার কেটে কেটে জেবুন্নিসা দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। হাওয়ায় তার ওড়নার প্রান্তভাগ উড়তে লাগল।

তবে কি জেবুন্নিসা চলেছে—সুলতান শিকোকে কারাকক্ষ থেকে মুক্তি দিতে? হ্যাঁ, মুক্তিই সে দিতে চায়। একটা সাংঘাতিক দুঃসাহস প্রকাশ করার সমস্ত প্রবৃত্তি হঠাৎ তাকে একা এই দুর্ভেদ্য অন্ধকার পথে টেনে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। একদিন অপরিণত মনের দুর্বল মুহূর্তে পিতা নৃশংসতা প্রকাশ করে মুবারককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, আজ সেই মুবারকের অতৃপ্ত আত্মাই তাকে এই রাতের কোলে সম্পূর্ণ দুঃসাহসিনী হতে সাহায্য করেছে। সুলতান শিকোকে মুক্তি না দিয়ে তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে না রাখলে জেবুন্নিসার বাঁচার কোন সার্থকতা নেই। অন্তত সুলতান বেঁচে থাকুক, সে মরে যাক্। হয়ত কেন ঠিকই—পিতা কাল যখন শুনবেন—এ কাজ কে করেছে? তখন কন্যার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে যে এতটুকু দ্বিধা করবেন না, সে বেশ ভাল করেই জানে জেবুন্নিসা। আর কন্যাকে যে পেয়ার করেন বলে সকলে জানে সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সাম্রাজ্যের বিচারে কন্যার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তবু ভাল। তবু সে মৃত্যুতে সম্পূর্ণ সুখ প্রাণের মধ্যে আনন্দ দান করবে।

হঠাৎ জেবুন্নিসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। হারেমের অভ্যন্তর থেকে অনেকগুলি রমণীর কান্নার রোল জেবুন্নিসাকে চমকে দিল। সে মুহূর্তে পথ পরিবর্তন করে হারেমের পথে ছুটল। পিছনের অন্ধকারের হিলহিলে বাহুর আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে যে পথ দিয়ে সে এসেছিল আবার সেই পথেই হারেমের দিকে চলল। চলতে চলতেই বিস্ময়ে ভাবল—কী দুঃসংবাদ এই গভীর নিশুতি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে হারেমের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল! নবাব বাই কী পুত্রের বন্দীত্বের জন্যে নিজের জীবন নষ্ট করলেন? না, রোশো-নারা নিজের হাতেই জানী বেগমের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে বড় ভাইজানের

শেষচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিলেন? কোন দুর্ঘটনা কি সংঘটিত হতে পারে? তবে রোশোনারা অতটা সাহস করবেন না, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এখন প্রাসাদে আছেন, তার বিনানুমতিতে জানীর সর্বনাশ করলে বাদশাহ কখনও ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু যদি বাদশাহ নিজেই চক্রান্ত করে তাঁর বহিনকে দিয়ে জানীকে শেষ করিয়ে বহিনের ওপর কলঙ্ক আরোপের ফন্দী এঁটে থাকেন—তাহলে আজকের এই গভীর রাত্রে এই কান্না ও চীৎকারের কোন অর্থ হয়। এ ধরনের কাজ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবেরই কৌশল। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে জানীর জন্যে হারেমে কাঁদবার লোক কে আছে? মনে হচ্ছে অনেকগুলি রমণী ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কবর প্রাপ্তব্য কোন আত্মার পুনঃজীবন কামনা করছে।

কিন্তু সুলতান শিকোকে তো মুক্ত করা হল না? তার জীবনের মুক্তি হলে যে জেবুন্নিসার নিজের জীবনের আনন্দ সংযোজিত হত। যাচ্ছিল সেই মুক্তির জন্যে। যাচ্ছিল একটা দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করতে। ছিল তখন সে চেতনার পাতাল-গহ্বরে। কিন্তু আল্লার অভিপ্রেত নয় বোধহয়, সুলতান শিকোর প্রাণ বাঁচুক, জেবুন্নিসার দুঃসাহসিকতা প্রকাশ হোক—দুনিয়ার লোক জানুক—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে দুনিয়াতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু কিছুই হল না, সুলতান শিকো মুক্তি পেল না। জেবুন্নিসার স্বপ্নময় চেতনা অপসারিত হল। হঠাৎ হারেমের ঐ রমণীদের চীৎকার তার এই নৈশাভিযান স্তব্ধ করে দিল।

অন্তঃপুরে কক্ষের দ্বারে গিয়ে যখন সে দাঁড়াল তখন সেখানে অনেক রমণীর ভীড়। নিবানো বর্তিকাধারে দীপালোর রোশনাই আবার চারদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কয়েকটি বাঁদী ও খোজার সঙ্গে দেখা হল জেবুন্নিসার। তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা জাগল তার, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে সে আরো গভীরে ঢুকে গেল অন্তঃপুরের।

যে কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ আসছিল, সেই কক্ষের সামনে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। জেবুন্নিসা জানে, এই কক্ষটি বদরউন্নিসার। বদরউন্নিসা তার বহিন কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার জন্মাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও সে শয্যার মেদুর স্পর্শ থেকে অব্যাহতি পায় নি। দিনরাত রোগের যন্ত্রণায় গোঙানি ছাড়া তার দ্বিতীয় কথা কেউ শুনতে পায় নি। কিন্তু আসলে রোগটা

যে কি—কেউ জানে না। সে জন্মাবার পরই এই শয্যার কোলে শুয়েছে, আজ পর্যন্ত এই শয্যার কোলেই শুয়ে আছে। আশ্চর্য জীবন এই বদরউন্নিসার। অন্তত এই জীবনের ওপর দিয়ে কম করে আঠারোটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। যৌবন তার জীবনে আসে নি, শৈশব ও কৈশোর কবে এসেছিল তাও কেউ জানে না। শুধু বৃদ্ধার মত লোলচর্ম, কুঞ্চিত মুখাকৃতি, কি বীভৎস দর্শন চেহারা। একটি মূল্যবান দর্শনের জন্য বদর এতদিন বেঁচেছিল সে হল তার দুটি চোখ। ইতিহাসকার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বদরের সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারেন নি। না বলতে পারার কারণই হল এই। বদরের কর্মহীন স্থবির জীবনের বছরগুলি শুধু তিক্ত অবহেলায়ই নিঃশেষিত হয়েছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব বাদশাহী তখত পাবার আগে বহুবার বদরের এই অভিশপ্ত জীবন শেষ করে দিতে গেছেন কিন্তু তার ঐ চোখ দুটি কোমল মায়ার স্বর্গ রচনা করে পিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

জেবুন্নিসা কখনও এই ভগ্নীর কাছে আসে নি। তার পালিতা আম্মাজান মিয়াবাই এই ভগ্নার রোগের পরিচর্যা করতেন। আর ছিল এক চিরকালের জন্য ইহুদী ধাত্রী। সেই মিয়াবাইয়ের কাছ থেকেই শুনেছে জেবুন্নিসা, তার বহিন্ বদরের বীভৎস মুখের ওপর ঐ চোখ দুটি আল্লা সৃষ্টি করে আরও যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করেছেন।

জেবুন্নিসা কক্ষের জোরালো আলোর মধ্যে দেখল, বদর তার চিরপরিচিত পালঙ্কে শুয়ে আছে, সারা দেহের ওপর ঢাকা দেওয়া একটি শুভ্র মসলিনের রেশমী চাদর। সেই ভীষণাকৃতি মুখ ও সুন্দর চোখ দুটি চাদরের তলায়। এ চাদর ঢাকা দেওয়া হয়েছে কেন—তাও বুঝল জেবুন্নিসা। কক্ষের মেজেতে মিয়াবাই বসে বসে চোখে ওড়না গুঁজে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। আর কাঁদছে জিনৎ, তার সন্ন্যাসিনী বহিন। তার দিলে মায়ার স্রোত বেশি। সে পশু-পক্ষী মরে গেলেও কাঁদে! আরো অনেকে আছে। বহিনেরা সবাই আছে। আপন আম্মাজান দিলরসবানু একপাশে থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! কিন্তু জেবুন্নিসা আর একজনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, শাহাজাদী রোশো-নারা মিয়াবাইয়ের মত সোচ্চারে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। রোশোনারার কান্না দেখে জেবুন্নিসা অবাক হয়ে গেল। এই রমণী আজ হঠাৎ কান্নার ভারে ভেঙে পড়ে কি প্রকাশ করতে চাইছেন? তবে কি তিনি সম্রাট ভাইজানের করুণা পাবার জন্যে এই চাতুরীর সাহায্য নিয়েছেন? কন্যাদের প্রতি

স্নেহ প্রদর্শন করে তিনি বাদশাহকে দেখাতে চান—আমি বাদশাহের একান্ত বন্ধু।

জেবুন্নিসা দাঁত দিয়ে একবার তার রক্তাক্ত গোলাপী ঠোঁটটি কামড়ে ধরল। তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার ভাবতে লাগল—এখানে কি তার কাঁদা উচিৎ? না কাঁদাটা অশোভন। তার ভগ্নীর মৃত্যু ঘটেছে। তার কাঁদাটাই শোভা পায়। কিন্তু সে কাঁদবে কেমন করে? কান্না তো আসে না। বুকের ভেতর তো মোচড় দেয় না। চোখের দুই কোণে জল কোথায়? সম্পূর্ণ শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ ধরিত্রীর মত শুষ্ক চোখের কোণ দুটি। জেবুন্নিসা কক্ষের মধ্যে না ঢুকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত বোনের জন্য কান্নার চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ভাবল—হয়ত ইহজীবনে যে বহিনকে সে কোনদিন ভাল করে দেখেনি, শুধু একটি বিস্ময় ছাড়া যে বহিনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অন্তরালে ছিল তার জন্য হাজার চেষ্টা করলেও কান্না তার আসবে না। তাই সে আস্তে আস্তে কক্ষের সামনে থেকে সরে গেল।

কক্ষের বাইরে একটু দূরে একটি খিলানের পাশে কটি বাঁদী নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে আলাপ করছিল হঠাৎ জেবুন্নিসার কানে দু একটি কথার টুকরো যেতে সে দাঁড়াল। শুনতে পেল ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—ইহুদী ধাত্রীই বদরকে বিষ খাইয়েছে, আর পর্তুগীজ বাঁদী জুলিয়া সম্রাট বাদশাহের কাছ থেকে বিষ এনে ইহুদী ধাত্রীকে দিয়েছিল। সম্রাট বাদশাহ চেয়েছিলেন তাঁর এই অভিশপ্ত কন্যার মৃত্যু।

জেবুন্নিসা সেখান থেকে সরে গিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল—এ বংশের উৎপত্তির ইতিহাস। এ বংশ লুপ্ত হয়ে যাবার সময় তার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে করবে? কী প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত করলে এই বংশের কথা ঐতিহাসিক হয়ে ভাবিকালের দুনিয়ার মানুষকে শিহরণ হতে মুক্তি দেবে? একদিন সে এমনি সম্রাট আকবরের সৃষ্টি ফতেপুর শিক্রীতে গিয়েছিল। কি একটা কারণের জন্য মনটা তার বিষাদ হয়েছিল, তাই তৈমুর বংশধরদের রক্ত-পদচিহ্ন রেখার বিষয় চিন্তা করেছিল।

বহু শতাব্দী পূর্বে মহম্মদ তুখলক্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর নৃশংস কার্যের দ্বারা প্রজার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ তুখলকের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের কথা ভেবে ফিরুজশাহ মহম্মদ তুখলকের নির্যাতিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তাদের দ্বারা

একটি মার্জনা পত্র লিখিয়েছিলেন। সেই পত্র তিনি মক্কায় মহম্মদের সমাধি মন্দিরের গম্বুজের পার্শ্বে রেখে দিয়েছিলেন। শেষ বিচারের দিনে অত্যাচারী-দের মার্জনাপত্র হয়ত আল্লাহর যাচ্ঞা করবেন।···তেমনি তৈমুরের মৃত্যুর পূর্বে মহম্মদের বংশধর আল্‌বরোকীকে তাঁর সঙ্গে কবর দিতে আদেশ করেছিলেন, কারণ শেষ বিচারের দিনে আল্‌বরোকী মহম্মদের কাছে তৈমুরের মঙ্গলের জন্য যাচ্ঞা করবেন। আল্‌বরোকীকে তৈমুরের সঙ্গে কবর দিয়ে এক সঙ্গে বস্ত্র দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবও কী তাঁর পাপের জন্য কোন দিন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্য এগিয়ে আসবেন না? রাজ্যলাভের আশায় রক্তপাত বন্ধ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে মোল্লার পোষাক পরে মক্কার পথে এগিয়ে যাবেন না?

বোধ হয় সে চিন্তা করা নিরর্থক মাত্র। ঔরঙ্গজেবের বক্ষের একদিকের সমস্ত ভাগটাই শয়তানের কলিজার মত—আর একদিকের অল্প অংশে যে মমতার ভাগ আছে তা মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে বটে কিন্তু তা চোখে পড়ে না। তাই জেবুন্নিসার দৃঢ়বিশ্বাস—পিতা কোনদিনও নিষ্ঠুর মনের গণ্ডির বাইরে এসে মোল্লার মত দরবেশের পোষাক পরে জীবনকে আল্লার পায়ে সঁপে দেবেন না!

তিন চারদিন পরে।

একদিন বাদশাহের লোক এসে জেবুন্নিসাকে জানাল—সম্রাট বাদশাহ আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

জেবুন্নিসা এ কদিন বাদশাহের কাছে যায়নি এবং বাদশাহও কোন কারণে কন্যাকে ডাকতে পাঠান নি। জেবুন্নিসা যায়নি তার কারণ ছিল। তার মনের মধ্যে পিতার ওপর অভিমান হয়েছিল। সেদিনের রাত্রির পর সেই যে সে তার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এই কদিন সেই কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা অচেতন ভাবের মধ্যে বিভোর ছিল। আজ তাই পিতা ডাকতে সে চমকে উঠল।

কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এ কদিন কেন কন্যাকে ডাকেন নি, তার রহস্য জানা যায় নি। তবে আনুমানিকভাবে বলা যায়, এ-কদিন হারেম ও প্রাসাদের মহলে মহলে মৃত্যু-শূণ্যতা ঘুরে ফিরে সকলকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

বাদশাহও বোধ হয় এই স্তব্ধতার মধ্যে আন্দোলন জাগাতে সাহসী না হয়ে চুপ করে ছিলেন।

বদরউন্নিসা মরে গেছে তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে তার মৃত্যুকে বরণ মহলে মহলে আওরতদের প্রাণে দারুণভাবে আন্দোলন জাগিয়েছিল। বদরউন্নিসার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই কিছু জানত না। একটি নির্জীব প্রাণীর প্রাণের ধুক্‌ধুকুনিটুকু আছে কি নেই তার চিন্তা করার শক্তি বেগমমহলের কারো ছিল না। তাঁরা আপন প্রাণের নিশানা জাগিয়ে মহলের প্রাণস্পন্দন বজায় রাখার তালেই সবসময় ব্যস্ত।

হঠাৎ যদি কোন মহলের কোন বাঁদী বা বেগম চীৎকার করে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহলে দারোগা খোজারা সন্ত্রস্ত হয়ে হুঙ্কারধ্বনি প্রকাশ করে-মহলের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলে 'হুসিয়ার' বলে ওঠে, তখন মহলের পাশে মহলের প্রাণে কলরব উঠে দারুণ একটা আন্দোলন জেগে ওঠে, তারপর কিন্তু সব স্তব্ধ; আবার সেই প্রত্যহের কাজ সমানতালে ঠিকসময় সমাধা হয়ে যায়, কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয় না।

মাঝে মাঝে অবশ্য মাসোহারা নিয়ে বেগমমহলের বেগমরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কেউ তাঁর অঙ্গ সঙ্কোচনে প্রতিবাদ জানান, কারও আবার মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেল কেন—সে সম্বন্ধে জানতে গিয়ে জানতে পারেন, বাদশাহ তাঁর রূপযৌবনের প্রতি আর আকৃষ্ট নন বলেই তাঁর মাসোহারা একেবারে নীচে নেমে গেছে। এরজন্যে মাঝে মাঝে ক্রন্দনের শব্দ অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত হত কিন্তু তার স্থায়িত্ব খুব বেশীক্ষণ নয়।

জেবুন্নিসা গিয়ে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বলল—সেলাম আলেকম্ জাঁহাপনা!

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আজ খুব উৎফুল্ল ছিলেন। তাঁর মুখে ছিল না হাসির দ্যুতি। কিন্তু মুখখানি প্রশান্তিতে পূর্ণ ছিল। কন্যা সেলাম জানাতে তাই প্রত্যুত্তরে বাদশাহী সেলাম পেশ করে কন্যাকে পাল্‌টা জিজ্ঞেস করলেন—বেটি, তবিয়ৎ আচ্ছা আছে তো?

জেবুন্নিসা মাথা নাড়তে বাদশাহ আবার বললেন—আজ তোমাকে ডেকেছি কেন বলতে পার?

জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বরে বলল—না জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব বোধ হয় সে কথা শুনতে পেলেন না, নিজের মনেই বলে উঠলেন—বেগম সাহিব জাহানারা আজ আমাকে এত্তেলা পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানের বাদশাহের কাছে ভিক্ষা চান দারার কন্যা জানীকে। তারপর কন্যার দিকে ফিরে বললেন—আমি ঠিক করেছি বেটি, জানিকে বেগম সাহিবের কাছেই পাঠিয়ে দেব। জানীর যে কোন অপরাধ নেই আমি উপলব্ধি করেছি। তাছাড়া শাহজাদী রোশোনারা জানীর ওপর বড়ই অত্যাচার করছেন। বেগম সাহিব জাহানারার সম্মানরক্ষার্থে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত, তোমার অভিপ্রায় শোনার জন্যে আমি তোমাকে ডেকেছি।

জেবুন্নিসা মনে মনে দারুণ হিম হয়ে গেল। তবে কী বাদশাহ পিতা জাহানারার কাছে তার গোপন এত্তেলা পাঠানোর কোন সন্ধান পেয়েছেন? না পেলে তাকেই বা হঠাৎ ডেকে এবিষয়ে জানতে চাইছেন কেন? মনে মনে তাই কাঁপতে লাগল জেবুন্নিসা। পিতা যদি তার গোপন কৌশল জেনে থাকেন, তাহলে তার চরমশাস্তি ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ঔরঙ্গজেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—আমি তোমার সম্মতি চাইছি এই-জন্যে যে, ভবিষ্যতে তুমিই হবে আমার অন্তঃপুরের কর্ত্রী। তোমার সম্মতি ব্যতিরেকে আমি অন্তঃপুরের কোন কাজ করতে চাই না বলে তাই তোমার সম্মতির অপেক্ষায় আছি। তাছাড়া বেগম সাহিব জাহানারার সম্মান আমি দিতে চাই। আমার সে বহিন্ মোগল রাজবংশের গৌরব। ভাইদের সঙ্গে সংঘর্ষে, পিতার সঙ্গে বিবাদে আমি তাঁর যথেষ্ট অসম্মান করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তও করতে চাই।

একটা কথা জেবুন্নিসার সেই মুহূর্তে মনে হল, বেগম সাহিব একদিন 'নূরমঞ্জিল' শিবিরে এসে ভ্রাতার দ্বারা যথেষ্ট অপমানিতা হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন; সেদিন ভগিনীর অভ্যর্থনায় যে ত্রুটী হয়েছিল মনে হয় তার জন্যই এই প্রায়শ্চিত্ত। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের সহোদরা-প্রীতি চিরদিন অবাধেই প্রবাহিত।

জেবুন্নিসা পিতার কথার প্রত্যুত্তর দিল—বেগমসাহিবের কাছে জানীকে পাঠিয়ে দিন বাবা। বেগমসাহিব জানীকে যথেষ্ট পেয়ার করেন, জানী সেখানে ভাল থাকবে।

কিন্তু জেবুন্নিসার কথায় ঔরঙ্গজেব খুসী হলেন না, হঠাৎ কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললেন—জানীর ভাল থাকার জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

আমি শুধু বেগমসাহিবকে খুশী করে পিতার ক্ষমা পেতে চাই। সম্রাট শাহজাহানের কাছে আমি একাধিকবার এত্তেলা পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়েছি, তুমি হয়ত জান না, আমি এর মধ্যে দুবার আগ্রায় গিয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করতে গেছি, কিন্তু পিতা বর্তমানের বাদশাহকে সম্মান না করে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পিতার এ অহমিকা অসহ্য!

জগতের সমস্ত লোক আমার দুর্ণামে পৃথিবী বিষাক্ত করে তুলবে, কিন্তু তামাম হিন্দুস্তানের লোকও কি জানে না, পিতা আমার ওপর চিরকাল কিরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে আসছেন? আমি চাই পিতার আশীর্বাদ। আমি চাই পিতার ধনরত্ন। যা তিনি তিল তিল করে এই চল্লিশ বছর রাজত্বে সঞ্চিত করে রেখেছেন?...কিন্তু তিনি কিছুই দিতে চান না। অহমিকার উচ্চস্তম্ভে বসে এখনও মনে করেন তিনি, ময়ূর সিংহাসনের সুকোমল গুম্ভে বুঝি আরোহণ করে আছেন!

অথচ দুনিয়ার সবাই যখন আমার নৃশংসতার বিচারে আত্মবিস্মৃত হয়েছে তখন স্বয়ং পিতার সমস্ত স্বাধীনতা দান করে আমি আমার মমতার নিদর্শন পেশ করেছি। অধ্যক্ষ রদন্দাজ খাঁ-কে নির্দেশ দিয়ে এসেছি, সম্রাট পিতার প্রত্যহ যা প্রয়োজন হবে তাই যেন তাঁকে দেওয়া হয়। শুনলাম, তিনি প্রত্যহ একটি করে সুন্দর ঘোড়া অধ্যক্ষের কাছ থেকে চান। আমি তাঁকে তাই দেবার জন্যে হুকুম করেছি। নপুংসক মুতমদের অত্যাচার ও অবিচারে লজ্জিত হয়ে তার বিচার করেছি, আজীবন কারাবাস। এত করেও নিষ্ঠুর পিতার মনের নাগাল পাই নি।

আমি শুধু পিতাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি আমার অন্য কোন ভাই সিংহাসনে আরোহণ করত, তাহলে তারা কি পিতার ওপর আমার চেয়ে আরো লঘু ব্যবস্থার আয়োজন করত? তার সাক্ষী, দারা সম্রাট পিতার অসুখের অজুহাতেই প্রজাদের ঘোষণা করে দিয়েছিল—'সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু ঘটেছে'।

হঠাৎ ঔরঙ্গজেব কন্যার দিকে ফিরে বললেন—বেটি, হৃদয়ের বিচারে আমি হয়ত অনেক অন্যায় করেছি, কিন্তু আল্লাহর বিচারে কী আমার কোন অপরাধ আছে? পিতার এই অবহেলার জন্য আরো কতকগুলি প্রাণ আবার নিঃশেষ হয়ে যাবে—আমার নৃশংসতা দুনিয়ার ইতিহাসে একটা জলন্ত নিদর্শন রেখে যাক্—এই আমি চাই। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমার পিতার অবহেলাই

যে দায়ী, পুত্রের অপরাধের সম্পূর্ণ দোষ পিতারই প্রাপ্য, একথাও সপ্রমাণিত হয়ে থাকবে। তাই আমার এই বুভুক্ষু অন্তরের জ্বালায় মাঝে মাঝে প্রলেপ দিতে তোমার মত বুদ্ধিমতী কন্যার সাহায্য চাই। আশাকরি তোমার ঘৃণা আমাকে উত্তেজিত করবে না। তোমার সান্ত্বনা আমাকে বাঁচবার রসদ যোগাবে।

ঔরঙ্গজেব বলতে বলতে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ জেবুন্নিসা পিতাকে বাধা দিয়ে বলল—জাঁহাপনা, গোস্তাফি মাপ করে একটু অপেক্ষা করুন, আমার একটি আর্জি পেশ করবার আছে।

ঔরঙ্গজেব শান্তদৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন—পেশ কর বেটি।

কিন্তু জেবুন্নিসা ইতস্তত করতে লাগল। বলবে কি বলবে না, তার সংশয়ে তার সময় অতিবাহিত হতে লাগল। ভাবল, পিতা আর্জিটি ভাল মনে গ্রহণ করবেন না তার প্রমাণ—আর্জিটি খুব সাধারণ না। তাছাড়া তার সমস্ত আক্রোশ এখন সুলতান শিকোর ওপর। তাকে ক্ষমা করলে সে ঠিক পিতৃদ্রোহীকে আক্রমণ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। এই সুলতানকে পিতা ধরে আনতে কম মেহনৎ করেন নি। জলে, স্থলে, পর্বতে, অরণ্যে চারদিকে সৈন্য পাঠিয়ে শেষে গাড়োয়ালের হিন্দু রাজার আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। তার মুক্তি চাইলে পিতার ক্রোধাগ্নি কীরকমভাবে প্রজ্বলিত হবে সেই কথা ভেবে জেবুন্নিসা ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় কি? যদি পিতা ক্রোধবশেই সুলতানের মুক্তি ঘোষণা করেন তাহলেও লাভ। কিন্তু এখন কিরূপে এই আর্জি পেশ করবে সেই ভেবে জেবুন্নিসা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাছাড়া হঠাৎ তার রমণীমনের লজ্জা এসে দুইকর্ণমূলে রক্তিমাভা ছড়িয়ে দিল।

ঔরঙ্গজেব কন্যার কাছে সরে এসে সস্নেহে তার পিঠে হস্ত স্থাপন করে বললেন—নির্ভয়ে পেশ কর বেটি, যদি আমার অসাধ্য না হয় তাহলে নিশ্চয় মঞ্জুর করব।

জেবুন্নিসা নিম্নস্বরে বলল—ভয় লাগে জাঁহাপনা, জানিনা কোনটা সাম্রাজ্যের অন্যায়, আর কোনটা সাম্রাজ্যের অনুকূলে—তাই প্রতিটি আর্জিই পেশ করতে ভয় পাই।

ঔরঙ্গজেব কন্যার কথায় মৃদু হেসে বললেন—তুমি তো কোরাণের সমস্ত

অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করে হৃদয়ঙ্গম করেছ, আল্লার অভিপ্রেতই যে সাম্রাজ্যের মঙ্গল সে নিশ্চয় জান। ইসলামধর্মকে শক্তিশালী করতে হৃদয়ের মমতার বিশেষ মূল্য দিও না। সমস্ত কিছুই সেই মেহেরবান খোদার উদ্দেশ্যে সঁপে দাও—তাহলে শান্তি পাবে। এখন বল, সে আর্জি কি?

হঠাৎ জেবুন্নিসা কাতরস্বরে বলে ফেলল —আমি সুলতান শিকোর মুক্তি চাই পিতা।

ঔরঙ্গজেব কিন্তু চমকালেন না, বা ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, শুধু চোখ ছোট করে বললেন—প্রয়োজন!

জেবুন্নিসা আর উত্তর যোগাতে পারল না। সত্যিই তো, প্রয়োজন তার কি? সুলতান শিকো মুক্তি পেলে অন্য জায়গায় চলে যাবে। সেখানে গিয়ে কোন দেশীয় রাজার সাহায্য নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করবে। তারপর একদিন দিল্লী আক্রমণ করে চাচার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—তারপর যদি চাচাকে পরাজিত করতে পারে, সিংহাসনে আরোহণ করবে। তখন চাচার পরিবারবর্গ তার কাছে অবহেলিত। সেদিন জেবুন্নিসারই বা কি বিচার করবে ভাইজান সুলতান শিকো?······জেবুন্নিসা যদি তার গোপন প্রেম প্রকাশ করে, তাহলে হয়ত হাঃ হাঃ করে হেসে ভাইজান সুলতান শিকো বলবে—'বাঃ বেশ ফন্দী ফেঁদেছ তো রমণী, উপযুক্ত পিতারই কন্যা তুমি। কিন্তু ঐ জালে তো সুলতান শিকো ধরা পড়বে না! যে চাচা পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, সেই হত্যাকারীর কন্যার মহব্বত আমি প্রাণ থাকতে গ্রহণ করতে পারব না।'

তখন আজকের নজীর তুললেও সে বিশ্বাস করবে না, সত্য সত্যই জেবুন্নিসা তাকে গোপনে মহব্বত দান করেছিল। তাই পিতার কথায় জেবুন্নিসা কোন উত্তরই পেশ করতে পারল না। শুধু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঔরঙ্গজেব তাই দেখে অলক্ষ্যে একটু হাসলেন, তারপর বললেন—বলেছি তো, হৃদয়ের মমতার কোন মূল্য দিও না জেব্। ওর মত শয়তান বস্তু পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা জানা নেই।······আমি তোমার মধ্যে আমার ছায়াই সবসময় দেখতে চাই। তুমি নিজেকে সেইরকমভাবে গড়বার চেষ্টা কর।

বলতে বলতে ঔরঙ্গজেব কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন। আর জেবুন্নিসা কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। আওরং

আওরৎই। তার সাহস মরদের কাছে কণা মাত্র। রাজ্যের দুর্বলতা এসে কেন যে জড়ো হয়ে তাকে কমজোরী করে দিল কে জানে? সুলতান শিকোর মুক্তির জন্য পিতার কাছে আর্জি পেশ করতে গিয়ে ধূর্ত পিতার স্তুতির সামনে তার সব সংযম ভেসে গেল। বাদশাহ পিতা কি বুঝলেন, কে জানে?

অথচ সে লজ্জা ত্যাগ করে অর্ধেক কথা ব্যক্ত করে বাকীটা মুখ দিয়ে বের করতে পারল না। একটি রমণী তার মনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে দুনিয়াতে কত অসাধ্য সাধন করেছে। লয়লী-মজনুর মহব্বতগীতি তারই প্রধান সাক্ষী। আর সে তার মনের দয়িতকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে একটু সাহস দেখিয়ে বাদশাহ পিতার কবল থেকে সুলতানকে বাঁচিয়ে দিতে পারল না!

না হয় নাই বা জানত সুলতান শিকো। সে মুক্তি পেত। সে চলে যেত অনেকদূর। পৃথিবীতে গোপন থাকত একটি কাহিনী। সে কাহিনী কখনও ব্যক্ত হত না। কিন্তু পৃথিবীর বাতাসে, ধূলিকণার সাথে মিশে থাকত একটি স্বর্গীয় মহব্বতের স্মৃতি।

জেবুন্নিসা কি সেই স্মৃতি নিয়ে চিরজীবনের জন্য ঘাসের বুকে শুয়ে চির-নিদ্রার কোলে সমাহিত হতে পারত না? না-না মোগল বংশের আওরতেরা শুধু বাস্তবজীবনের ভোগ-লালসার ঘৃণ্যবৃত্তে নিজেদের জড়িয়ে শুধু উপভোগের আনন্দে মত্ত হতে চায়। জেবুন্নিসা তাদের ব্যতিক্রম হবে কেমন করে! সে যে এই মোগল বংশেরই এক বিলাসিনী দুহিতা।

তাহলে এতদিন ধরে এই দুনিয়াতে এতগুলি বছর ধরে যে দেহের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা বর্দ্ধিত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় আস্তে আস্তে জ্ঞান পেয়ে সাইপ্রাস বৃক্ষের মত দীর্ঘ হয়ে উঠল এবং সেই দেহের অভ্যন্তরে মনের কাঠামো শিক্ষার পালিসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—অথচ তার বংশানুক্রমিক পাশবিকতা সে বিস্মৃত হল না! সে স্বর্গীয় প্রেমের দ্যুতিতে মহীয়সী হয়ে উঠল না!

তবে কী সে ভয় পেয়ে পিতার কাছে যে প্রস্তাব পেশ করেছিল—সে প্রস্তাব নিজেই ফিরিয়ে নিল—পিতার পরবর্তী জীবনের সাথে নিজের ভাগ্য জড়িত করবার জন্যে! লোভী পিতার লোভী কন্যা। পিতা মনে মনে সিংহাসন চেয়ে ফকীরের বেশ পরেছিলেন, তারপর সিংহাসন অধিকার করে ফকীরের বেশ ত্যাগ করে রাজবেশ পরে কণ্ঠে দোলালেন মুক্তার মালা! সেই পিতার কন্যা এতদিন তার যৌবনের ওপর গৈরিকবসন পরিয়ে নিজের

নিষ্পাপ হৃদয়ের পবিত্রতা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু আসলে যে মোগল শাহজাদী সময়ের অপেক্ষা করছিল তা কে জানে? এইবার পিতা বাদশাহের তখ্‌তে আসীন, এবার কন্যা তার প্রবৃত্তির অশ্বের বল্গা দ্রুতগামী করে লুটবে দুনিয়ার যত আনন্দরস।

গোয়ালিয়র দুর্গে এখন বোধহয় সুলতান শিকো পপীর বিষের ক্রিয়ায় যন্ত্রণায় খোদাকে ডাকছে। দুর্গের রূঢ় পাথরের দেয়ালের পিঠে তার সেই কাতর আহ্বানের প্রতিধ্বনি তাকেই উপহাস করে বলছে—খোদার মেহেরবাণী দুর্বলের না, সবলের ঘাড়ে চেপে খোদা সর্বদা যুদ্ধ জয় করে। তুমি শুধু খোদার মেহেরবাণী হারাও নি, তুমি এক আওরতের খেলার পুতুল হয়েছ। সে হয়ত কোন এক অসহমুহূর্তে তোমার মুক্তির জন্য সমস্ত দিল্লীর প্রাসাদের রোশনাই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারত। তুমি যে কোন মুহূর্তে মুক্তি পেতে। হয়ত বুঝতে না, সে মুক্তি কিজন্যে তুমি পেলে? এমনি কত অসম্ভব ঘটনা তো পৃথিবীতে ঘটে তেমনি এ ঘটনারও কোন গোপন হদিস মিলত না। অথচ তোমার মুক্তি মিলত তার বিনিময়ে মোগল-হারেমের অবরোধের মধ্যে একটি আওরত তার বক্ষের কৌমার্য দিয়ে তোমার সে মুক্তি ক্রয় করত।

একটি সার্থক স্বার্থহীনতার দৃষ্টান্ত জগতে উজ্জ্বল হয়ে পৃথিবীর আলোর সাথে মিশে আরো আলোময় হয়ে উঠত—তার সম্পূর্ণ ত্যাগ স্বীকার, ইতিহাসের পাতায় লেখা না থাক—হৃদয়ের পাতায় লেখা থাকত।

জেবুন্নিসা নিজেই যেন নিজেকে বার বার আঘাত করে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বহুদিন আগে একদিন শিবিকায় যেতে যেতে পথের ওপর এক মুসাফেরকে সম্রাট আকবরের স্পষ্ট মহান সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের একটি সুধাময়ী সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুনেছিল। সঙ্গীতের সেই মর্মস্পর্শী সুললিত ছন্দ ও সুর অপূর্ব অর্থকে আরো স্পষ্ট আকুতিভরা সুরে ব্যক্ত করেছিল।

'গ্রহ চন্দ্র তপন
যোত বরত হৈ
সুরত রাগ
নিরত তাল বাজৈ—'

সেদিন আকাশে পূর্ণিমার পূরু চাঁদ অসামান্য দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে মহাশূন্যে নিজেকে বিকাশ করে এই মোহন সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন

মনে হয়েছিল সম্রাট আকবর বেঁচেছিলেন শুধু এই সঙ্গীতের জন্য। প্রত্যেককে আপন করে নিয়েছিলেন এই সঙ্গীতের মধুর মিলনের মধ্যে দিয়ে। আর তানসেনকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে সম্রাট আকবর সমস্ত দুঃখের বোঝাকে লঘু করবার মন্ত্র পরিবেশন করে গিয়েছিলেন।

আবার সেই মুসাফের গাইল :

'নৌবতিয়া ঘুরত হৈ
রৈন দিন শুনামে
কহৈ কবীর পিউ গগন গাজৈ ?
ক্ষণ ঔর পলক কী আরতি কৌমসী
রৈন দিন আরতি বিশ্বপারৈ।'

শেষপর্যন্ত আর শোনা হয় নি জেবুন্নিসার। শিবিকা তাকে অনেকদূর নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার কানে লেগেছিল সেই মুসাফেরের কণ্ঠে তানসেনের অপরূপ সঙ্গীতসুধা। সে অভিভূতা, আবেশবিহ্বলা, বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা। অবশেষে ক্রন্দনভারে আপ্লুতা হয়ে জেবুন্নিসা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও যেমনি কান্নার অর্থ সন্ধানে কালক্ষেপ করে সময় অতিবাহিত করেছিল আজও অর্থ খুঁজে ফিরল কিন্তু পেল না তার সন্ধান।

সেই সঙ্গীতের আবেগে হারিয়ে যাওয়ার মত আজ পরাজয়ের গ্লানিতে হারিয়ে গেল আপন সত্তা। এই হারানো সত্তাকে টেনে নিয়েই তাকে যেতে হবে একান্ত দীনার মত বাকী জীবনটুকু।

জেবুন্নিসার গাল বেয়ে সেদিন অশ্রু ঝরেছিল পাশের যমুনার স্রোতের মত অজস্রধারায়।

তারপর এক এক করে চলে গেল আটটি বছর। দু-বছরের মধ্যে রাজ-বংশের যতগুলি শাহজাদা ছিল, সম্রাট আলমগীরের সাহায্যে দুনিয়ার অন্যপ্রান্তে চলে গেল। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদও পিতার কবল থেকে মুক্তি পেল না। নবাব বাইয়ের চোখের জলে হিন্দু-মহিষীর মহলের অলিন্দ পিচ্ছিল হল, বাতাস ভারী হল, কিন্তু দুনিয়া স্তব্ধ হল না। আবার সেই একই নিয়মে তার কার্যসমাধা হয়ে চলল। এদিকে একটি সন্তানের ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটোল, কিন্তু ওদিকে নয়া বেগমের গর্ভের আর একটি সন্তান ভূমিস্পর্শ করে কেঁদে উঠল। ঔরঙ্গজেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর

এদিকে। সম্রাট আকবরের অভিশপ্ত বিধান—চাঘতাই বংশের রাজ-কুমারীদের শাদী হবে না যে বিধান এতদিন মোগল বংশে চলে আসছিল, সম্রাট আলমগীর নিজের দুই কন্যা মিহর ও জুবাইদের শাদী যথাক্রমে ইজাদ বক্স ও সিপ্‌হর শিকোর সঙ্গে দিয়ে লঙ্ঘন করেছিলেন কিন্তু এই দুই শাহজাদা শেষ পর্যন্ত বেশীদিন ইহলোকে বেঁচে থাকেনি, সম্রাট আলমগীরের ঘোষণায় তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

শ্মশানের ভয়াবহতা দিল্লী প্রাসাদে অনেককাল বিরাজ করেছিল। একটি বিভীষিকাময় পরিবেশ সমস্ত সাম্রাজ্য ঘিরে। সব স্তব্ধ। শুধু কান্নার তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আর্তনাদ মাঝে মাঝে রাজঅন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদ গম্বুজের মিনারে মিনারে আছড়ে পড়েছিল। বধ্যভূমিতে শুধু রক্তের পিছিল স্রোত। শকুনেরা তাদের বিরাট ভয়াবহ দেহ নিয়ে আসমানের দিকচক্রবালে ঘুরপাক খেয়ে মানুষের মৃতদেহের রক্ত, মাংস, মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার জন্যে মহোৎসব শুরু করেছে।

ঔরঙ্গজেব এতগুলি মানুষের প্রাণ নিয়ে তবু গম্বুজের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় আসমানের ওপর দিকে চোখ রেখে দেখছেন—এরপর বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কোথা থেকে আসে? তাঁর সন্দেহীমন তবু সন্দেহাতীত না হতে পেরে ছটফট করে ঘুরে ফেরে। তাঁর বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, শান্তি এতটুকু নেই। দিনরাত যেন কিসের যন্ত্রণায় সিংহাসনের চতুঃপার্শ্ব ঘুরে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষে পিতার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।…আসমানের দিকে দুহাত উঁচু করে খোদাকে জানান—'হে খোদা, আমি অপরাধী, আমি নরখাদক রাক্ষস। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী একমাত্র আমার পিতা। তিনি যদি আমাকে এতটুকু স্নেহ দান করতেন, তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব এমনি নৃশংস হয়ে উঠত না।…না, না দুনিয়াতে ক্ষমা নেই। পিতা যখন আমাকে ক্ষমা করেন নি আমিও কাউকে ক্ষমা করি নি, সাম্রাজ্যের বক্ষবিদীর্ণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছি।

ঔরঙ্গজেব এরপর কঠিন অসুখে পড়লেন। জ্বরের প্রাবল্যে তিনি প্রায়ই ভুল বকতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যেত। সেবার ভার গ্রহণ করল জেবুন্নিসা ও রোশোনারা। কিন্তু চিকিৎসকরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন এবং বাইরে রটে গেল, ঔরঙ্গজেব মারা গেছেন। এরই মাঝে আর এক চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠল, রোশোনারা সম্রাটের অসুখের সংবাদ গোপন

করে রেখেছিলেন। অবশ্য জেবুন্নিসা সে কথা জানত কিন্তু তার তখন পিতার আরোগ্যলাভের জন্য মনপ্রাণ একাগ্র। সে জেনেও রোশোনারার এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করল না।

এদিকে শোনা গেল, রাজা যশোবন্ত সিংহ নাকি সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করেছেন। মহাবৎ খাঁ, যিনি নির্বিবাদে ঔরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত কাবুলের সুবাদারি থেকে পদত্যাগ করে লাহোরের মধ্য দিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়েছেন সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত ও পুনরভিষিক্ত করার জন্য। বন্দী শাহজাহানের প্রহরী খোজা আতবর খাঁ ও সম্রাটের কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য অস্থির।

এদিকে ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মুয়াজ্জম পূর্ণোদ্যমে ওমরাহদের সঙ্গে সিংহাসন দখলের সলাপরামর্শ করতে লাগলেন। ছদ্মবেশে তিনি গভীর রাত্রিতে রাজা যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর পক্ষে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। অন্য দিকে রোশোনারাবেগম কয়েকজন ওমরাহ ও ঔরঙ্গজেবের বৈমাত্রেয় ভাই ফিঁদাই খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র সাত-আট বছরের ছেলে সুলতান আকবরের পক্ষে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

দুই দলেরই বাইরের অভিপ্রায় হল সম্রাট শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়া। অন্তত তাঁরা বাইরে জনসাধারণকে তাই বোঝালেন। কিন্তু একমাত্র বাইরে মুখরক্ষা করা ছাড়া এই অভিপ্রায়ের মধ্যে অন্য কোন সদুদ্দেশ্য ছিল না। রাজদরবারের আমীর ওমরাহদের মধ্যে তখন অন্তত এমন একজনও ছিলেন না যিনি সম্রাট শাহজাহানের মুক্তি ও পুনরভিষেক মনেপ্রাণে কামনা করতেন। শুধু যশোবন্ত সিংহ ও মহাবৎ খাঁ প্রকাশ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের কোন বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত দারাকে সাহায্য করেও ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতা করেন নি। রাজনীতির চাল বোঝা বড় মুস্কিল।

অথচ ঔরঙ্গজেবের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা এও জানতেন, বৃদ্ধ শাহজাহানকে কারা-মুক্ত করার অর্থ পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহকে মুক্ত করা। সকলেই বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার ভয় করতেন, খোজা আতবর খাঁ পর্যন্ত সর্বদা বন্দী সম্রাটের প্রতি সতর্ক হয়ে থাকত।

এদিকে। সম্রাট আকবরের অভিশপ্ত বিধান—চাঘতাই বংশের রাজ-কুমারীদের শাদী হবে না যে বিধান এতদিন মোগল বংশে চলে আসছিল, সম্রাট আলমগীর নিজের দুই কন্যা মিহর ও জুবাইদের শাদী যথাক্রমে ইজাদ বক্স ও সিপ্‌হর শিকোর সঙ্গে দিয়ে লঙ্ঘন করেছিলেন কিন্তু এই দুই শাহজাদা শেষ পর্যন্ত বেশীদিন ইহলোকে বেঁচে থাকেনি, সম্রাট আলমগীরের ঘোষণায় তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

শ্মশানের ভয়াবহতা দিল্লী প্রাসাদে অনেককাল বিরাজ করেছিল। একটি বিভীষিকাময় পরিবেশ সমস্ত সাম্রাজ্য ঘিরে। সব স্তব্ধ। শুধু কান্নার তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আর্তনাদ মাঝে মাঝে রাজঅন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদ গম্বুজের মিনারে মিনারে আছড়ে পড়েছিল। বধ্যভূমিতে শুধু রক্তের পিছিল স্রোত। শকুনেরা তাদের বিরাট ভয়াবহ দেহ নিয়ে আসমানের দিকচক্রবালে ঘুরপাক খেয়ে মানুষের মৃতদেহের রক্ত, মাংস, মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার জন্যে মহোৎসব শুরু করেছে।

ঔরঙ্গজেব এতগুলি মানুষের প্রাণ নিয়ে তবু গম্বুজের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় আসমানের ওপর দিকে চোখ রেখে দেখছেন—এরপর বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কোথা থেকে আসে? তাঁর সন্দেহীমন তবু সন্দেহাতীত না হতে পেরে ছটফট করে ঘুরে ফেরে। তাঁর বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, শান্তি এতটুকু নেই। দিনরাত যেন কিসের যন্ত্রণায় সিংহাসনের চতুঃপার্শ্ব ঘুরে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষে পিতার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।···আসমানের দিকে দুহাত উঁচু করে খোদাকে জানান—'হে খোদা, আমি অপরাধী, আমি নরখাদক রাক্ষস। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী একমাত্র আমার পিতা। তিনি যদি আমাকে এতটুকু স্নেহ দান করতেন, তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব এমনি নৃশংস হয়ে উঠত না।···না, না দুনিয়াতে ক্ষমা নেই। পিতা যখন আমাকে ক্ষমা করেন নি আমিও কাউকে ক্ষমা করি নি, সাম্রাজ্যের বক্ষবিদীর্ণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছি।

ঔরঙ্গজেব এরপর কঠিন অসুখে পড়লেন। জ্বরের প্রাবল্যে তিনি প্রায়ই ভুল বকতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যেত। সেবার ভার গ্রহণ করল জেবুন্নিসা ও রোশোনারা। কিন্তু চিকিৎসকরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন এবং বাইরে রটে গেল, ঔরঙ্গজেব মারা গেছেন। এরই মাঝে আর এক চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠল, রোশোনারা সম্রাটের অসুখের সংবাদ গোপন

করে রেখেছিলেন। অবশ্য জেবুন্নিসা সে কথা জানত কিন্তু তার তখন পিতার আরোগ্যলাভের জন্য মনপ্রাণ একাগ্র। সে জেনেও রোশোনারার এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করল না।

এদিকে শোনা গেল, রাজা যশোবন্ত সিংহ নাকি সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করেছেন। মহাবৎ খাঁ, যিনি নির্বিবাদে ঔরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত কাবুলের সুবাদারি থেকে পদত্যাগ করে লাহোরের মধ্য দিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়েছেন সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত ও পুনরভিষিক্ত করার জন্য। বন্দী শাহজাহানের প্রহরী খোজা আতবর খাঁ ও সম্রাটের কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য অস্থির।

এদিকে ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মুয়াজ্জম পূর্ণোদ্যমে ওমরাহদের সঙ্গে সিংহাসন দখলের সলাপরামর্শ করতে লাগলেন। ছদ্মবেশে তিনি গভীর রাত্রিতে রাজা যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর পক্ষে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। অন্য দিকে রোশোনারাবেগম কয়েকজন ওমরাহ ও ঔরঙ্গজেবের বৈমাত্রেয় ভাই ফিঁদাই খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র সাত-আট বছরের ছেলে সুলতান আকবরের পক্ষে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

দুই দলেরই বাইরের অভিপ্রায় হল সম্রাট শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়া। অন্তত তাঁরা বাইরে জনসাধারণকে তাই বোঝালেন। কিন্তু একমাত্র বাইরে মুখরক্ষা করা ছাড়া এই অভিপ্রায়ের মধ্যে অন্য কোন সদুদ্দেশ্য ছিল না। রাজদরবারের আমীর ওমরাহদের মধ্যে তখন অন্তত এমন একজনও ছিলেন না যিনি সম্রাট শাহজাহানের মুক্তি ও পুনরভিষেক মনেপ্রাণে কামনা করতেন। শুধু যশোবন্ত সিংহ ও মহাবৎ খাঁ প্রকাশ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের কোন বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত দারাকে সাহায্য করেও ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতা করেন নি। রাজনীতির চাল বোঝা বড় মুস্কিল।

অথচ ঔরঙ্গজেবের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা এও জানতেন, বৃদ্ধ শাহজাহানকে কারা-মুক্ত করার অর্থ পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহকে মুক্ত করা। সকলেই বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার ভয় করতেন, খোজা আতবর খাঁ পর্যন্ত সর্বদা বন্দী সম্রাটের প্রতি সতর্ক হয়ে থাকত।

অসুস্থতার মধ্যেও ঔরঙ্গজেব স্থিরচিত্তে রাজকার্য পরিচালন করতেন এবং বন্দী বৃদ্ধ পিতার দিকে নজর রাখতেন। যদি তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তাহলে বৃদ্ধ শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি পুত্র সুলতান মুয়াজ্জমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওদিকে খোজা আতবর খাঁর কাছেও প্রায়ই এত্তেলা পাঠিয়ে বৃদ্ধ পিতার ওপর কড়া নজর রাখতে বলতেন।

যখন কঠিন অসুস্থাবস্থা থেকে আরোগ্য লাভের পথে এলেন, সেই সময় কন্যার কাছ থেকে জানতে পারলেন, রাজ্যের গোলযোগের সংবাদ। তিনি সেই মুহূর্তে বেগে দরবার কক্ষে উপনীত হলেন, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে মূর্চ্ছা গেলেন এবং মূর্চ্ছার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে যাবার পর যশোবন্ত সিংহ কয়েকজন হোমরা চোমরা ওমরাহকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলে তিনি বললেন—আপনারা দেখে যান আমি জীবিত কি মৃত ?···আর বিদ্রোহ ঘোষণা করা কারুর দ্বারা সম্ভব হল-না। সম্রাট এরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তারপর আরও ক'বছর গেলে, ঔরঙ্গজেবের প্রথম সিংহাসনে উপবেশনের ঠিক আট বছর পরে সম্রাট শাহজাহানের কারাকক্ষে মৃত্যু এসে দেখা দিল। যে মৃত্যুর জন্য শাহজাহানের ব্যথিত হৃদয় এতদিন লালায়িত ছিল—যাকে প্রসন্ন করবার জন্যে বিকলচিত্ত বাদশাহ এতদিন নিষ্ফল স্তবস্তুতি করেছেন, এই দীর্ঘ আট বৎসর পরে হঠাৎ মৃত্যুদুত এসে কারাকক্ষের দ্বারে করাঘাত হানতে বৃদ্ধ বাদশাহ পরম-আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন। এতদিন পরে বুঝি উপেক্ষিত সম্রাটের সনির্বন্ধ-আবেদন কঠোর কালের নির্মম-কর্ণে পোঁচেছে। সুস্নিগ্ধ তৈল মর্দনের ফলে জরাক্রান্ত হয়ে সম্রাট শয্যাশায়ী হলেন। জ্বর ক্রমে বাড়তেই লাগল। রাজ চিকিৎসকগণ তাঁকে নিরাময় করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, স্নেহময়ী দুহিতার প্রাণপণ সেবা—কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর সর্বসন্তাপ দূর করবার জন্যে মৃত্যু এতকাল পরে অগ্রসর হয়ে এল। সর্বস্ব বঞ্চিত সম্রাট শাহজাহান আজ বাঞ্ছিত চিরমুক্তি লাভ করলেন, আজ তাঁর রুদ্ধ পিঞ্জর দ্বার চিরমুক্ত হল। একদিন সায়াহ্নে চিকিৎসকগণ একবাক্যে চরম-অভিমত প্রকাশ করলেন যে, পীড়িত সম্রাটের জীবন এখন পরম-ভিষকের হস্তে। যৌবনের রণশ্রমে, বার্দ্ধক্যের কারাক্লেশে শাহজাহানের ভগ্ন শরীর অতিদ্রুত ক্ষয় হতে লাগল—প্রতি মুহূর্তে পরম মুহূর্তের আশঙ্কায় সকলে ভীতি-চকিত—কিন্তু মুমূর্ষু সম্রাট

নিশ্চিন্ত, নির্ভীক। মৃত্যু সন্নিকট জেনে শাহজাহান মঙ্গলময় আল্লার আশীর্বাদে জীবনে যে-সমস্ত অনুগ্রহের অধিকারী হয়েছিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ-অন্তরে অভিবাদন জ্ঞাপন করতে লাগলেন।

পরে স্থির অবিকৃতকণ্ঠে নিজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে রোরুদ্যমানা জাহানারা, বেগমদের ও হারেমের অন্যান্য রমণীদের সান্ত্বনা দান করে মূর্তিমতী ক্ষমারূপিনী কন্যার অশ্রুসিক্ত অনুরোধে ঔরঙ্গজেবকে মার্জনা-পত্র লিখে দিলেন। পরিশেষে জাহানারার ওপর অসহায় পরিবারবর্গের ভার অর্পণ করে মুমূর্ষ সম্রাট সকলের নিকট চিরবিদায় নিলেন। তারপর তাঁর অন্তিম-অনুরোধে কোরান-পাঠ আরম্ভ হল।

চিরনিদ্রায় অভিভূত হবার আগে অষ্টকোণ-সমন্বিত মুসথম্ বুরুজে-শায়িত দীর্ঘবিরহ-বিধুর সম্রাটের শেষ দৃষ্টি মমতাজের সমাধি-মন্দিরে নিবদ্ধ হল। রাজ অতিথিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তাজ সেদিন সন্ধ্যায় বিচিত্র বিভায় বিচিত্র-ভূষণে সেজেছিল। চিরবাঞ্ছিত মিলন-মন্দিরের পানে চেয়ে চেয়ে নৃমণির পাণ্ডুর কপোল বেয়ে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সম্রাট শাহজাহান শেষ কটি কথা ব্যক্ত করলেন—'প্রিয়তমা আমি যাচ্ছি, আর মুহূর্তমাত্র আমার জন্য অপেক্ষা কর'।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের পর প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে চিরমিলনের আনন্দে শাহজাহানের সহাস-প্রফুল্লমুখে মৃত্যুর করাল ছায়া অপসারিত হয়ে সহসা দিব্য প্রেমজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অন্তঃপুরবাসিনীদের বিলাপ ধ্বনি মিলিত কোরানের পবিত্র গাথা শুনতে শুনতে ও ইসলাম ধর্মের জয়গান করতে করতে প্রেমিক নৃপতির একাগ্র নিবদ্ধ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে গেল। নৈশ-বাসরে নীল সলিলা কালিন্দী কলকণ্ঠে রাজদম্পতির মিলন-গান গেয়ে উঠল।

জাহানারা অবিলম্বে আগ্রা দুর্গের অধ্যক্ষ রদন্দাজ খাঁ ও খোজা বহ্‌লোলকে সংবাদ প্রেরণ করলেন। তাঁরা এসে বেগমের নির্দেশ মত মৃতদেহ সমাধির আয়োজনার্থে রাজধর্মযাজক সৈয়দ মুহম্মদ কনৌজী ও কাজী কুর্বানকে ডেকে পাঠালেন। মধ্যরাত্রে তাঁরা উপস্থিত হলে মৃতদেহ পার্শ্ববর্তী কক্ষে স্থানান্তরিত করে স্নান ও আচ্ছাদনের পর চন্দন কাঠের শবাধার-মধ্যে স্থাপিত হল।

জাহানারার ইচ্ছা ছিল, পরদিন সম্রাটের যোগ্য আড়ম্বরে পিতার মৃতদেহ তাজমহলে নীত হয়—রাজসভাসদ্‌রা পথে স্বর্ণরজত বিক্ষিপ্ত করতে করতে

রাজশবাধার বহন করে নিয়ে যান—আগ্রা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর লোক নগ্নপায়ে নগ্নমস্তকে শবাধারের পশ্চাদ্‌গমন করে। কিন্তু তাঁর বাসনা পূর্ণ হল না। কারণ ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীতে। তাছাড়া দিল্লী থেকে ঔরঙ্গজেবের সংবাদ এল—'প্রাসাদের পশ্চাদভাগের প্রাচীর ভগ্ন করে রাত্রেই পিতার সমাধি শেষ করতে হবে। কারণ-রাজ-সমারোহে, আড়ম্বরের সঙ্গে সম্রাট পিতার সমাধির আয়োজন করলে জনপ্রিয় সম্রাটের শোকে সাম্রাজ্যময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে পারে।'

সুতরাং জাহানারার করার কিছু থাকল না। পিতার মৃতদেহ অতি দীনভাবে সামান্য খোজা ও কয়েকজন লোকের সাহায্যে গোপনভাবে প্রাসাদের প্রাচীর ভগ্ন করে তাজমহলে প্রেরিত হল। নিগৃহীত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত ভারতপতি পঞ্চসপ্ততি-বর্ষ বয়সে পার্থিব সকল যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন।

যে জীর্ণ অন্তঃসারশূন্য বৃদ্ধ তরুবরকে অজস্র স্নেহবারিসিঞ্চনে জাহানারা এতদিন সঞ্জীবিত রেখেছিলেন, কালের কঠোর কুঠার তাকে ভূপতিত করা-মাত্র নবীনসম্রাট ঔরঙ্গজেব পিতৃহীনা সহোদরাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। পিতার মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে তিনি দিল্লী থেকে আগ্রায় গিয়ে শোকমগ্না ভগিনীকে সান্ত্বনাদানের জন্য পুনঃ পুনঃ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন।

কিন্তু প্রথমে জাহানারা চোখের জলকে থামাতে না পেরে ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করলেন না। কিন্তু বার বার ঔরঙ্গজেবের কাতর অনুরোধে জাহানারা এসে ভ্রাতার সামনে দাঁড়ালেন এবং ভ্রাতাকে দেখে তাঁর চোখের জল আরো প্রবলবেগে বক্ষ ভাসাল। পিতার জন্য ঔরঙ্গজেবের মনেও অনেক পর্যাপ্ত দুঃখ ছিল, ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দুই ভ্রাতাভগ্নীই একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রোদন করলেন।

ঔরঙ্গজেব ভগ্নীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে হারেমের সর্বময় কর্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

কিন্তু জাহানারা আগ্রাদুর্গের বাইরে যেতে স্বীকৃত হলেন না।

ঔরঙ্গজেব ভগ্নীর বলিষ্ঠ উক্তিতে সচকিত না হয়ে বরং সমর্থন করে সাম্রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর আদেশ প্রচার করলেন যে, সকলকে আগ্রাদুর্গে বেগমের আবাসে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের সর্বপ্রধানা মহিলা

'পাদিশাহ বেগম' রূপে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও নজর প্রদান করতে হবে। উচ্চ-রাজকর্মচারিরাও এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রাজমন্ত্রী দানিশমন্দ খাঁ প্রভুর আদেশে জাহানারার দেউড়ীতে উপস্থিত হয়ে বেগমকে সংবাদ জ্ঞাপন করল যে, আপনার আদেশ প্রতিপালার্থে আমি দ্বারদেশে অপেক্ষায় আছি।

এদিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে জেবুন্নিসার।

পরিবর্তন আপন থেকে হয় নি। সে তার জীবনকে পরিবর্তিত করবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছে। মোগল রাজঅন্তঃপুরে বেড়ে উঠেছিল বাগের উদ্যানে সুগন্ধময় একটি গোলাপ। সে গোলাপের পরিচ্ছন্নতা, শুচিতা, মোগল-অন্তঃপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু সেই পুষ্পগোলাপের দেহ নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সরল মনটি বার বার সরলতা প্রকাশ করে বক্রপথে ঘুরে গেছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হয়ত বুদ্ধির অগম্য। তিনি সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য সিংহাসনে বসবার জন্যে যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে রক্তস্রোত বইয়ে ছিলেন, শত্রুর নিধন করতে মানুষের কলিজায় যে আশঙ্কার বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন, জেবুন্নিসার মধ্যে তার ছাপ পড়েছিল।

জেবুন্নিসা এখন বাদশাহজাদী। সম্রাটের পেয়ারী কন্যা। সম্রাট তাঁর কন্যাকে সমস্ত সম্মান দান করেছেন। রাজঅন্তঃপুরের সবচেয়ে মূল্যবান কক্ষে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনেকগুলি বাঁদী তার ফর-মাইস খাটবার জন্যে সর্বদা মোতায়েন। খোজা প্রহরী, তাতার প্রহরিণীরা আরও সম্ভ্রমের হেতুতে মাথা নামিয়ে অনেক তস্‌লিম করে। মাসোহারার অঙ্ক বেড়েছে জেবুন্নিসার। পিতা তাকে এমন এক স্বাধীনতা দিয়েছেন যা জেনানামহলের কেউ কোনদিন পায় নি। জেবুন্নিসা ইচ্ছে করলে বিনাহুকুমে সর্বত্র যেতে পারে। প্রাসাদে হাজারো মরদের মধ্যে ঘুরলেও তার গতিবিধি সঙ্কোচনের জন্য কোন রাজাজ্ঞার রক্তচক্ষু শাসাবে না। অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠকর্ত্রী রোশেনারা পেয়েছেন শুধু অন্তঃপুরের স্বাধীনতা কিন্তু জেবুন্নিসা তার চেয়েও অনেক বেশী।

বেগমসাহিব জাহানারা নবীনবাদশাহ্ কর্তৃক পুনরায় সম্মান প্রাপ্ত হলে

শাহজাদী রোশোনারা সম্রাট ভাইজানের কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন—এর মানে কি ?

সম্রাট ঔরঙ্গজেব বহুদিন ধরেই তাঁর এই বহিনের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে আসছেন। শুধু করছেন এইজন্যে যে, তাঁর এই সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য বহিনের সাহায্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্তঃপুরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই রমণীকে কোনদিনও অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়! সম্রাট শাহজাহান যে জন্য তাঁর এই কন্যাকে দেখতে পারতেন না, ঔরঙ্গজেবও সেইকারণেই বহিনকে বহিষ্কৃত করার মতলবে ছিলেন। যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সহ্য করতে হয় তাহলে সে সহ্য ঔরঙ্গজেব করেছেন। নিজের কন্যার নামে যথেষ্ট দুর্নাম শোনার পরও সহ্য করেছেন বহিনকে। শুধু এইজন্যে যে অদ্ভুত তাঁর এই কন্যা, একটি কথাও রোশোনারার বিরুদ্ধে বলে নি। পিতার স্নেহ শুধু সেইজন্যে। অন্ধস্নেহ নয়, গুপ্তচরের কাছ থেকে সমস্তই তিনি অবগত হয়েছিলেন। এবং রোশোনারার উচ্ছৃঙ্খলতা হারেমের শ্লথ জীবনের কাঠামো যে আরো শিথিল করে দিয়েছে, তাই দেখে তিনি কৃতজ্ঞতার মুখোস খুলে ফেলে বহিনের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

সাম্রাজ্যাধিকারের সাহায্যের অঙ্গীকারস্বরূপ জেনানামহলের শ্রেষ্ঠকর্ত্রী করবার কথা ছিল রোশোনারাকে—এবং জাহানারা যে উপাধি পিতা কর্তৃক পেয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেব সেইসব উপাধি রোশোনারাকে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। রোশোনারা অবশ্য ভাইয়ের রাজ্য জয় করবার সাহায্যে শুধু গুপ্তচরের কাজ করেননি, নিজের বহুমূল্য অলঙ্কার ও অর্থ সাহায্য দিয়ে ভাইকে যুদ্ধের রসদ জুগিয়েছিলেন। যদি সেদিন অর্থের প্রাচুর্য না থাকত হয়ত আজকের এই সিংহাসন ঔরঙ্গজেবের কল্পনাতীত হত। অবশ্য এই কৃতজ্ঞতার জন্য ঔরঙ্গজেব কোনদিনও চিন্তা করেন নি ভগ্নীকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু রাজ্যজয় করে, ভাইদের পরাজিত করে, ফিরে এসে দেখলেন—ভগ্নীর ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন।

তাছাড়া জাহানারার কাছে রোশোনারার সম্বন্ধে বলতে জাহানারা মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন। নিজের ছোট বহিনের সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর মুখে বাধল। বহিনের অপরাধ যে ক্ষমাহীন, সে কথা ভেবেই জাহানারা কোন কথা বললেন না।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব তবু সবই সহ্য করছিলেন। কিন্তু যখন পিতার গচ্ছিত

সম্পত্তি মণিমুক্তাপূর্ণ পাত্র, যে পাত্র তিনি জীবিত থাকতে কখনও পুত্রকে দেননি, মৃত্যুর সময় পুত্রকে ক্ষমা করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পাত্র জাহানারা ঔরঙ্গজেবকে প্রেরণ করতে রোশোনারা বললেন—আমার প্রদত্ত সেই অলঙ্কার এবার আমাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক্।

ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—কেন, তোমার প্রদত্ত অলঙ্কারের অনেক বেশী কি আমি তোমাকে দিই নি?

আমি তার বিনিময়ে তোমায় সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছি!

ঔরঙ্গজেব সংযম রক্ষা করে বহিনের স্বার্থপরতা দেখে চমকিত হলেন, কিন্তু ক্ষুব্ধ না হয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—আমি তার বিনিময়ে তোমায় হারেমের কর্ত্রী করেছি।

এর মূল্য কি? এ কর্তৃত্বে আমার প্রয়োজন নেই। ঝঞ্ঝাট পোয়ানো ছাড়া সম্মান কিছু না। কতকগুলি নষ্টা বাঁদী আর নপুংসক খোজার শাসন-কর্ত্রী হয়ে লাভ কি?

তবে তুমি কী চাও?

আমি যা চাই, তা তোমার অবিদিত নয়।

বেশ অকপটে বল। যদি অসাধ্য না হয়, তাহলে বাদশাহ অবশ্যই তোমার আশা পূর্ণ করবে।

কিন্তু রোশোনারা যে কথা বললেন তাতে সমস্ত মানুষের রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে, ঔরঙ্গজেবেরও তাই হ'ল। তিনি এবার আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না, ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—বহিন জাহানারা সম্মানের যোগ্যা, তাই তাকে আমি সে সম্মান প্রদান করেছি।

রোশোনারাও ভীতা না হয়ে বাদসাহের কথার উত্তর সেই মেজাজেই দিলেন—হ্যাঁ, আজ জাহানারা তোমার কাছে সম্মানের যোগ্যা! আমি কি তোমার চাতুরী কিছু বুঝতে পারি না? তুমি পিতার বন্দীত্বের অপরাধ, ভ্রাতাদের হত্যা, শাহজাদাদের নৃশংস মৃত্যু—এতগুলি অপরাধের ক্ষমা পিতার কাছ থেকে পাওনি বলে তাঁর কন্যাকে হাত করতে চাইছো? কন্যাকে সাহায্যার্থে পেলে তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে—শুধু সেই কারণের জন্য তাঁকে ইজ্জৎ করছ? দেখ আমি নিজের স্বার্থের জন্যেই পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে তোমায় সিংহাসন জয় করতে সাহায্য করেছি। তুমি যদি আমার দাবী সম্পূর্ণ না কর—তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে!

ঔরঙ্গজেব নিজে ধূর্ত কৌশলী, কপটতা অবলম্বনে সিদ্ধহস্ত। মানুষের হৃদপিণ্ড ছিনিয়ে নিতে দুনিয়াতেও তার জোড়া নেই। তিনিও তাঁর বহিনের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ব্যঙ্গ করে বললেন—স্পর্ধা তোমার সপ্তমে উন্নীত হয়েছে! বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চাও? আমি তোমার অনেক অপরাধের ক্ষমা করেছি। আমার অসুস্থতার অজুহাতে তুমি আবার আমাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিলে। আমার বিনাহুকুমে তুমি জানীর ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছ। হারেমের বাঁদীদের ওপর বিশ্রী ব্যবহার করে তুমি তাদের অশ্রদ্ধা কুড়িয়েছ! আমার প্রিয়তমা কন্যার চরিত্রের দুর্নাম দিয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করেছ! তুমি দারার জেনানা মিঠি বেগমের মৃত্যুর কারণ। তুমি ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে হারেমের সম্মান ধূলিময় করে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়েছ। এরপরও আমি তোমাকে সহ্য করে তোমাকে কর্ত্রীর পদে রেখে সম্মান প্রদর্শন করেছি। যেটুকু স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি শুধু তুমি সম্রাট শাহজাহানের কন্যা বলে।

রোশোনারাও ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—না হলে কি করতে?

কি করতাম বা কি করব সে প্রশ্ন নাই বা করলে বহিন্! যদি আমার সহ্যের অতীত হয় তার প্রমাণ তুমি সঙ্গে সঙ্গেই পাবে। আর আমাকে যে সিংহাসন-প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করেছ বলে অহঙ্কার কর—খোদা যাকে সিংহাসনে বসাবেন, মানুষের সাধ্য কি তার গতিরোধ করে?

সেইজন্যে রোশোনারার প্রায় সব কর্তৃত্বই ঔরঙ্গজেব কন্যাকে দিয়েছিলেন, রোশোনারা শুধু নামে কর্ত্রী ছিলেন, আর সবই জেবুন্নিসা পেয়েছিল।

কিন্তু জেবুন্নিসা এ সবের কিছুই চায়নি। সে চেয়েছিল আপন সত্তাকে ফুলের মত সুন্দর করে ভালবাসতে। মোগল হারেমে থেকে সে শাহজাদীর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে নতুন শিক্ষার আলোতে বিধৌত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে বাঁচতে। কিন্তু হল কই? পিতা বার বার তার স্নেহের ফল্গুধারায় ধৌত করে তাকে জড়িয়ে নিতে চাইলেন।

জেবুন্নিসা নিজের বিরাট পুস্তকের লাইব্রেরীতে সমস্ত সময় অতিবাহিত করে মনটাকে বদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসে না। তার ফার্সী, আরবী ভাষার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য একসময় সে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল, আজ সে সুন্দর হস্তাক্ষর কেমন অসুন্দর হয়ে গেছে।

আসমান সেই আছে। বৃক্ষে বৃক্ষে সবুজ পত্রের আবির্ভাবও হয়। পুষ্প-বৃক্ষে কত রঙের ফুল ফোটে। বাতাসের মলয় হিল্লোল ফুলের প্রাণে দোল দিয়ে আনন্দ জানায়। সূর্যের দীপ্তি এখনও ম্লান হয়নি। চন্দ্রের স্নিগ্ধরূপ মনের দর্পণ রাঙায়।

শালিমারবাগে কত বৈকাল তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রিয় বিশ্রামমঞ্চে কেটে যায়। জেবুন্নিসা খোঁজে শান্তি, আকাঙ্ক্ষা করে স্বস্তি। কিন্তু মেলে না সে অপার্থিব বস্তু! কোরানের অনুচ্ছেদ মুখস্থ সে আবৃত্তি করে আল্লাহর কাছে জানায়—আমার পথ বলে দাও। পিতা আমাকে তাঁর ঐশ্বর্যের মাঝে বন্দী করে রাখতে চান। আমি চাইনে এই ঐশ্বর্য, চাইনে এই বন্দীত্ব! আমার নিজের সত্তা হারিয়ে না যায়, আমি যেন সজ্ঞানে সমস্ত ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে হারেমের এই পিচ্ছিল জীবনে একটু উজ্জ্বলতা নিয়ে বেঁচে থাকি।

কিন্তু কোথায় সে উজ্জ্বলতা? সমস্ত কিছুই ম্লান, নিষ্প্রভ। বিগত সেই স্মৃতি বাদশাহের রক্তচক্ষুতে প্রাসাদ ও হারেমের মধ্যে কেউ গুণ গুণ করে না, কিন্তু সেই রক্তময় স্মৃতি ভোলা বড় সহজ নয়? সেই রক্তময় অধ্যায় আর যারা কেউ বিস্মৃত হবার চেষ্টা করুক, জেবুন্নিসা কিছুতে ভুলতে পারে না। পারে না তিনটি মানুষের স্মৃতি। দারা শিকো, সুলতান শিকো ও ভাইজান সুলতান মহম্মদকে। সুলতান শিকোর কন্যা সেলিমাকে একদিন জেবুন্নিসা বুকে চেপে ধরে শান্তি দিয়েছিল। সেলিমার দুটি চোখের সেই অশ্রুর প্রবাহ কি দিয়ে যে রুদ্ধ করে দেবে জেবুন্নিসা ভেবে পায় নি, শুধু তার স্নেহময়ী বক্ষে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

জাহানারা শোকার্তা সবকটি শাহজাদীকে নিয়ে গিয়ে খুব ভালই করেছেন। অন্তত তাদের ব্যথাতুরা সজল মুখগুলি দেখবার কষ্ট থেকে যে সে বেঁচেছে সেইজন্য সে ধন্যবাদ দিয়েছে। জাহানারা যদি তাকেও নিয়ে যেতেন! তাহলে বোধ হয় আরও একটি জীবন মুক্তি পেত। অন্তত এই বিভাষিকার রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে সে বাকী জীবন আলোর মাঝে কাটাতো? জাহানারাকে যদি সে এত্তেলা পাঠিয়ে তার বর্তমান মনের অবস্থা পেশ করে তাহলে নিশ্চয় তিনি তাকে আপন আবাসে রেখে শান্তি দান করবেন। জাহানারা বিবি জেবুন্নিসাকেও পেয়ার করেন।

কিন্তু সে যে বড় লজ্জার আত্মসমর্পণ! পিতার অবমাননা করে সে অপরের কাছে পিতাকে ছোট করবে—আর সেই পিতা তাকে তাঁর অন্তর

দিয়ে পেয়ার করেন। পিতা যখন তার সঙ্গে কথা বলেন, পিতার চোখের তলায় তাকিয়ে দেখেছে সে, তাঁর পিতার চোখের তলায় ঈর্ষা নেই, কেমন যেন সজল স্নেহময়ভাব। তিনি যেন ভাইজান ছোট্ট আকবরের মত শিশু হয়ে কন্যার কাছে আবেদন করেন।

সে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে, পিতা দুনিয়ার সবার কাছে যত অপরাধীই হউন, তাঁর কন্যার কাছে তিনি চিরকাল মহব্বতই পাবেন। সে জানতে পেরেছে, পিতাকে সবাই যত নিষ্ঠুর বলুক কিন্তু তিনি যে কত অসহায় —একমাত্র কন্যাই জানে। রাজ্যের বিচারে সন্দেহবশে সিংহাসনের জন্য একের পর এক হত্যা করেছেন। হত্যা না করলে নিশ্চিন্তে রাজ্যশাসন করা তাঁর ক্ষমতায় হত না। তাই তিনি তাঁর সামনে থেকে 'উত্তরাধিকারী'কে সরিয়ে দেবার জন্যে হত্যায় বাতাস কলুষিত করেছেন।

সেদিন পিতা যদি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেন—বেটি, আমি কি করব? হত্যা ছাড়া তো নিজের মুক্তি নেই। হয়ত সেদিন জেবুন্নিসা বলত —দরকার নেই এ সিংহাসনে, তার চেয়ে চল, আমরা কোথাও চলে যাই। কোন রাজপুরুষ একথা শুনে হয়ত রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে না, অবশ্য যার সাহস আছে। সুতরাং জেবুন্নিসার সেই উপদেশ কোন উপকারে লাগত না। ভালই হয়েছে, পিতা যে সেদিন এসে জিজ্ঞেস করে তাকে লজ্জায় ফেলেন নি, তাতেই সে আজ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আজ পিতার সমস্ত অবলম্বনই সে। শুনেছে, উদিপুরী বেগম পিতাকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। উদিপুরীর রূপ আছে; তার পিতার নেই। দারা চাচার ছিল, উদিপুরী তাঁর সাথে মহব্বত করতেন। পিতার সম্মানে সম্মানিতা হয়ে বাধ্য হয়ে হারেমে এসে উঠেছেন। এখন নাকি উদিপুরী দিনরাত সরাবের নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন। তাঁর পুত্র কামবকস বেশ একটু বড় হয়েছে, সে ধাত্রীর হাত ধরে মহলের পর মহল চরকি দিয়ে বেড়ায়।

ছেলেটি বড় সুন্দর হয়েছে। কাশ্মীরের দেবতা বিরচিত উদ্যানে, পরীর চক্ষু-রঞ্জিত জলের অপূর্ব আধার হ্রদের মত। চক্ষু তারকায় ছেলেটি সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। দেহের বর্ণে পাহাড়ের অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে আছে। মুখখানায় অর্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমের রহস্য। হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বাস নিয়ে ছোট বালক ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

দুদিন কাছাকাছি ছিল বলে ছেলেটিকে কাছে ডেকেছিল জেবুন্নিসা। জেবুন্নিসাকে দেখে আদো আদো ভাষায় কামবকস বলেছিল—সেলাম আলেকুম শাহজাদী!

সব কথা স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। কিন্তু ভাঙা ভাঙা কথাগুলি এত মিষ্টি যে এধরনের মিষ্টি কোন বস্তু সারা হিন্দুস্তান থেকে লুটে আনা প্রাসাদের গুদামঘরেও নেই। জেবুন্নিসা তার হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছিল। তারপর মুক্ত হাসিতে আপন স্নেহে জড়িয়ে নিয়ে কামবকসকে জিজ্ঞেস করেছিল—কে তোমায় শেখাল কামবকস, সেলাম আলেকুম ?

কামবকস তার ছোট্ট চাপাকলির মত অঙ্গুলি দিয়ে ধাত্রীর দিকে সঙ্কেত করে বলেছিল—ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, ও।

ও কে হয় ?

আয়া।

এটা কে শেখাল ?

আয়া।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তো!

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল জেবুন্নিসা। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পুত্রের মত কথাই বলেছে সদ্যভূমিষ্ট ভাবিকালের উত্তরাধিকারী। মনে মনে জেবুন্নিসার গর্বই হল। তৈমুরবংশের ধ্বংস যে খুব নিকটবর্তী নয়, তার নমুনা এই সব বংশধর।

আর একদিন মহলের একটি উদ্যানের ফোয়ারার ধারে আকবরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেবুন্নিসা আকাশে এক ঝাঁক পায়রার চক্র দেওয়া উপভোগ করছে, আচমকা কামবকস এসে জেবুন্নিসার ওড়নার প্রান্তভাগটা ধরে টানল।

কি দেখছ গো তোমরা ?

জেবুন্নিসা চমকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, দেখে হেসে তাড়াতাড়ি কামবকসকে কোলে তুলে নিল। কুসুম নরম গোলাপী গালদুটি টিপে দিতে গিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, দেখল হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখানো সুন্দর চোখের কোলে জলের চিকচিকে আভা। সে যে এখানে আসবার

আগে কেঁদেছিল, তার সম্পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে। জেবুন্নিসা বিস্ময়ে ধাত্রার দিকে তাকিয়ে বলল—একে কি তুমি তিরস্কার করেছ ?

ধাত্রী একটু ইতস্তত করে কুর্নিশ জানিয়ে বলল—কসুর মাপ করবেন বাদশাহজাদী। শাহজাদার আম্মাজান মালেকা বেগম শাহেবা সাহজাদাকে কক্ষ থেকে নিকাল দিয়েছেন।

কেন, অপরাধ ?

অপরাধ কিছু নয় বাদশাহজাদী। বেগম সাহেবা সরাবের নেশায় বেহুঁস হয়েছিলেন। এই সময় শাহজাদা ঘরে ঢুকলে সহ্য করতে পারেন না। অপরাধ অবশ্য যদি বলেন তাহলে আমারই কসুর। কিন্তু কি করব ? শাহজাদা বায়না ধরল, আমি রাখতে পারলুম না, হাত ছেড়ে চলে গেল দৌড়ে বেগমসাহেবার মহলে। তারপর কাঁদ কাঁদ হয়ে ধাত্রী বলল—এর জন্যে আমায় বেগমসাহেবার কাছ থেকে খোয়াব শুনতে হবে।

এই থেকেই জানতে পারল জেবুন্নিসা, উদিপুরী বেগম দিনরাত সরাবের নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন।

উদিপুরী বেগম সরাবের নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন। পিতা কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঠিক বুঝতে পারে না জেবুন্নিসা—ব্যাপারটা কি ? কিন্তু সে ব্যাপার জানার কৌতূহলও তার নেই। আগ্রহও নেই।

যদিও বা পিতা ও নয়াবেগমের মনোমালিন্য সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করবার অবকাশ থাকত—হঠাৎ যা কোনদিনও চিন্তার বহির্ভূত ছিল, যে চিন্তা অসম্ভব তাই ঘটল রাজঅন্তঃপুরের মধ্যে। আর তার প্রধান নায়িকা জিনৎ। জেবুন্নিসা যে বহিনকে সবচেয়ে বেশী পেয়ার করত সেই বহিন জিনৎ হঠাৎ এমনি একটি অসম্ভব ঘটনার প্রধান নায়িকা হয়ে উঠল।

তখন ঔরঙ্গজেব মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুর উপদ্রব নিবারণের জন্য নবাব শায়েস্তা খাঁকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছেন। এই জলদস্যুরা ভীষণ ধূর্ত ও কৌশলী। নবাব শায়েস্তা খাঁ শেষপর্যন্ত এদের সঙ্গে পারবেন কিনা সম্রাটের সন্দেহ ছিল। সেইজন্যে তিনি গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে সর্বদা সংবাদের জন্য ছটফট করছিলেন।

এই সময়েই এই ঘটনা ঘটল। সম্রাটের চিন্তিত মনে জিনতের বেইমানী তাকে দারুণভাবে আঘাত হানল। জেবুন্নিসাও চমকাল হঠাৎ জিনতের সাহস দেখে। কিন্তু মনে মনে সে বহিন্‌কে তার সাহসের জন্য তারিফ করল।

যে বহিন ছিল চিরকাল লাজুক, যে কখনও মরদের মুখ দেখলেই লজ্জায় লাল হয়ে যেত, যার কল্পনা ছিল মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া—জীবনটা আল্লার আরাধনায় কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া যার আর কোন চিন্তা ছিল না—তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে জেবুন্নিসা চমকে উঠল। বহিনের বর্তমান অপরাধের কথা চিন্তা করে দেখল, সে অন্যায় কিছু করে নি। যৌবন তো চলে গেছে। সবুজ পত্রে তো অনেককাল আগেই পিতল রঙের ছোপ পড়েছে। বুলবুলের সুমধুর স্বর জীবন থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

সে যে যন্ত্রণায় অহরহ জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, জিনৎ যদি সেই যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে তাহলে সে যা করেছে, বেশ করেছে, ঠিক করেছে। এই তার করাই উচিত ছিল।

আওরংজীবনের বিনিদ্র রাত্রিগুলির বেদনা আর কেউ না বোঝে বুঝুক, সে বোঝে! সে জানে, দুনিয়ার সমস্ত বেদনাকে পরিহার করা যায়, সাময়িক উত্তেজনার পর স্তিমিত হয়ে যায়—কিন্তু রমণীর জীবনের এই না পাওয়ার বেদনা যে কত যন্ত্রণাদায়ক সে একমাত্র নিজেই জানে। কতদিন এমনি এই রাত্রিতে তার মনে হয়েছে—শাহজাদার জীবনে তো মহব্বত অভিশাপ, কিন্তু সম্রাট আকবর তো শাহজাদীদের ইন্দ্রিয় দমন করতে কোন বিধান আরোপ করে যান নি তবে কেন তারা সংযম রক্ষা করে বুভুক্ষু অন্তরের বেদনা নিয়ে পবিত্রতার নিশান তুলে মোগল হারেমের শালীনতা বজায় রাখছে? ঐতো প্রাসাদের বাইরে সৈনিকদের শিবির থেকে আসছে তাদের সরাবীমনের হৈ-হুল্লোড়। নর্তকীরা চটুল হয়ে নেচে তাদের হৃদয়-মনের মেকি মহব্বতের রোশনাই জেলে সৈনিকদের রাতের মুহূর্তটুকু উপভোগ করতে হাতছানি দিচ্ছে।

ওরা পিচ্ছিল জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে লুটছে কী? লুটছে আগামীদিনগুলিতে বাঁচবার রসদ। ওরা যুদ্ধ করে, সংখ্যায় সংখ্যায় মরে। ওদের প্রাণের অল্প স্থায়িত্বটুকু নিয়ে ওরা আনন্দ করে ভুলে থাকে। আর তাদের দীর্ঘজীবনের অবসাদ নিয়ে টেনে টেনে চলা, তার মধ্যে নেই কোন আনন্দ, কোন সুখ। শুধু বেঁচে থাকার একটি দুঃসহ টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্মৃতির ভারে চলেফিরে বেড়ানো। তার চেয়ে যদি কোনদিন ঐ সৈনিকদের মাঝে একটি রাত্রের আনন্দটুকু জীবনের স্মৃতি করে রাখা যায়, হয়ত সেজন্যে বহু অপরাধ মনে জমা হবে, মনে হবে নিজে কত ছোট হয়ে

গেলাম, কিন্তু তবু একটু ক্ষীণ আনন্দ মনের মধ্যে সুড়সুড়ি দেবে, সেই একটু সুখ, একটু শান্তি, তার গুরুত্ব অনেক বেশী।

সে পারেনি কিন্তু জিনৎ পেরেছে। জিনতের মনের ভিতরকার ছবিটি জেবুন্নিসা নিজের দর্পণে ফেলে মেলালো। মিলে গেলো। কিন্তু আশ্চর্য লাগল এই ভেবে যে, জিনৎ কেমন করে অত ছোট হয়ে যেতে পারল! যার পিতা হিন্দুস্তানের সেরা বাদশাহ। যাদের বংশ রাজবংশ। বিরাট ঐশ্বর্যের মধ্যে আমিরীদম্ভের রোশনাই জেলে যারা হারেমের স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে সুখস্বপ্নে দিন কাটায়। যাদের কথা চিন্তা করে সারা হিন্দুস্তানের আওরতেরা ঈর্ষায় ঈর্ষান্বিতা হয়ে ওঠে। যে ঈর্ষার আগুনে পুড়ে বাদশাহের রঙমহলে প্রবেশ করবার জন্যে কাবুল, মালব, পারস্য, উজবেক, রাজপুতানা, ইস্পাহান, ইরান, বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানের আওরতেরা মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হতেও দ্বিধা করে না; সেই বাদশাহের হারেমের বাদশাহের কন্যাদের মানসিক অবস্থা কত মন্দ সে যদি কেউ জানত?

জিনতের হঠাৎ সম্মানহানিতে জেবুন্নিসা শুনতে পাচ্ছে, তাদের দিকে যারা ফিরেছিল তারা ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করে মুখ ফেরাচ্ছে। ফিসফিস করে আলোচনার তুফান তুলে চারদিকে দুর্ণামে ভরিয়ে দিচ্ছে। জেবুন্নিসা এও শুনল, বাদশাহ ঘটনাটাকে চাপা দেবার জন্যে তাঁর গুপ্তকক্ষে সৈনিকটির বিচার করে তাকে বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণে হয়ত তার দেহ মুণ্ড থেকে বিভক্ত হয়ে মাটিতে লুটচ্ছে। জিনৎ কি করছে, একবার দেখলে হত? কিন্তু উৎসাহ নেই। অবসাদ ও ক্লান্তিতে সারা মন ছেয়ে গেছে। কি আর করবে? হয়ত চৈতনা ফেরার পর কান্নায় বুক ভাসিয়ে পালঙ্কের সাটিনের নরম বালিসের বুকে দাগ আঁকছে। আর অবাক হয়ে ভাবছে, এ সে কি করল? কেমন করে করল? সমস্ত শরীরের পাকে পাকে ঘৃণার কুহেলী হয়ত তার গতরাত্রের সৈনিকের স্পর্শের লজ্জাকে ঢেকে দিচ্ছে!

জিনৎ কি সরাব পান করেছিল? সরাব পান করলে অবশ্য শরীরে এমন একটি মাতন আসে, যা রোধ করে নিজেকে ভোলানো যায় না। সে আগে সরাব পান করত, সে জানে অনুভূতি। কিন্তু জিনৎ তো কখনও সরাব পান করে নি? সে ছোটবেলা থেকেই কেমন যেন অন্যধরণের। তাকে এই হারেমের পরিবেশে কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হয়। তাম্বুল সেবন করে অধর রঞ্জিত করা, বা উগ্রপ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে মেলে ধরা—এসব কোন

কিছুই তার ছিল না। তার পোষাক ছিল শুভ্র, শুধু সে চোখে সুরমার প্রলেপ লাগাত। তাও পিতা সিংহাসনে বসবার পর ত্যাগ করেছিল। শুধু সে বলত, শাহজাদী জাহানারা যে কবে তাকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেবেন!

সেই জিনৎ আজ দারুণ এক দুঃসাহসের কাজ করল। পিতা হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েছেন! তিনি তাঁর এই কন্যাটিকে নিয়ে কখনও কিছু চিন্তা করেননি। বদরও যেখানে উল্লেখযোগ্য ছিল, জিনৎ সেখানে নিষ্প্রাণ। সেই নিষ্প্রাণ আওরতের দ্বারা কোন সমস্যা কোনদিন আরোপিত হবে না, বাদশাহ পিতা জিনতের বিষয় মন থেকে অপসারিত করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু যাকে প্রাসাদের মিনারের সঙ্গে তুলনা করে হারেমের শোভা বলে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তার এই প্রাণের সাড়ায় সকলেই চমকিত হলেন।

জেবুন্নিসা নিজের কক্ষ থেকে ইচ্ছে করেই বের হল না। বেরুলে পাছে কতকগুলি ভিন্নমতের মাঝখানে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়, সেইজন্যে সে জিনতের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করে চুপ করে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকল। আর তাছাড়া সান্ত্বনা দেওয়ার কি আছে? সে তো ভুল কিছু করে নি। সে তার আসল মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে নিজেকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে। সে এগিয়ে গেছে নিজের মুক্তির জন্য। নিজে দিয়েছে তার দেহ উপচার। কেউ ছিনিয়ে নেয় নি। কেউ তার ওপর বলপ্রয়োগ করে নি।

হাততালি দিতে ইচ্ছে করে। যেন হাতির লড়াই। একদিকে মৃত্যুর লোমহর্ষক ক্রীড়াচাপল্য নিয়ে দর্শকরা মাতামাতি করছে, আর একদিকে ক্রুদ্ধ দন্তের ও শুঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে মাহুত বেচারী মৃত্যুকে বরণ করছে। তবু এ খেলা বাদশাহের রাজত্বে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জেবুন্নিসা সেই হাতির লড়াইয়ের তুলনা দিয়ে জিনতের জয়লাভের জন্য হাততালি দিতে চাইল। জিনৎ নিজেকে সঁপে দিয়েছে। আওরৎ যখন নিজেকে সঁপে দেয়, তার অপরাধ নাকি চরম। দুনিয়াতে আওরতের ইচ্ছার ওপর কেউই গুরুত্ব আরোপ করে না। যুগে যুগে শুধু আওরতেরা প্রহার সহ্য করেছে, কখনও প্রহার করেনি।

সম্রাট আকবরও আওরৎদের শ্রদ্ধা করতেন না, কিন্তু তাদের বিলাসের উপকরণের মত ব্যবহার করতেন। সম্রাট আকবর কেন—মোগল বংশের

প্রতিষ্ঠাতা তৈমুর নিজেই তাঁর আত্মজীবনী 'মালফুজাতই-তৈমুরা'তে লিখে গেছেন, তিনি আওরৎকে বিলাসের উপকরণের মত মনে করেন। 'তুজুক-ই বাবরী'তেও সেইকথা লেখা। হুমায়ুন-নামা লিখেছিলেন বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম। কিন্তু আশ্চর্য, আওরৎ নিজে নিজেদের জাতিকে অদ্ভুত এক বিলাস-সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা করে অবমাননা করেছেন। আবার এও লেখা আছে অসংখ্য সৈনিক যেমন যুদ্ধের জন্য বেঁচে থাকে, তাদের যুদ্ধের জন্যই মূল্য, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তাদের যেমনি মূল্য থাকে না, তেমনি আওরৎ ভোগের জন্য সৃষ্টি, ভোগ করা হয়ে গেলে তাদের হত্যা করলেই তবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো হয়।

এরপর সম্রাট আকবর আওরৎদের জন্যে চরমতম আদেশ ঘোষণা করলেন। মাতা ও সহোদরা ভগিনী ছাড়া অন্যসকল আত্মীয় রমণীদের সঙ্গে দূষণীয় শাদীতে অনুমতি দিলেন। বাদশাহ আকবর আগ্রাবাসিদের দুইপ্রকার বেগমের ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। আইনমতে শাদী চারজনের বেশী নয়, কিন্তু অপরপক্ষে রমণী থাকবে অগণিত। এবং সংখ্যা অনির্দিষ্ট। শুধু তাদের আহারের ব্যয়ভার বহন করতে পারলেই অনুমোদিত। বাদশাহ আকবর এই প্রকারে শুধু রাজকুমারদের মধ্যে নয়, তাঁর শাসিত সমস্ত সাম্রাজ্যে লাম্পট্য ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন।

আওরতেরা মোগল বাদশাহ কর্তৃক এই সম্মান পেয়ে চিরদিন অবহেলিতা হয়ে এসেছে। সেই মোগল বাদশাহের কালেই জিনতের এই নিজস্ব ইচ্ছা প্রকাশ, মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে দারুণ আলোড়ন। হয়ত এরকম অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু জিনতের মত এমনটি নয়। জিনৎ উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে দুনিয়াতে আসেনি, তার এই হঠাৎ ঘুমন্ত যৌবনকে জাগিয়ে তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করা—। সম্রাট পিতার আজকের চিন্তা কী একবার জানতে পারলে ভাল হত। তিনি আওরৎজীবনের কিছুই বোঝেন না। তাঁর কাছে বিলাসিতার কোন মূল্য নেই। তিনি বিলাসিতাকে বর্জন করেছেন। সরাব পান করেন না, নর্তকীর চটুল ছন্দের নৃত্য, গীতবাদ্যের মাতন তাঁর কাছে নিষিদ্ধ কিন্তু খাব্‌সুরত আওরতের উষ্ণস্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় তিনি তা নিষিদ্ধ করেননি, তার অর্থই হল তিনি আওরতের উপভোগে নিজের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম। জিনতের আজকের এই অবস্থান্তর কি তিনি বুঝতে পারবেন? হয়ত মনে মনে বলবেন, দুর্ঘটনা, এ দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। তাঁর এই বৃহৎজীবনে

এই সামান্য দুর্ঘটনায় চিন্তিত হলে রাজকার্য করা যাবে না। তুচ্ছ বলে তাই সমস্যাকে লঘু করে ভুলেছেন সব। আর কন্যার রক্তের সঙ্গে নিজের রক্তের যা সংযোজন আছে, তার জন্য যদি কোন দোলা লাগে, তিনি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন, একদিন অসহমুহূর্তে নরনারীর মিলনে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তাঁর জীবনে হঠাৎ এই আকস্মিক আন্দোলন। বাদশাহ বৃহৎ জীবনের মহান পুরুষ, জগতের সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ।সুতরাং এসব তুচ্ছ প্রাণের হঠাৎ বিদ্রোহে বাদশাহের দুশ্চিন্তা উপযোগী নয়।

এমনি কত কথাই ভেবেছে জেবুন্নিসা। স্বপ্নের মত প্রাত্যাহিক কাজগুলি সম্পন্ন করেছে আর ভেবেছে। কিন্তু কক্ষের বাইরে কখনও যায় নি। একদিন এর মধ্যেই শুনল, জিনতকে শাহজাদী জাহানারা তাঁর বর্তমান আবাসে দিল্লীর আলীমর্দন প্রাপ্ত ম্যানসন প্যালেসে গ্রহণ করেছেন। আগ্রার দুর্গ ছাড়বার পর শাহজাদী জাহানারা দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করতে চান নি, তিনি ভিন্ন একটি পরিবেশে মৃত ভ্রাতাদের কন্যাদের নিয়ে ও পিতার বেগম ও অন্যান্য কন্যাদের নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। জিনৎও শেষপর্যন্ত সেখানে গিয়ে শান্তি পেল। জিনৎ মুক্তি পেল। বিভীষিকার রাজ্য থেকে চলে গিয়ে তার জীবনে নতুন আলোকের রোশনী জ্বলল।

একদিন এমনি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জেবুন্নিসা কেঁদে ফেলল। জিনৎ একটি স্নেহের ছায়ায় স্থান পেয়ে শান্তি পেল, আর সে পেল না। লোকে জানে, সে সুখী। কিন্তু কিসে সুখী জানে কি? হয়ত সম্রাট পিতা তাঁর প্রিয়তম কন্যার গুণের অনেক ফিরিস্তি চারদিকে ঘোষণা করেন, তাইতে অনেকে প্রশংসা করে। কিন্তু তারা যদি কেউ জানত? আচ্ছা, জিনতের মত সে কোনদিন উল্কার মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে না? মিয়াবাই আজ যদি থাকত তাহলে মিয়াবাইয়ের স্নেহশীতল বক্ষে মাথা রেখে সে শান্তি খুঁজত।

তার কক্ষে আজ আর কেউ আসে না। ইখতি আগে নিজের ইচ্ছায় আসত এখন নতুন সম্মানে তার মালেকা ভূষিতা হতে—না ডাকলে আর আসে না। এখন ঘণ্টাধ্বনি করলে অনেকে আসে। আদেশ করলে তামিল করতে এক মিনিটও দেরী হয় না। কিন্তু ফরমাইস ছাড়া কেউ হাত তুলে ইচ্ছে করে ছুটে এসে আন্তরিকতা প্রকাশ করে না। করে না তার কারণ,

ভয়ে—যদি শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। একজন শুধু আপন ছিল, সে জিনৎ। সেও আজ মায়া কাটিয়ে চলে গেল শান্তির পারাবারে।

এমনি যখন মানসিক অবস্থা একদিন কেন যে কাশ্মিরী বেগম উদিপুরী জেবুন্নিসাকে ডাকতে পাঠালেন, পরবর্তী জীবনে এ রহস্য তার কাছে কোনদিনও উদ্ঘাটিত হয় নি।

এই রমণীকে জেবুন্নিসা মনেপ্রাণে ভয় করত। হয়ত শ্রদ্ধাও করত। সে শ্রদ্ধা ভয়ের শ্রদ্ধা। পিতার রমণী বলে শ্রদ্ধা। কিন্তু রূপের অহঙ্কার যে রমণীকে রমণীর ইজ্জত ভোলায় তাকে জেবুন্নিসা ঘৃণা করে। সেইজন্যে সে মনে মনে উদিপুরী বেগমকে ঘৃণা করত। তবে সে কথা কখনও প্রকাশ করত না। কারণ উদিপুরী পিতার সম্পত্তি, পিতা যার ওপর আকৃষ্ট, পিতার সঙ্গেই তার সম্বন্ধ—তাঁর কন্যার পছন্দ অপছন্দে যায় আসে কি?

তবে এই বেগমের কতকগুলি অহঙ্কারের দৃষ্টান্ত বাইরে এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল যে মনে প্রথম প্রশ্নই আসত—যে বাদশাহ নিজের বাহুবলে সমস্ত শত্রুকে নিধন করে রক্ত বইয়ে দিয়ে সিংহাসনে আসীন হলেন, সেই বাদশাহ জগতের তুচ্ছতম এক রূপসী আওরতের মেকি জৌলুসের অহঙ্কারের মাঝে নিজের শক্তিকে বলি দিলেন? কেন? কেন? কী আছে ঐ বেহেস্তের হুরীর মত প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের উপকরণ নিয়ে আবির্ভূতা আওরতের? শুধু রূপ ছাড়া তো কিছুই নেই। রূপের এত মূল্য?

জেবুন্নিসা অনেকদিন এই কথাই ভেবেছে! পিতার ওপর তার দারুণ রাগ হয়েছে। দারাশিকোর আওরৎকে নিয়ে উচ্ছিষ্ট যৌবনের পণ্যাকে হারেমের সর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি কি নিজের মনের দুর্বলতাই প্রকাশ করে বসলেন না? অথচ খৃষ্টান বাইজী, এই আওরতের রূপ ছাড়া, গুণ কণামাত্র নেই। পথে পথে ঘুরে লোকের মনোরঞ্জনে যার অর্থ উপায়—সে কিনা ভাগ্যগুণে হিন্দুস্তানের বাদশাহের হারেমে স্থান পেল? স্থান পেল বাঁদী হয়ে না, সম্রাজ্ঞী হয়ে। আশ্চর্য ভাগ্য নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন এই বিদেশিনী রমণী।

জেবুন্নিসা কখনও ভুলেও যায়নি উদিপুরী বেগমের খাসমহলে। শুনেছে সেই মহলটি নাকি বাদশাহ তাঁর সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন দিয়ে নিজের মত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। ঢুকলেই নাকি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এও নাকি প্রচারিত হয়েছিল, বাদশাহ নিজের অন্তরের গভীর মহব্বতের পুষ্প নির্যাস দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর নয়া বেগমের খাসমহল। জেবুন্নিসার কৌতূহল

ছিল, মহলটি একবার দেখবার। কিন্তু পাছে পিতার বিরাগের কারণ হয় এই ভেবে সে তার কৌতূহল দমন করেছে।

তারপর চলে গেছে বহুবছর। উদিপুরীও কখনও তাকে তাঁর খাস-মহলে আমন্ত্রণ জানান নি। সেদিন জানাতে তাই সে চমকিত হয়ে সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে বাঁদীর সঙ্গে ছুটল উদিপুরীর মহলে।

পিতা ছিলেন না প্রাসাদে। কোথায় যেন গিয়েছেন! সংবাদ ঠিক সে জানে না, তবে শুনল। মনে হয় পিতা না থাকার জন্যেই উদিপুরী তাকে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস করেছেন। অবশ্য দুঃসাহসেরও কিছু নেই। উদিপুরীর ইচ্ছার কাছে বাদশাহের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। উদিপুরী বাদশাহকে দিন-রাত্রের সর্বক্ষণ কাছে আহ্বান করেন না, মাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার প্রাসাদে নেমে এলে দু ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ ছিল উদিপুরীর মহলে। এটা নাকি উদিপুরীর অনুরোধ নয়, আদেশ। আর সে আদেশ বাদশাহ পালন করতেন। দু'ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে তাঁর দৈনন্দিন মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হত। উদিপুরী নাকি তার বেশী এক মুহূর্ত বাদশাহকে মহলে থাকতে দেন না। বলেন: 'সুন্দর জিনিসের উপভোগ অল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করতে হয়, বেশী পেলে তার আর মূল্য থাকে না। আমি নিঃশেষ হয়ে গেলে বাদশাহের এই সম্মান আর পাব না, তখন অন্য বেগমদের মত বাদশাহের অবহেলিতা হয়ে রোদন করতে বসবো।'

উদিপুরীর কথা সমস্ত আওরতের কথা। কিন্তু উদিপুরীর অহঙ্কার সমস্ত আওরতের অহঙ্কার কিনা চিন্তা করতে হয়। বাদশাহ উদিপুরীর এই নির্দেশ মেনে নিয়ে বলপ্রয়োগ না করে চলে যান দেখে বড়ই আশ্চর্য লাগে। সেই-জন্যে উদিপুরীকে আওরতের সম্মানে সেলাম জানাতে হয় এই বলে যে তিনি বাদশাহকে বশীভূত করেছেন!

বাঁদীর সঙ্গে যখন জেবুন্নিসা মহলে প্রবেশ করল—অবাক হয়ে গেল। স্বর্ণময় উজ্জ্বল স্বর্ণের পাতে মোড়া সমস্ত মহলের দেয়াল, তার নীচে মানুষ সমান দর্পণের জৌলুষ। রক্তবর্ণ ভেলভেটের সাটিনের ঝালর ঝুলছে খিলানের কাছ থেকে। তার নীচে বাঁধা রেশমী সুতোয় মুক্তার সারি। মাঝে মাঝে শ্বেতমর্মরের অস্তিত্ব দেয়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। কোন গবাক্ষের আঁধার থেকে আলো বিকীরণ করে মহলের চতুর্দিক ভরিয়েছে, বোঝা যায় না। কিন্তু তাতে অপরূপ শোভা হয়েছে মহলের। মহলের এক কোণে একটি কাকাতুয়া।

হঠাৎ এদের দেখে কাকাতুয়াটি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল—কে কে? তারপর নিজেই বলল—ও বাদশাহের কন্যা জেবুন্নিসা। উদিপুরী ডাকতে পাঠিয়েছে। কিন্তু যাস্ নি, যাস্ নি তোর সর্বনাশ করবে—ও শয়তানী, ওকে আমি চিনি…। বলতে বলতে কাকাতুয়াটি দাঁড় থেকে সরে গিয়ে মুখ ফেরাল।

জেবুন্নিসার বড় কৌতূহল হল। কাকাতুয়াটির কথাগুলি শুনে পাশে বিস্ময়ে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—ও কি করে জানলো রে আমাকে? আমাকে ও কখনো দেখেছে?

বাঁদী কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—সে জানে না।

জেবুন্নিসা কাকাতুয়াটির কথা ভুলে মহলের চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলতে লাগল। এ মহলটি মনে হচ্ছে, বাদশাহ নয়াবেগমের জন্য নতুন করিয়েছেন। তাই এখন সমস্ত গড়নটি বড় অদ্ভুত। এর ডিজাইন একেবারে আজকের বাদশাহের মনোমত। শ্বেতমর্মরের খাঁজে খাঁজে হীরেগুলি থেকে জ্যোতি বিকীরণ করছে। তারপর মখমলের ভারী পর্দা সরিয়ে আলোর রাজ্যে গিয়ে পড়ল জেবুন্নিসা। প্রথমেই তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারপর চোখ সয়ে গেলে হঠাৎ তীক্ষ্ণহাসির শব্দ শুনতে পেল। হাসিকে অনুসরণ করে দেখল জেবুন্নিসা, কক্ষের চারদিকে ঐশ্বর্যের রোশনাইয়ের ওপর আলো পড়ে আলোর বন্যা বয়েছে! আর সেই আলোর রাজ্যে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের অংশ কক্ষের সমস্ত সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়ে নড়ে চড়ে উঠল।

জেবুন্নিসার চোখে আলো সয়ে গেলে সে দেখল তার পিতা তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের বেশীর ভাগই এই মহল সাজাতে ব্যয় করেছেন। সোনারূপা, হীরে, জহরত, মণিমুক্তার চেকনাই, তার সাথে নানাবর্ণের কাপড়ের সমন্বয়—অন্য এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কক্ষের মধ্যে সরাবের খুসবাইয়ের সাথে ছড়িয়ে আছে ইস্পাহানী আতরের সৌরভ। বেশভূষার চাকচিক্য নয়াবেগমের বড় চমকদার। চুলের ওপর অদ্ভুত কারুকার্য করা একটি রোশনাই জ্বালা কোহিনূর। সেটি চুলের চুড়ো করে মাথার সামনে লাগান হয়েছে। বুকের ওপর দিকে মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহার, দেহের বর্ণের ওপর থেকে ঔজ্জ্বল্য বেরিয়ে আসছে। বক্ষের সম্পদের ওপর একখণ্ড গোলাপী মসলিনের কাঁচুলী। তাতে সবটুকু ঢাকা পড়ে না। ওপর দিক থেকে কুসুমস্তম্ভ লোভাতুর হয়ে বেরিয়ে আছে। জেবুন্নিসা একবার সেইদিকে তাকিয়ে

চোখ নামিয়ে নিল। উদিপুরী পালঙ্কের ওপর বসে বসে বাঁদীর হাত থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে পান করছিলেন। তাই তাঁর হ্রদের নীলজলের মত নীল চক্ষুদুটি জড়ানো। ঢুলুঢুলু। তাম্বুল রঞ্জিত রক্তাক্ত অধর দুটিতে যেন কি এক মায়ামোহর ছটা অন্যকে আকর্ষণ করছে। উদিপুরীর দেহবাস খুব বেশী আবরণের মধ্যে নয়। একটি মসলিনের কাপড় সারা শরীরকে বেড় দিয়ে বুকের ওপর তোলা। দেহগত উন্মুক্ত সুষমা লেহন করে জেবুন্নিসা মনে মনে স্বীকার করল—বাদশাহ অন্ধমোহে মুগ্ধ হননি, যে কোন মরদই এই আওরৎকে দেখে দুনিয়া ভুলবে।

জেবুন্নিসা কক্ষে ঢোকার পরই উদিপুরী সরাবের নেশাতেই বাদশাহ-জাদীকে এক লহমা দেখে নিয়েছিলেন তারপর তাঁর স্বভাবস্থ হাসির গমকে কক্ষের আলোগুলির প্রাণে কম্পন জাগিয়ে চৌচির করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর বাঁদীকে নির্দেশ দিয়ে অন্য একটি ডিভানে জেবুন্নিসাকে বসতে বলেছিলেন। জেবুন্নিসা কুর্নিশ করতে ভুলে গিয়েছিল, তারপর তাড়াতাড়ি কুর্নিশ করে ডিভানে গিয়ে বসল। তার যেন কেমন অবাক লাগছিল! এত কাছে কখনও আসেনি উদিপুরী বেগমের। আজ যেন কাছে এসে বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। কী অদ্ভুত এই রমণী উদিপুরী বেগম! পিতাকে আগে সে দোষ দিয়েছে কিন্তু এখুনি এই মুহূর্তে আর দোষ দিতে পারে না, উদিপুরীকে এই পরিবেশে আগে কখনও দেখেনি। ছোটবেলায় অপর আওরতের মহলে ঢোকবার অধিকার ছিল না, দারাচাচা উদিপুরীর সঙ্গে কেমন পেয়ার করতেন, দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আজ নতুনরূপে নতুন পরিবেশে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় উদিপুরীবেগমকে দেখে জেবুন্নিসা হতচকিত হয়ে গেল।

উদিপুরী জড়িতস্বরে কথা বললেন—দুজনে একই প্রাসাদের ছাদের নীচে বাস করি, অথচ কত বছর পরে দেখা। তোমার কী কৌতূহল ছিল না আমাকে দেখবার? একবার তোমার পিতা তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, ব্যস্—তারপর এই এতগুলি বছর দুজনে কখনও নিজেদের মনে পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করিনি। কিন্তু কেন? তুমি কি আমাকে মনে মনে হিংসে কর? আমার এই সৌভাগ্যে কি তোমার ঈর্ষা জেগেছে। আবার নিজের মনে মনেই হেসে বললেন—সব আওরতেরই জাগে। হিন্দুস্তানের বাদশাহ যার রূপের পায়ে মাথা বিকিয়ে একটু করুণা চায়, তাকে ঈর্ষা করবে

না এমন আওরৎ কে ছুনিয়াতে আছে? কেউ যদি বলে আমি ঈর্ষা করি না তাহলে সে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা!

তারপর অনেকক্ষণ বাদে উদিপুরী জিজ্ঞেস করলেন জেবুন্নিসাকে—তুমি কি বল বাদশাহজাদী, আমি সাচ্চাবাৎ বলছি না?

জেবুন্নিসা চুপ করে থাকল।

উদিপুরী প্রচুর সরাব পান করলে কি হবে—চেতনা হারায় নি। জেবুন্নিসা চুপ করে আছে দেখে বললেন—তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর বাদশাহজাদী?

জেবুন্নিসা কি বলবে? বলবে কি যে, হ্যাঁ সে ঘৃণা করে আজকের বাদশাহের প্রেয়সীকে। বাদশাহ যে রূপে অন্ধ হয়ে তাঁর সত্তা বিলিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন, তাঁর কন্যা সে রূপকে ঘৃণা করে, রূপসীকেও। মেকি রূপের জৌলুষে সাময়িক চোখ ধাঁধানো যায় কিন্তু চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ কথা বলার সাহস জেবুন্নিসার আছে। সৎসাহসের পরিচয় দিতে তার ভয় নেই। পিতার বিচার যদি তার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়, তবু না। কিন্তু একটা প্রশ্ন হঠাৎ জেবুন্নিসার মনের মধ্যে জেগে উঠল, পিতা যাকে প্রেয়সার আসনে বসিয়ে সাম্রাজ্যের উচ্চাসনে বসিয়েছেন, সে কি সামান্য রূপের জন্য? আর কি অন্য কোন গুণ নেই নয়াবেগমের? পিতার এমনি খাবসুরত বেহেস্তের হুরীর মত রূপসী আওরৎ বহু আছে মহলে মহলে, তাদের তো কাউকে নয়াবেগমের সম্মান দিতে পারতেন, তা না দিয়ে এই উদিপুরীকেই দিলেন। উদিপুরীর সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে তিনি সামান্য কৃপার প্রার্থী হলেন! অথচ এইমুহূর্তে এই প্রশ্ন মনে জাগছে—শুধু উদিপুরীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। আর সেইজন্যেই মনে হচ্ছে, এ রমণী বাইজী-বংশোদ্ভূত হলেও এঁর ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাদশাহের হারেমের সমস্ত রমণীরাই স্বার্থের সঙ্গে জড়িতা। স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের মনের আবরণ উন্মোচন করে রিক্ত হয়ে যান। কিন্তু এই রমণী তা না করে অদ্ভূত কৌশলে সবকিছু জয় করেছেন। পিতা যে কৌশলে সিংহাসন জয় করেছেন, উদিপুরী সেই কৌশলে সাম্রাজ্ঞীর আসন জয় করেছেন। বাদশাহের মন কেড়ে নিয়েছেন। তাই আওরৎজীবনে এই রমণী এই মুহূর্তে নমস্যা। তাঁকে ঘৃণা করা যায় না।

উদিপুরী আবার তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করতে জেবুন্নিসা মাথা নেড়ে

বলল—না বেগম সাহেবা, আমি ঘৃণা করি না, বরং শ্রদ্ধা করি আমার আম্মাজানকে।

কেন? উদিপুরী খুসি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

জেবুন্নিসা বলল—এইজন্যে যে, আমার আম্মাজান আওরৎজীবনের সবচেয়ে মহৎ ইজ্জতকে বজায় রেখে তিনি জগতের সেরা আওরতের সম্মানে উপনীতা হয়েছেন।

তাহলে সরাব পান কর। এই বলে উদিপুরী খুসী হয়ে বাঁদীকে সরাব পরিবেশন করতে বললেন।

জেবুন্নিসা ইতস্তত: করল। সরাব সে বহুদিন পান করে নি। পান করার ইচ্ছাও নেই। অভ্যস্তও নয় সে। তাই বাঁদী সরাবের পাত্র এগিয়ে দিলে জেবুন্নিসা উদিপুরীর দিকে তাকিয়ে বলল—গোস্তাফি মাপ করুন আম্মাজান, আপনার অসম্মান করার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু আমি বহুদিন হল সরাব পান করা ছেড়ে দিয়েছি।

উদিপুরীর হাতেও পাত্রভর্তি সরাব ছিল, তিনি সে পাত্র নিঃশেষ করে মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত করে বললেন—বাদশাহের পেয়ারী কন্যা কি তাহলে সরাবের চেয়ে অন্য কোন নেশার জিনিসে অভ্যস্ত হয়েছেন? তারপর নিজেই সংযত হয়ে বললেন—তুমি আমাকে আম্মাজান বলেছ। এখন আমি মা। আমার একটি পুত্র জন্মেছে। এখন আমি আওরতের হৃদয় থেকে মাতৃত্বের হৃদয়ে পরিবর্তিত হয়েছি। আমার বক্ষের রমণী রত্নের স্পর্শে দয়িতের সুখ উপভোগের ইন্তেজার নয়, এখন মাতার স্তনে সন্তানের অধিকার, সন্তানের দেহের পুষ্ট সাধনের দায়িত্ব যার গর্ভে সেই সন্তান ভ্রূণ হয়ে প্রথম এসেছিল। তাই আমি বুঝি—মাতৃত্বের কি বেদনা? তুমি আম্মাজান বলে আমাকে লজ্জা দিয়ে আমার সমস্ত গর্ব খর্ব করে দিলে! তাহলে মা হয়ে সন্তানের বেদনার অধিকার গ্রহণে কোন লজ্জা নেই, তোমার সমস্ত দুঃখ আমি জানি। তোমার কেন—এই হারেমে যতগুলি শাহজাদী আছে তাদের সবার দুঃখ জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

তারপর আবার বাঁদীর হাত থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন—একটা কথা আমি বুঝতে পারিনে, জীবনটা কিসের জন্য! আওরতের দিলের সমঝদার কি এ জগতে মেলে? এ দুনিয়ার স্বার্থপরতা আওরতের জীবনের সঙ্গে বৃক্ষশাখে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করে তার রংবাহার

সৌন্দর্য, মন মাতানো সৌরভ উপভোগ করে পদদলিত করে চলে যায়। সেই পুষ্পসম ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপভোগটাই বড়, সেই অল্প উপভোগ নিয়েই বেঁচে থাকা। আর যদি কখনও কখনও কেউ সম্মান দিয়ে ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে দীর্ঘতর করে দেয়—তাহলে তো তার মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু আওরতের জীবনের সেই দীর্ঘস্থাযিত্ব খুবই কম। নদীর বুকে জলবিন্দুর মত মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। আমার জীবন দিয়েই তুমি দেখতে পাচ্ছো? এইবলে একচোট খুব হাসলেন উদিপুরী। বোধ হয় তার নেশার ঘোর আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে আলোড়ন জাগিয়ে তুলছিল। বললেন—আজ হিন্দুস্তানের বাদশাহ আলমগীর আমার এতটুকু কৃপার জন্যে তাঁর বাদশাহী জান আমার কাছে সঁপে দিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। তাঁর সমস্ত সম্মান আমার কাছে বিক্রী করেছেন আর আমি সওদা কিনে বিনিময়ে অর্থ না দিয়ে কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছি। হাঃ হাঃ হাঃ। আবার হেসে উঠলেন, উদিপুরী বেগম তাঁর অপরূপ রূপসৌন্দর্য আন্দোলিত করে।

তারপর জেবুন্নিসার দিকে ফিরে বললেন—সরাব পান করে বেটি নিজের আওরৎ-দিল্ মজবুত করে নাও। জানবে, কেউ তোমার পাশে নেই। তুমি যে মরুভূমির মাঝে উত্তপ্ত বালুকণার ওপর দাঁড়িয়েছিলে, সেখানেই আছ। আর যে ঈশ্বরকে এতদিন ডেকে মুক্তি চেয়েছ, সে ঈশ্বর তোমার না, সে ঈশ্বর একটি খাবসুরত নর্তকীর ইস্তেজারে। তার যৌবনের উছল স্রোতে কত পুরুষের হৃদয় ভেসে যায়, তারই হিসাব গণনায় ঈশ্বর ব্যস্ত। আর তুমি পাপ ও অন্যায় বলে যা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, ঈশ্বরকে তেমনি করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, ঈশ্বর তোমার না, ঈশ্বর কর্মীর।

উদিপুরী এবার টলতে টলতে বক্ষবাস ঠিক করতে করতে পালঙ্ক থেকে উঠে এলেন, এসে জেবুন্নিসার হাত থেকে সরাবের পাত্র গ্রহণ করে তার মুখে ধরে দিলেন, বললেন—পিও। দুনিয়ার সমস্ত সুখ এই গুলাবী খুসবাই সরাবের ভেতর আছে বলে আজ আমি এর সাথে বেশী মহব্বত করি। তোমার পিতা সরাবে অভ্যস্ত নন, সঙ্গীতে অসন্তুষ্ট কিন্তু রমনীর রূপসুধায় তাঁর বিরাগ নেই। কিন্তু আমি তাঁকে বহুবার সরাবে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি, তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন, আমিও বলেছি সরাবের পাত্র যখন বাদশাহের ঘৃণার বস্তু আমিও সরাবেরই মত, বরং সরাবের চেয়ে আরও নেশার সম্পদ—আমাকেও ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দাও! বাদশাহ সভয়ে তাড়াতাড়ি মহল

ছেড়ে চলে গেছেন। আমার কথার জবাব তার কাছে নেই বলে, তিনি আল্লার নাম জপতে জপতে ছুটে পালিয়ে গেছেন।

জেবুন্নিসা তখন পাত্র নিঃশেষ করেছিল, উদিপুরী ইসারায় বাঁদীকে আবার দিতে বলে, জেবুন্নিসার দিকে তাকিয়ে বললেন—হঠাৎ এতদিন পর তোমাকে কেন ডাকলাম, ডেকে কেন সরাব পান করতে বললাম। তোমার পিতার ব্যবহারের নমুনা দিয়ে আওরংজীবনের সত্যিকারের সম্মান কি—তার কথা বললাম। এসব শুনে হয়ত তুমি আশ্চর্য হয়ে গেছ। হয়ত ভাবছ বোধ হয় অনেক কথা। কিন্তু তোমার আশ্চর্য হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার পিতাকে আমি যত ঘৃণাই করি, তিনি আমার সাথে মহব্বত করেন। একটি আওরৎ মহব্বত পেলে গর্বিতা হয়, এ বোধ হয় তোমার জানা নেই। আমি তোমার পিতাকে ঘৃণা করলেও গর্বিতা! তোমার পিতার দেওয়া রাজসম্মানের চেয়ে আমার কাছে এই মহব্বতের সম্মান অনেক বেশী। সেইজন্যে তোমার পিতাকে ঘৃণা করলেও তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। এবং তাঁর যাতে কোন অমঙ্গল না হয় তার প্রতি আমার সচেতন দৃষ্টি। বাদশাহের কাছেই শুনেছি তাঁর কন্যাদের কথা। জিনৎকে এমনি একদিন ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও এমনি তোমার মত উপদেশ দিয়েছিলাম। সরাব সে কিছুতে খায়নি কিন্তু মনের মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বিষের চিন্তা। তার পরের ঘটনা অবশ্য জান। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি, আমি তার ভালই চেয়েছিলাম। আমার রহস্যময় কথাগুলির সারাংশ যে বড় অশ্রুমুখর অর্থ নিযে প্রকাশ পায়, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। সে না বুঝতে পেরে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

আমি বলেছি—উপভোগ কর। যে উপভোগে চিত্ত সায় দেয়, সেই উপভোগে নিজের বেদনা মুছে নাও। বলিনি, অন্ধকারে হারিয়ে যাও। যে পথে আলো নেই, যে পথে সম্মানের তরবারী নিয়ে সৈনিকরা অভিবাদন করে না, সেই পথ গ্রহণ কর।

অনেক কথা বলে উদীপুরী কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পালঙ্কে গিয়ে অর্ধশায়িতা হয়ে পড়লেন। আর জেবুন্নিসা পাত্রের পর পাত্র সরাব পান করে নেশার ঝোঁকে শায়িতা উদিপুরীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। হ্যাঁ, এতদিন সে আর সরাব পান করে নি। ভেবেছে, নিজের ব্যথিত, ক্ষতবিক্ষত মনের ওপর যন্ত্রণা আরো পাকে পাকে জড়িয়ে যায় সরাব পান করলে। সরাব

পান করলে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিকে দমন করা যায় না। বরং বহুকালের সুপ্ত-কামনা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু আজ বহু-অভ্যস্তা উদিপুরীবেগম তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করলেন, সরাবের নেশায় অনেক বেদনা রঙিন হয়ে আবার স্বপ্ন জাগায়, উপভোগের আনন্দ অনুভবের তীর্থে উপনীত হয়ে আলোড়ন জাগায়। বেদনার উপশম হয়। বাঁচবার প্রেরণায় নতুন দুনিয়ার স্বপ্ন চোখে ভাসে।

যে কথাগুলি উদিপুরী বললেন সেগুলি সবই তারই বর্তমান জীবনে প্রযোজ্য। অথচ উদিপুরী জানতেন না, তার বর্তমান মনের বেদনাতুর ছবি। এইজন্যে উদিপুরীর কথাগুলি শুনে ভারী আশ্চর্য লাগল জেবুন্নিসার। এই রমণীটি এতগুলি বছর হারেমের একটি অংশে বাস করে আসছেন, তাঁর কাছে কত সান্ত্বনার সরোবর—অথচ সে সরোবর খুঁজতে আসমানের বিশাল দিকে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজেছে, হারেমের এই অংশে দৃষ্টিস্থাপন করে নি। দৃষ্টি দেবে কি—উদিপুরী বেগমকে সে এতদিন অবজ্ঞাই করে এসেছে! যে রমণী নিজের রূপ, যৌবন দেখিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সম্মান গ্রহণ করেন, সে রমণী আর যাই হোক অন্তত অন্য রমণীর কাছে সম্মান পাবেন না, এটা জানাই কথা। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে কার? জেবুন্নিসা মনে মনে তাই আফশোষ করে উদিপুরীর কাছে নিজেকে সঁপে দিল। দুঃখের ভার লাঘবের জন্য ক্রন্দনে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। উদিপুরীকে বলল—আম্মাজান, দুনিয়াতে অতি-আপনার কেউ নেই বলে জানতাম, কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেঙে গেল।

উদিপুরী উঠে বসে মৃদুহেসে বললেন—বেটি, আওরতের জীবনে তুমি আমি একই আসামী, দুঃখের সে তারতম্য উভয়ের মধ্যে আছে, চিন্তা করলে দেখবে, তা প্রায় একই। শুধু হয়ত প্রকাশের তফাৎ। জীবনটাকে দুঃখের গণ্ডি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে তার মধ্যে কিছু আনন্দ সংযোজন কর, দেখবে মুক্তি পাবে, শান্তি পাবে, স্বস্তি পাবে।

হঠাৎ উদিপুরী উঠে দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে অন্য মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন। তারপর চীৎকার করে বাঁদীদের বললেন—নিকাল যাও হিঁয়াসে। বাঁদীরা চলে গেলে জেবুন্নিসার কাছে মাতাল উদিপুরী সরে এসে জেবুন্নিসার চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন—আমাকে বিশ্বাস করেছ? আমাকে শ্রদ্ধা করেছ? আমাকে ঘৃণা করার আর কোন হেতু নেই তো!

তাহলে ভাল করে তাকিয়ে দেখ কক্ষের ঐ কোণে। এই বলে উদিপুরী সামনে আলোগুলি নিবিয়ে দিয়ে, কক্ষের একটি কোণে অনেক আলোর স্রোত বইয়ে দিলেন।

জেবুন্নিসা তার নেশার চোখেই অবাক চাউনি নিয়ে তাকিয়ে থাকল। উদিপুরী কক্ষের সেই আলোময় কোণের একটি মূল্যবান পর্দা রেশমী-দড়ি টেনে সরিয়ে দিলেন। চোখের ওপর ধ্বক্ করে উঠল একটি দৃশ্য। জেবুন্নিসা সেই দৃশ্য দেখে কেমন যেন লজ্জারক্ত হয়ে মাথা নীচু করল। একটি স্পষ্ট সম্ভোগের দৃশ্য শিল্পীর তুলিতে রঞ্জিত হয়ে কক্ষের কোণের শোভা বর্দ্ধিত করেছে। পুরুষ ও রমণীর এই নগ্ন সৌন্দর্যের অপরূপ দৃশ্যশোভা অবলোকন করে জেবুন্নিসার বুকের মধ্যে কম্পন শুরু হল। হঠাৎ উদিপুরী পাগলের মত হেসে উঠে বললেন—আমায় কিন্তু শ্রদ্ধা করতে ভুল না বাদশাহ কন্যা। আমি আওরৎ জীবনে হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে বসে আছি।······মানুষের উপভোগের চিরন্তন দৃশসম্ভার তুলে আমি আমার মনের রূপটাই তুলে ধরেছি। ···কিন্তু জেবুন্নিসার কানে বোধ হয় সব কথা গেল না। তার মনে হল, তাকে বুঝি কেউ সম্ভোগের জন্যে আকর্ষণ করে বলপ্রয়োগ করছে। জেবুন্নিসা ছুটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। না, না এ সে চায়নি। এ তার প্রয়োজন নেই। ওরা রমণী নয়, ওরা প্রেমিক নয়, ওরা রূপসী নয়, ওরা পশু। পশুর শরীরে ওরা পশুর মত আকাঙ্খা মেটাতে চায়।

সেদিন জেবুন্নিসা চলে এল তার ঘরে। ভাবল অনেক কথা। কিন্তু সব ভাবনাগুলির সমাধান উদিপুরীবেগমের সপক্ষেই হল। দুনিয়া নিঃসাড়, পাথর, নির্জীব এসব উপাধি এতদিন সেই দিয়েছিল। দিয়েছিল কারণ, সে নিজেই তার জীবনে এইগুলির আবির্ভাব কামনা করেছিল। মহব্বত করতে চেয়েছিল বটে কিন্তু মহব্বত পায়নি বলে নিজেকে নষ্ট করেছে। নষ্ট বলতে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, উচ্ছৃঙ্খল হলে তবু বেঁচে যেত। নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে আওরতের শরীরে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে সমস্ত দেহের সুকুমারী লালিত্য কঠিন হয়ে রূঢ় হয়ে গেছে। যৌবনের আকাঙ্খা দমিত করে যৌবনকে বিদায় জানাতে আজ রূঢ় ব্যবহার করছে। আজ আর মনের মধ্যে এমন কেউ স্বপ্নমনের কল্পনা নিয়ে বাস করে না, যার চিন্তায় বাকী জীবন কেটে যেতে পারে। মুবারক স্পর্শ দিলেও সে স্পর্শ এখন স্বপ্ন।

সুলতানকে ভালবাসলেও সে অলীক সম্পদ মনের মধ্যে রেখাঙ্কিত হয় না। তাই উদিপুরীর চিন্তা মনের সপক্ষেই সায় দিল। উদিপুরীর নগ্নমনের ছবি ঘৃণা জাগালেও আওরতের জীবনে যে উপভোগই চরম, বেঁচে থাকায় রসদ, তাকে জেবুন্নিসা অস্বীকার করতে পারল না। তাই একদিন উদিপুরী তার বন্ধুস্থানীয়া হয়ে উঠল।

পিচ্ছিল স্রোতের আনন্দে যে এত আবেগ, জেবুন্নিসার আগে জানা ছিল না। আগে জীবনের সময়গুলি ব্যয়িত করবার জন্যে তার চিন্তার শেষ ছিল না। আর এখন তার দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন যে কেমনভাবে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে লাগল, সে জানতেই পারল না। উদিপুরী তার মাতৃত্বের স্নেহ দিয়ে, আওরৎমনের আকাঙ্খা দিয়ে আনন্দের রসদের এমন আশ্চর্য আশ্চর্য সন্ধান দিতে লাগলেন যে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব—কন্যার মনের গতিবিধির সন্ধানে চমকিত হয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু কন্যার চিন্তায় সময় অতিবাহিত করা আর হল না। পর পর অনেক ঘটনাই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বাইরে ঘটতে লাগল, যার জন্যে বাদশাহকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হল।

রাজকোষ শূণ্য। অর্থ যোগাড় করতে হবে। না হলে সাম্রাজ্য আর রাখা যাবে না। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মাথায় দিনরাত নতুন নতুন ফন্দীর উদ্ভব হতে লাগল। অর্থ চাই। ঐশ্বর্য চাই। মুঠি মুঠি ধনসম্পদ কোথায় লুকোনো আছে, সারা হিন্দুস্তান খুঁজে বের করতে হবে। লুঠ করতে হবে। সম্রাট আকবর যে 'জিজিয়া' হিন্দুদের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিলেন, মোগল বাদশাহরা হিন্দুদের শ্রদ্ধা করে তা আর পুনঃপ্রবর্তন করেন নি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, গোঁড়া মুসলমান ঔরঙ্গজেব সমস্ত সাম্রাজ্যটা মুসলমানের প্রমাণ করে তিনি হিন্দুদের ওপর সেই 'জিজিয়া'ই পুনঃপ্রবর্তন করলেন। হিন্দুদের মধ্যে দারুণ এক ভীতির ভাব জেগে উঠল। কোন কোন হিন্দুর ঔদ্ধত্যের অপরাধস্বরূপ তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হল। বহু হিন্দুর মুণ্ড আবার ঘাতকের কৃপাণের নীচে দ্বিখণ্ডিত হল। রক্তের স্রোত বইল।

কিন্তু 'জিজিয়া' পুনঃপ্রবর্তনেও হাড়ী হাড়ী অর্থ এসে রাজকোষ পূর্ণ হতে লাগল না। বরং অধিকাংশ লোকই প্রাণ দিতে লাগল, কিন্তু অর্থ দিল না। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চাই অর্থ। শেষকালে তিনি হিন্দুর মন্দির ধ্বংসে আত্ম-

নিয়োগ করলেন। তিনি সন্ধানে জানলেন, হিন্দু রাজাদের বহু ঐশ্বর্য ঐ মন্দিরগুলির মধ্যে সঞ্চিত আছে। ঔরঙ্গজেব বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আদেশ জারি করলেন—বিধর্মীদের দেবালয় ও বিদ্যামন্দির ভেঙে ফেলা হোক। তাদের ধর্মকর্ম ও ধর্মপ্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হোক। হিন্দুস্তানের যেখানে যত দেবমন্দির মাথা তুলে এতদিন ভক্তজনের সেবা পেয়ে মন্দিরের শুচিতা রক্ষা করছিল, মোগল সৈন্যের পদধূলিতে সে সব মন্দির অপবিত্র হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার কেশবদেবমন্দির ও গুজরাটের সোমনাথ মন্দির বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কবলে পড়ে ধূলিসাৎ ও লুণ্ঠিত হল।

বাদশাহের মেজাজ তখন খুব উষ্ণ ছিল। তিনি খুব কমসময়ই দিল্লীর প্রাসাদে থাকেন। আভ্যন্তরিন কোন ঘটনা জানবার অবকাশ তাঁর হয় না। তবে তাঁর চর সর্বত্র। মোগল হারেমেও যে তাঁর চর ছিল না তা নয়। তিনি সন্দেহী, সুতরাং সন্দেহ তাঁর সকলকে। হারেমের মধ্যে তখন তিনি তিনটি আওরতের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এমন কিছু শুনতে লাগলেন যাতে তাঁর মন চিন্তান্বিত হয়ে উঠতে লাগল। রোশোনারা, উদিপুরী ও জেবুন্নিসা। উদিপুরীকে কিছু বলতে পারেন না, কারণ উদিপুরীর সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেন না। তা ছাড়া তিনি বড় দুর্বল উদিপুরীর কাছে। তিনি তো জেনে শুনেই বিষধর সর্পকে নিজের বক্ষে স্থান দিয়েছেন। জেবুন্নিসার সম্বন্ধে সঠিক কিছু প্রমাণ পান না কিন্তু কন্যার প্রতি মমতা তাঁর অসীম। যদি কোন অপরাধ সে করে, তাকে তিরস্কার করে নিষেধ করতে পারেন, তার বেশী কিছু করতে পারেন না। কারণ জগতে স্নেহের কাঙাল তিনি। এই কন্যার প্রতি স্নেহ দিয়ে ও ভালবাসা নিয়ে তিনি নিজের বুভুক্ষ অন্তরের জ্বালা মেটান। তা ছাড়া, জেবুন্নিসা থাকবেই বা কি নিয়ে—তাও চিন্তার বিষয়। কন্যার শাদীর ব্যবস্থা করতে হবে। জীবনের অনেকগুলি বছর সিংহাসনলাভের গোলমালে কেটে যেতে এদিকে তাকানোর সময় হয়নি। কোন একটি সুপাত্র যদি পাওয়া যায়, তাহলে এই কন্যাটির শাদী দিয়ে তিনি মুক্ত হবেন। মনে মনে তিনি পারস্যাধিপতির পুত্র শাহজাদা ফরুকের কথা চিন্তা করেছেন। তবে সে যে কতদূর সম্ভব হবে, তার কোন চিন্তাই উপস্থিত বাদশাহের মগজে নেই। তবে তিনি খুব শীঘ্র এই কন্যার ব্যবস্থা করবেন।

চিন্তা শুধু রোশোনারাকে নিয়ে। এবং রোশোনারা আজ বৃদ্ধ বয়স

পর্যন্ত দাম্ভিকার মত হারেমের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছেন। এই রমণীর সঙ্গেও বাদশাহ পেরে ওঠেন না। দিল্লীর সিংহাসন-জয়ের সাহায্যের জন্য তিনি আজও নির্ভয়ে তার খুসীর বল্গা ছুটিয়ে চলেছেন। তখন বাদশাহ বহুচর হারেমে নিযুক্ত করেছেন। পর পর দুটি বাইরের লোককে রাত্রিবেলা হারেমের ভেতর থেকে পাওয়া গেল!

একদিন গভীররাত্রিতে খোজা মহলের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। রোশোনারার মহল থেকে দুটি পরিচারিকার সঙ্গে একটি যুবক বেরিয়ে এল। যুবকটি অবশ্য কিঞ্চিৎ ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল কিন্তু খোজার কাছে ধরা পড়ে গেল। সে হুঁশিয়ার বলে চীৎকার করে যুবকটিকে ধরতে গেল, যুবকটি পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ছুটে পালাল। তারপর অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে পথ না খুঁজে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। একসময় প্রহরীর চোখে আবার পড়ে ধৃত হয়ে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছে নীত হল।

বাদশাহ ক্রুদ্ধ না হয়ে বেশ শান্তকণ্ঠেই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কেমন করে এই অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে! অকপটে সত্যকথা প্রকাশ কর, তা'হলে শাস্তি লঘু হবে।

যুবকটি ভীত হয়ে উত্তর দিল—সে প্রাচীর টপ্‌কে রাত্রিতে অন্তঃপুরে ঢুকেছিল।

যুবকটিকে আর অধিক প্রশ্ন না করে বা কোন কঠোর দণ্ড না দিয়ে যেমনভাবে এসেছিল তাকে সেইভাবে মুক্তি দেবার জন্যে নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় যুবকটি যখন ধরা পড়ল, তখন সে বলল, সে এসেছে সামনের ফটক দিয়ে।

সম্রাট আশ্চর্য হয়ে তাকে সেই ফটক দিয়ে সোজা বেরিয়ে যেতে বললেন এবং খোজাদের শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করলেন। এবং তার পরদিন কঠোর দণ্ডও দিলেন।

তারপর অবশ্য অনেকদিন গত হয়েছিল।

সংবাদটা প্রচারিত হল রোশোনারার খাসবাঁদী কুলসমের চাৎকারে। মালেকানার সরাবের সাথে কে বা কারা বিষ মিশ্রিত করে তাকে হত্যা করেছে। বিশেষ করে রোশোনারার মৃত্যু। যে আওরৎ দুষমনের মত হারেমের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে প্রত্যেককে জ্বালিয়েছে। সেই আওরৎ এমনি অপঘাতে প্রাণ হারাতে প্রত্যেকে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

প্রত্যেকেরই মনে সন্দেহ—এ কাজ কে করল? কারণ শাহজাদী রোশোনারা প্রতি আওরতের শত্রু। প্রত্যেকেই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেইজন্যে হারেমের মধ্যে সমস্ত আওরৎদের মুখ শুকোল। সম্রাট বাদশাহ কাকে শাস্তি দেন তার কিছুর ঠিক নেই। হত্যাকারিণী যে বেরিয়ে পড়বেই, মোগল হারেমের সব আওরৎই জানে।

জেবুন্নিসা শুনেছিল শাহজাদী রোশোনারার মৃত্যু-সংবাদ। সেও বিস্ময়ে ভাবছিল—এ কাজ কে করল? উদিপুরীবেগম কদিন ধরে শাহজাদী রোশোনারার সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করছিলেন। তিনি কি গোপনে বিষ মিশিয়ে বোশোনারাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন?

কিন্তু আবার সে পরক্ষণে ভাবল, সেও যেমন ভাবছে একজনের কথা। তার সম্বন্ধেও কেউ না কেউ ভাবছে এই একই কথা। কারণ তার সঙ্গে রোশোনারার বহুদিন ধরে মনোমালিন্য চলে আসছে এ প্রায় সমস্ত দিল্লীর লোকই জানে। হত্যাকারী যদি কাকেও সাব্যস্ত করা যায় তাহলে তাকেই প্রথম করবে! হয়ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবও সেই সন্দেহ করে তার বিচারের ব্যবস্থা করবেন।

জেবুন্নিসা যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ল। মৃত্যুর জন্যে তার আগ্রহ ছিল কদিন আগে কিন্তু আজ মৃত্যুর দিকে পিছন করে সে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চায়। সে বাঁচতে চায়। রোশোনারার এই অদ্ভুতভাবে মৃত্যু! শাহজাদী রোশোনারা মারা গেছেন। যতবড় শত্রুই হোক্ তবু নিকট আত্মীয়া রোশোনারার মৃত্যুতে মনে শোকের ছায়া পড়ে। জেবুন্নিসা একদিন হয়ত তাঁর জন্যে খুবই কাঁদত। কারণ রোশোনারা তার সঙ্গে ঝগড়া করতেন বলে জেবুন্নিসার মন শাহজাদী রোশোনারার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। বদর-উন্নিসার নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব একদিন নিঃশেষ হতে তার কান্না আসেনি সত্যিকথা, কিন্তু রোশনারার মৃত্যুতে তার কান্না আসত। সে শোক করতে পারত যদি তার আগের মত মন থাকত। কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেছে। এ পরিবর্তন সাময়িক কিনা সে তা জানে না। তবে এখন তার মৃত্যুর জন্য ভয়। আবার সে তার জীবনকে ভালবাসতে শুরু করেছে। বাঁচতে হবে। দুনিয়াতে তার জন্যে অনেক আনন্দময় বস্তু আছে, তার আস্বাদন না করে সে মরবে না। সে এখন নতুন পোষাকে সেজে নতুনরূপে তার বিদায়ী যৌবনকে আবার আহ্বান জানাচ্ছে। এখন দুনিয়ায় আসমানের বিচিত্র রংফেরা অবাক

হয়ে দেখে। বুলবুলের মিষ্টি সুস্বর শোনার জন্যে কাণ পাতে। সরাবের নেশায় মন রঙীন হলে তার মাথায় অনেক উদ্ভট পরিকল্পনা জাগে। সে বাদশাজাদীর দম্ভে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে পিতার দেওয়া ক্ষমতাগুলির সদ্ব্যবহার করে।

এক একসময় অবশ্য তার অবাকই লাগে। মানুষ স্বভাবের নোকর। সে আজ যেভাবে নিজের স্বভাবের পরিবর্তন করে আওরৎ জীবনের অভিশাপকে খণ্ডন করতে চাইছে, সে কি তা তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পারবে? অনুশোচনা জাগে না। দুর্ভাবনা জাগে। সেইসময় রোশোনারার এই অপমৃত্যু! জেবুন্নিসা জানবার চেষ্টা করল, বাদশাহ পিতা এখন রোশেনারার মৃত্যুতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? কিন্তু শুনল, বাদশাহ আশ্চর্য স্তব্ধ! অবাক লাগল জেবুন্নিসার। আবার অবশ্য পরক্ষণে রহস্য সন্ধান করে খুশী হয়ে উঠল। পিতা নিজেই চেয়েছিলেন তাঁর বহিনের অপসারণ? তবে কি পিতাই আবার আওরতের রক্তে নিজের জীবন কলুষিত করলেন? আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু তার সঙ্গে মনে হয়, উদিপুরী বেগমের কারসাজী আছে। উদিপুরী বেগম বহুকাল ধরে রোশোনারাকে হারেম থেকে সরানোর চেষ্টা করছেন সে কথা তিনি নেশার ঘোরে বহুবার উচ্চারণ করেছেন, জেবুন্নিসা শুনেছে।

তবু জেবুন্নিসার ভয়—শেষপর্যন্ত সেই না হত্যাকারী সাবস্ত হয়ে যায়! আজকের প্রকৃতি বিচার করলে বাদশাহ পিতা যে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন না সে তা জানে। কারণ বহুদিন সে ইচ্ছে করেই বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেনি, বাদশাহ ডাকতে পাঠালে সে 'তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি' বলে প্রহরীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাতে বাদশাহ পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। আজ এই অবস্থায় বাদশাহ ডাকতে পাঠালে তাকে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। আজ যদি সে 'তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি' বলে প্রহরীকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে বাদশাহ পিতা ঠিক সন্দেহ করবেন অপরাধী বলে।

জেবুন্নিসা রুদ্ধাবেগে অপেক্ষা করতে লাগল পিতার সংবাদ প্রত্যাশায়। এবং সংবাদ এক সময়ে এল। সে আর অপেক্ষা না করে পিতার সমীপে গিয়ে উপস্থিত হল।

পিতার মুখটি খুবই গম্ভীর। তিনি যে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জেবুন্নিসা উপলব্ধি করল। তবে কি তিনি বহিন্ রোশোনারার

মৃত্যুতে শোকার্ত ? কিম্বা হারেমের পবিত্রতা বিনষ্ট করে হত্যার আয়োজনে ক্ষুব্ধ ? কে জানে ? কি তিনি ভাবছেন, বোঝা গেল না। অবশ্য হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে যে ধনসম্পদ তিনি নিয়ে এসেছেন, তা যে পর্যাপ্ত নয়—তার চিন্তাতেও গম্ভীর হতে পারেন। যাই হক বাদশাহ পিতার সামনে ভয়ে ভয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে তিনি বললেন—আর এক পক্ষকাল পরে রমজানের পুণ্যমাস আসছে। রবিয়ল-আউয়ল, রবিয়স্‌সানি ও জমাদিয়ল-আউয়ল, জমাদিয়স্‌সানি, রজব, শাবান তারপরে আসছে এই রমজান। কালোরাতের পর চাঁদ দেখার এই রাত। দুষমনের শয়তানীর পর আল্লার আশীর্বাদী মানুষের আগমন। মহম্মদ এইদিন জেরুসালামের মসজিদ থেকে সশরীরে বেহেস্তে গিয়েছিলেন এবং আল্লার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। এখন দুনিয়াতে যাঁরা ধার্মিক, যাঁরা নিজেদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মহম্মদের পথ অনুসরণ করছেন—তাঁরা এ সময় পবিত্রমনে এই মাসে নিজেদের মুক্তির সাধনা করেন।

তারপর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব কন্যার নতমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি আমার কন্যার কাছ থেকে গোঁড়া মুসলমান সমাজের সুন্নি সম্প্রদায়ের পবিত্র মন আশা করি। যারা জগতে দুষমনের সৃষ্টি দুনিফার আকর্ষণীয় বস্তুতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা আল্লার অনুগ্রহ পায় না। আমি আমার কন্যার কাছ থেকে অনেক বড় মনের পরিচয় পেতে চাই, আর সে মন যেন আধ্যাত্মিক কল্যাণের রূপ হয়। ঐহিক সুখরাশির নেশায় প্রমত্ত মূঢ় মানবের মত পারত্রিক-ব্যাপারে উদাসীন হয়ে খোদার মেহেরবাণী থেকে যেন দূরে থাকা না হয়। শিশু বয়সে কোরাণের সমস্ত অনুচ্ছেদ অদ্ভুত বাক্যস্ফুটনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে আবৃত্তি করেছিলে বলে তোমাকে সর্বোচ্চ ত্যাগের উপাধি প্রদান করেছিলাম, 'হাফেজ'। সে কথা কি আমার প্রিয়তমা কন্যা বিস্মৃত হয়েছে ? দুনিয়ার সমস্ত ভোগের আশা ছেড়ে দিয়ে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করাই সুপথে পরিচালিত হবার উপায়। তুমি কি জান না, কোরাণের মধ্যে মহম্মদের একই বাণী লেখা আছে, জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি —খোদারই সৃষ্টি !

টপ্‌ টপ্‌ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। জেবুন্নিসার মুখ নত। চোখ দুটিও নত। অপরূপ সুন্দর গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে অশ্রুবিন্দু।

ঔরঙ্গজেব কন্যার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন : আমি আজ সমস্ত হিন্দুস্তানের সম্রাট। এতটুকু সময় নেই আমার

অন্যকাজে ব্যয় করবার। কিন্তু তবু আমি সর্বদা মাথার ওপরে সেই সর্বশক্তি-মান যোদ্ধা খোদাকে স্মরণ করি। তাঁর বাণী শোনবার জন্যে আমি নিঃশব্দ হয়ে একমিনিটকালও সময় অতিবাহিত করি। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার সর্বদা আগ্রহ কিন্তু আমি কখনও সম্রাটের কর্তব্যে একচুলও অবহেলা প্রদর্শন করি না। বিনিদ্র রাত্রিযাপন করে আমোদ-প্রমোদ বর্জন করে আমার এই কর্তব্যের প্রতি অটল বিশ্বাসই আমাকে আল্লার কাছে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ জেবুন্নিসা ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠল—আমি কি করলে আপনার শান্তি আসবে তাই বলুন, আমি আর দুনিয়ার ভাল ভাল কথা শুনতে চাই না। আমি আজ কেন খোদার মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত হয়ে বর্তমানের অদ্ভুত জীবনে অভ্যস্তা হয়েছি যদি আপনি জানতেন পিতা? যদি জানতেন আওরতের জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ আছে, এবং সে সেই সন্ধিক্ষণ কাটিয়ে আল্লার প্রতি মন সমর্পণ করতে পারে না—তাহলে নিশ্চয় আপনি আমাকে তিরস্কার করতেন না, বরং অনুগ্রহ দেখাতেন।····· পিতা আমি আজ অপরাধী, আমাকে শাস্তি দিন। আমি পিতার বিশ্বাসহন্তা হয়ে নিজের আত্মিক চিন্তাতেই মনসমর্পণ করেছি। কিন্তু পারি নে যে আর—। আমি যে অনেক চেষ্টা করেছি—। এই বলে জেবুন্নিসা চোখে হাত চাপা দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল। রুদ্ধাবেগ তার উজাড় করে পিতার কাছে সব বলতে পেরে যেন অনেক শান্তি পেল। সে যেন অনেক হালকা হয়ে গেল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবও বিস্মিত হলেন। এমন বিস্ময় তাঁর জীবনে খুব কমই এসেছে। কন্যার ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন। কিন্তু কন্যার ব্যথায় বিগলিত আর্জিগুলি অস্বীকার করা যায় না। বরং স্পষ্টস্বরে সে তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে অনেক কথাই জানা হয়ে গেল। জেবুন্নিসা তখনও কাঁদছিল, সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার পিঠে হাত রেখে কন্যাকে সান্ত্বনা জানালেন কিন্তু জেবুন্নিসার কান্না আরও তীব্র হয়ে উঠল। সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। কিন্তু তোমার কষ্ট জেনে আমার মনও বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। বল, কি করলে তোমার কষ্টের অবসান হয়, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি। দুনিয়ার একটি মানুষের উপকারে লাগতে পারলে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। বিশেষ করে যে কন্যাকে আমি পিতার স্নেহ দান করেছি।

জেবুন্নিসা কোন কথার উত্তর দিল না, তবে তার কান্নার আবেগ অনেক স্তিমিত হল। বাদশাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন—আমি পুরুষ, আওরতের মনের বেদনা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমার প্রিয়তমা কন্যার মনের বেদনা বুঝব না, এরকম মন কি আমার নেই? আমি তোমার শাদীর আয়োজন সম্পন্ন করব জেব। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা কর—সাম্রাজ্যের চারদিকে এখন 'জিজিয়া'র বিরুদ্ধে বিরাট বিদ্রোহ চলছে। হিন্দুদের উচ্ছেদসাধনে বার বার আবার অভিযান চালাতে হচ্ছে। এ অবস্থা একটু শান্ত হলেই আমি তোমার শাদীর আয়োজন সম্পন্ন করব।

জেবুন্নিসা এবার সত্যিই লজ্জিত হয়ে উঠল। আওরতের শরীরে সে পিতার কাছে অকপটে তার মনের রূপটা প্রকাশ করে ফেলেছে বলে দারুণ লজ্জা পেল। কারণ, উত্তেজনায় মানুষ হত্যা করে। সে হঠাৎ উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলেছে। ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে অধর্মকে সঙ্গী করে স্বভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তবে ভালই হয়েছে, জীবনের অনেকগুলি বছর একই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গোপন করে রেখেছে, আজ যদি বের হয়ে থাকে আসল অভিব্যক্তি, ক্ষতি কি? পিতা হয়ত আচমকা কন্যার মনের বিদ্রোহ প্রকাশে বিস্মিত হবেন কিন্তু অস্বীকার করতে তো পারবেন না! তারই সাক্ষী তাঁর পরবর্তী কথাগুলি। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—শাদীর ব্যবস্থা করবেন। জীবনের বহু রমজানের রাত বিনিদ্র রাত্রির দুশ্চিন্তা নিয়ে চলে গেছে। তারা চলে যাবার সময় শুধু স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করেছে তাকে। মহব্বত জীবনে আসে নি। পুষ্পের সৌরভ শুধু সুগন্ধ নিয়ে অন্য হৃদয়-মনে তার বাসা করেছে। এ কুঞ্জে ভোমরার আগমনও নেই, গুঞ্জনও নেই। মাঝে মাঝে যদি বা কিছু ইঙ্গিত আসমানের সূর্যরশ্মির মত মনে উঁকি দিয়েছিল কিন্তু পিতার সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবতারণায় সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সে যুদ্ধ পাঁচ বছর চলেছিল। কিন্তু থামার পরও শান্তি আসে নি। প্রাসাদ থেকে সমস্ত শাহজাদাদের অপসারিত করে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর যৌবন বিদায় নিয়ে চলেছে। আজ পিতা জানাচ্ছেন শাদীর ব্যবস্থা করবেন। পিতার এই অনুগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান উচিৎ। কিন্তু পিতাকে আঘাত করতে তার মনে বাজবে। তিনি ধূর্ত হতে পারেন, কপটতা তার শিরার শিরায়—কিন্তু আওরতের কিছু বোঝেন না, বুঝলে উদীপুরী-বেগমকে কখনও হারেমে নিয়ে আসতেন না। ঐ উদিপুরীবেগমই যত

সর্বনাশের প্রধানা। তিনিই তার মনে উপভোগের প্রেরণা জুগিয়ে তার মন পরিবর্তন করে দিয়েছেন! পিতাকে বশীভূত করেছেন। জিনতের ধর্ম নষ্ট করেছেন। রোশোনারার মৃত্যু তাঁরই ষড়যন্ত্র কিনা কে জানে?

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আবার কথা বললেন—আমি আমার রাজসভা থেকে সমস্ত কবিশিল্পীদের বিদায় দিয়েছি। দিয়েছি এইজন্যে যে, আমি মনে করি মানুষের জীবনে এর প্রয়োজন খুব কম। বরং যে মানুষের মধ্যে এসব আছে দুনিয়াতে তার কোন মূল্য নেই, সে অকর্মণ্য। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম এইজন্যে যে আমার রাজকার্যের চিন্তাছাড়া কোন ফুরসৎ নেই বলে। কিন্তু দুনিয়াতে আসমান, সূর্যরশ্মি, পুষ্পের সৌরভ, তার রঙ রাত্রের চন্দ্রিমার যেমন প্রয়োজন আছে; মানুষের প্রতিভারও প্রয়োজন আছে। তুমি যদি আমার ব্যস্ততার হেতুতে এইসব প্রতিভাবান শিল্পীদের নিয়ে তোমার হারানো কবি-শক্তিকে জাগিয়ে তোল, তাহলে হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে আমার প্রিয়তমা কন্যার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার মনে হয়, তোমার মনও এইদিকে নিয়োজিত হলে অধর্মের কবল থেকে রেহাই পাবে। অবশ্য শাদীর ব্যবস্থা আমি অতি শীঘ্রই করব, কিন্তু তারজন্য অপেক্ষায় থেকে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে মনটাকে পরিবর্তিত করলে সাময়িক শান্তি পাবে। তাছাড়া মানুষ কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকলে তার মনে অন্যায় বাসা বাঁধে না।

জেবুন্নিসা হঠাৎ পিতাকে বাধা দিয়ে বলল—জাঁহাপনা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার মন-অভিপ্রায়। আমি আমার কবিশক্তি পুনরায় জাগিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করব, আপনি নিশ্চিত থাকুন। তবে প্রার্থনা করি, জীবনের অনেকগুলি বছর চলে গেছে, যাতে বাকী জীবনটা অন্য চিন্তায় কাটিয়ে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করব, আপনি আর শাদীর ইন্তেজার করবেন না। ও শব্দ অনেক শিশু বয়স থেকে মন থেকে বিদায় দিয়েছি। এই বলে জেবুন্নিসা কুর্নিশ করে দ্রুত কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

ঔরঙ্গজেব শুধু বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—তিনি আলমগীর, ভুবনজয়ী খ্যাতি তাঁর। কিন্তু তিনি আওরতের মনের রহস্যভেদে অক্ষম—একথা কেউ না জানলেও তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন। চোখের সামনে দুটি আওরতের সঙ্গে তাঁর বেশী যোগাযোগ। এক, উদিপুরী বেগম, দুই জেবুন্নিসা। একজনকে তিনি প্রেয়সী করে সমস্ত সম্মান দিয়ে হারেমে স্থান দিয়েও তার মন পান নি। আর তাঁর নিজের কন্যা। যে রক্ত

তাঁর শরীরে প্রবাহিত সেই রক্ত ঐ কন্যার শরীরেও প্রবাহিত। অথচ কন্যা আওরৎ বলে তাকে বুঝতে তিনি অক্ষম। সময় নেই। রাজকার্যে সমস্ত সময় চলে যায়। যদি একবার অনেক সময় পেতেন তাহলে দেখে নিতেন—খোদার এই অদ্ভুত সৃষ্টজীবের রহস্য কি? তাদের মনের রহস্য হাজার চেষ্টা করলেও বোঝা যায় না কেন?

জীবনের পড়ন্ত বেলার সময়টি জেবুন্নিসার বড় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

আশ্চর্য, তারপর থেকে জেবুন্নিসা সত্যিই বদলে গেল। মেতে উঠল আবার কবিতা নিয়ে। যে সব কবি, সাহিত্যিকরা দরবার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তাঁরা আবার এসে যোগদান করলেন। জেবুন্নিসার কবিতার অনুশীলন চলল চিকের অবরোধ থেকে। জেবুন্নিসা বের করল তার রচিত পুরনো কবিতাগুলি। সেগুলি পড়ে বর্তমানের মন দিয়ে বিচার করে আরো নতুন নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে লাগল।

প্রকৃতি জেবুন্নিসাকে সৌন্দর্যের ললামভূতা করে সৃষ্টি করেছিলেন, বাইরের রূপ, আর অন্তরের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-প্রতিভা তার অসামান্য গৌরবের কারণ হল। মোগলের নিভৃত ঘনঘোর অন্তঃপুরে পর্দার অন্তরালে বাস করেও জেব্ পত্রাচ্ছাদিত, সুরভি-সৌন্দর্য-মণ্ডিত গোলাপ পুষ্পের মত আপনাকে ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। দেশ দেশান্তরে তাঁর যশ কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিল্পের সমঝদার বলেও তাঁর কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু কন্যার কবিত্ব শক্তিকে জাগ্রত করবার মূলে তাঁর উৎসাহ অনস্বীকার্য। কবিদের তিনি মিথ্যাবাদী চাটুকার বলতেন, তাদের রচনাকে তিনি জলবুদ্বুদের মত ঘৃণা করে তাচ্ছিল্য করতেন। কন্যাকে স্নেহ করার জন্যে আর তার কবিতার প্রতি সম্মান প্রদানার্থে তিনি কন্যার কার্যের সমর্থন করেছিলেন শুধু তাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। কিন্তু তাতে যে শিল্পের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে ফেলেছেন, একথা তাঁর মাথায় আসেনি। এলেও কন্যাকে স্নেহের জন্য তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসবার পর সমস্ত কবিরাই দরবার ছেড়ে, রাজ-অনুগ্রহ লাভে অসমর্থ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু করুণারূপিণী জেবের করুণা লাভ করে আবার তাঁরা দলে দলে যোগদান করলেন। জেবের অনুগ্রহ পেয়ে ঔরঙ্গজেবের

আমলের শিল্পীরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। বাদশাহী অন্তঃপুরের নিভৃত মালঞ্চে বাদশাহজাদীর মানস-লতিকায় যে সব কবিতা গুচ্ছের বিকাশ হতে লাগল তার মুল্যায়ন দুনিয়ায় ইতিহাসে অমরত্ব প্রাপ্ত হল।

জেবুন্নিসা হঠাৎ যেন দারুণভাবে মেতে উঠল এই খেলায়। খেলা ছাড়া কি বলবে? সর্বদাই ব্যস্ততা। সর্বদাই ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর কথা। ভাল ভাল শব্দচয়ন। প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন। মানুষের সুখদুঃখের হিসাব নিয়ে ছন্দের অপূর্ব খেলা। কত বড় বড় কবিরা এসে মহলের কবি সম্মেলনে যোগদান করেন। কেউ তাঁরা জেবুন্নিসার সঙ্গে পারেন না। সবাই পরাজয় বরণ করেন। আর জেবুন্নিসা মেতে ওঠে জয়ের আনন্দে।

এমনি একদিন কবি সম্মেলন পূর্ণোদ্যমে চলছে। জেবুন্নিসা যথারীতি পর্দার অন্তরালে থেকে সম্মেলনে যোগদান করেছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নাসিরালী সরহিন্দী, মির্জা মহম্মদালী সাহেব, মুল্লা হবুগনী, বহরোজ ও সালাউদ্দিন মহম্মদ আলী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বান লোকেরা। কাব্যালোচনা চলছিল। এমন সময়ে উপস্থিত কবিদের মধ্যে থেকে একজন—পংক্তি আবৃত্তি করে পাদপূরণ করতে বললেন—

'অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্'
'যদি রয় একরাত্র রয় দ্বিতীয় রাত্র রয় না'

নাসিরালী পাদপূরণ করলেন—

'হিলাল-এ-ইদ্ চোঁ অব্রু-এ-আঁ দিলবর নমে মানদ্
অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্'
'ইদের চন্দ্র (দ্বিতীয়ার চন্দ্র) প্রিয়তমার ভ্রূর মত রয় না
যদি রয় একরাত্র রয় দ্বিতীয় রাত্র রয় না।'

আর একজন পাদপূরণ করলেন—

'মাহ-এ-দুহফ্তা বরুখ্-এ-দিলরব্ নমে মানদ্
অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্'
'দুই সপ্তাহের চন্দ্র প্রিয়তমার মুখের মত রয় না
যদি রয় একরাত্র রয় দ্বিতীয় রাত্র রয় না।'

আরও অনেক কবিরাই অনেক পাদপূরণ করলেন, কিন্তু কোনটারই বিশেষত্ব বা কিছু সৌন্দর্য না থাকাতে পরিত্যক্ত হল। এরপর জেবুন্নিসা পাদপূরণ করে চিকের অন্তরাল থেকে সুমিষ্টস্বরে আবৃত্তি করে শ্রোতৃবর্গকে শোনালেন।

'হেজার-এ-নৌ অরুসাঁ দরবর শৌহর নমে মানদ্
অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-নমে মানদ'
'পতির বক্ষে (আলিঙ্গনে) নববধূদের লজ্জা রয় না
যদি রয় একরাত্র রয় দ্বিতীয় রাত্র রয় না।'

জেবুন্নিসার কবিতার ভাবার্থ সভাস্থ কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল। তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। জেবুন্নিসার জয় হল। এমনি জয় তার সর্বক্ষেত্রে হতে লাগল। তার বিদ্যানুরাগের কথা ইরান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সে দেশ থেকেও বহু বিজ্ঞজন এবং কবি ভারতবর্ষে যশ কিনবার জন্যে দিল্লীতে আসতে লাগলেন। নাসিরালী সরহিন্দী নামে জেবুন্নিসার কবি সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ কবি এইভাবে একদিন এসে বাদশাহ-দুহিতার কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। কৃপাপ্রার্থী বললে অবশ্য ভুল বলা হয়, জেবুন্নিসাই একদিন নাসিরালীর কবি প্রতিভায় চমকিত হয়ে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিল। ওদের সাক্ষাৎকারটি ছিল বড় চমৎকার।

নাসিরালীর পূর্বপুরুষরা কবিতা রচনা এবং শিক্ষকতা করে জীবিকানির্বাহ করতেন। যদিও নাসিরালী সুকবি ছিলেন কিন্তু নিজেকে সেরূপ মনে করে কখনও গর্ব করতেন না। কারও স্তুতি করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অনাহারে পড়ে থাকতে প্রস্তুত কিন্তু কোন ধনীব্যক্তির মোসাহেব হতে নারাজ। এজন্য তাঁর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। সেই সময় 'আলী' ভণিতাযুক্ত যে সব কবিতা দেখা যায় সে সমস্তই তাঁর রচনা।

নাসিরালীর সুখ্যাতি লোক পরম্পরায় জেবুন্নিসা জানতে পেরেছিল। তাঁর সঙ্গে কবিতা-চর্চার বাসনাও তাই জেবুন্নিসার জেগে উঠেছিল। নাসীরালীর মনেও এরূপ বাসনা অনেকদিন থেকে ছিল। তিনি প্রায়ই ভাবতেন—'যদি কোন রকমে জেবুন্নিসা বেগমের দরবারে প্রবেশ করতে পারি, তাহলে আমার অবস্থার অনেক উন্নতি হয়।' হঠাৎ সে সুবিধা একদিন উপস্থিত হল।

জেবুন্নিসা দিল্লী-দুর্গের অলিন্দের সামনে শিবিকা থেকে নেমে কি একটি প্রয়োজন মেটাচ্ছিল। তার পরনে ছিল মখমলের লাল পোষাক। স্বভাবতই জেবুন্নিসা পরত সাদা পোষাক কিন্তু সেদিন সে লাল পোষাকই পরেছিল। নাসিরালী কোনদিন জেবুন্নিসাকে দেখেন নি কিন্তু তার চেহারার বর্ণনা লোক-মুখে শুনেছিলেন। দেখেই অনুমানে চিনতে পারলেন জেবুন্নিসাকে। তখন তিনি

জেবুন্নিসা যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে চীৎকার করে কবিতা আবৃত্তি করলেন—

'সুর্খ পোশে বলব-এ-বাম্ নজর্ মে আয়দ
নবঙ্কোর্ ও ন বজারী ন বজর মে আয়দ।'

লোহিত বেশধারী এক ব্যক্তিকে অলিন্দের সামনে দেখছি। বলেতে, বিলাপে বা ধন দৌলতে তাকে লাভ করা যায় না।'

এই কবিতা শুনে জেবুন্নিসা চমকিত হল, অনুমান করল এই ব্যক্তি নাসিরালী না হয়ে যায় না। এমন কবিতার পংক্তি যার সৃষ্টি সে অবশ্যই সেই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। এরূপ অনুমান অবধারণ করে সে উত্তর প্রদান করল—

'নাসিরালী বনাম আলী বুরদ-ই-পনাহ
ওরনা ব জুল্‌ফকার এ-আলী সরবুরীদামত্।'

'নাসিরালী তোমার নাম 'আলী' তাই আশ্রয় পেয়েছ। নয়ত আলীর 'জুল্‌ফকার' তরবারিতে তোমার মস্তক ছেদন করতাম।'

জেবুন্নিসা উত্তর প্রদান করে নাসিরালীকে বোঝাতে চাইল—নাসিরালীর 'তখল্লুস' অর্থাৎ ভণিতার নাম 'আলী' ছিল বলে সে আশ্রয় পেল। মহম্মদের জামাতার নামও ছিল 'আলী'। 'জুল্‌ফকার' সাধারণ তরবারী নয়। মহম্মদের তরবারীর নাম 'জুল্‌ফকার'। তাঁর মৃত্যুর পর সেই তরবারী মহম্মদের জামাতা আলী পেয়েছিলেন।

শুধু নাসিরালী নয়, এমনি বহু দুঃস্থ গুণী লেখকই জেবুন্নিসার সাহায্য পেয়ে সাহিত্য-সেবার সুযোগ পান। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জেব্ অনেক সুপণ্ডিত মৌলবীকে যোগ্য বেতনে নূতন পুস্তক প্রণয়ণের জন্য অথবা নিজের ব্যবহারার্থ দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির নকল কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিল। যে সব লেখক তার যত্ন ও চেষ্টায় যশস্বী হন, তাঁর মধ্যে মুল্লা সফী-উদ্দীন অর্দ্দবেলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যচর্চার সুবিধার জন্য সফী-উদ্দীন্ জেবের অর্থে আরামে কাশ্মীর বাস করতেন। তিনি 'জেব-উৎ-তকাসি'র নাম নিয়ে কোরাণের আরবী মহাভাষ্য ফার্সীতে অনুবাদ করেছিলেন। সফী-উদ্দীন বইটি জেবুন্নিসার নামে প্রচার করেন। এরূপ অনেক লেখক জেবের অর্থে প্রতিপালিত হয়ে তাঁদের রচিত গ্রন্থ জেবুন্নিসার নামে প্রচলিত করতেন। লেখকরা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য এরূপ করত।

ঔরঙ্গজেব তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। মথুরার ফৌজদার পরাজিত ও নিহত

হতে তিনি খুবই চিন্তিত। তাছাড়া মথুরার জাঠ কৃষকরা গোকুলা নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়েছিল। এই গোকুলাকে ধ্বংস করবার জন্যেই ঔরঙ্গজেব দিনরাত কৌশল চিন্তা করছেন।

ইদানীং এই ব্যস্ততার জন্য কন্যার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর মোলাকাৎ হত না। একদিন হঠাৎ বাদশাহের সঙ্গে জেবুন্নিসার একটি সুরম্য উদ্যানে দেখা হয়ে গেল। জেবুন্নিসা তখন বৈকালীন বায়ু সেবন করতে পুষ্পোদ্যানে বেড়াচ্ছিল। তাছাড়া তখন বসন্তকালের প্রকৃতি। বৃক্ষডালে নবীন মুকুল বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে, কোকিল কূজনে চারদিক গুঞ্জরিত, মৃদুমন্দ মলয় পবন ফুলের সৌরভে সারা কানন সুবাসিত। মধু ঋতুর এই মনোমুগ্ধকারী সময়ে জেবুন্নিসা ভাবেতে বিভোর হয়ে যায়। প্রায়ই এমনি ভাবে বিভোর হয়ে গেলে তার মুখ থেকে কবিতার চরণ রচিত হয়ে বের হত, এদিনও তাই বের হল।

'চহার্ চিজ্ গম-এ-দিল বুরদ—কদাম চহার
শরাব্ ও সজ্জা ও আব-এ-রোয়াঁ ও রু-এ-নিগার।'
'চারটি দ্রব্য মনের ব্যথা দূর করে—সে চারটি কি
সুরা, শ্যামল মাঠ, ঝরণা ও সুন্দর মুখ।'

সম্রাট ঔরঙ্গজেব হয়ত জেবুন্নিসার কবিতার অর্থ শুনতে পেয়েছিলেন। কন্যার কণ্ঠে সুরা ও সুন্দর মুখের কথা শুনে আবার মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তাই কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আবৃত্তি করছিলে জেবুন্নিসা?

কিন্তু জেবুন্নিসা পিতার চেয়ে ধূর্ত। বুঝতে পারল, পিতার কর্ণে প্রবেশ করেছে তার কবিতার কথা। তাই সুমিষ্ট হেসে পুনরাবৃত্তি করল—

'চহার চিজ্ গম-এ-দিলবুর্দ—কদাম চহার,
নমাজ ও রোজা তসবিহ্ ও তোবা ইস্তগফার।
চারিটি দ্রব্য মনের ব্যথা দূর করে—সে চারটি কি
ঈশ্বরুপাসনা, উপবাস, জপমালা ও
পাপক্ষালনের জন্য তোবা করা।

শুনে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব খুসী হয়ে কন্যাকে প্রফুল্লমনে আশীর্বাদ করলেন, বললেন—দুনিয়াতে তোমার নাম 'জেবুন্‌মনশাত্' হোক্। তোমাকে লোক যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে অভিনন্দন জানাক। আজ আমার কন্যার নাম নিয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠছে।

তারপর জেবুন্নিসার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায় আল্লা সৃষ্টি করলেন। জেবুন্নিসা মহব্বতের মেহেদি রঙে চিত্ত রাঙাতে পারে নি বলে দুঃখ করত। কিন্তু তার দগ্ধ জীবনে একদিন যৌবনের বিদায়-মুহূর্তে মহব্বত এল। দিনের শেষে সূর্যাস্তের পূর্বে যেমন অসামান্য এক জ্যোতি এসে অপূর্ব শোভা দান করে তেমনি জেবুন্নিসার জীবনেও এল সেই সূর্যাস্তের পরিপূর্ণ আলো। নাসিরালী প্রভৃতি কবিরা কবিশ্রেষ্ঠা জেবুন্নিসার কবিতার জন্য যেমন তাকে শ্রদ্ধা করতেন তেমনি মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে কবিতার মধ্যে দিয়ে মহব্বত জানাতেও ছাড়তেন না। কিন্তু জেবুন্নিসা এড়িয়ে চলত। বরং তার সেই মনের রূপ কাব্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে বলত—'যে আমাকে চায় সে নিয়ে নিক্ আমাকে আমার কবিতা থেকেই।'

'হর্ কি দীদন মৈল দারদ—
দর্ শুখন্ বীনদ মরা।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। কবিতার মধ্যে থেকে হৃদয় দেবার আকাঙ্খা জেবুন্নিসা নিজেই ত্যাগ করতে পারল না।

লাহোরের শাসনকর্তা আকিল খাঁ সেই পুরুষ। যাঁর মহব্বতে জেবুন্নিসা নিজেকে বিলিয়ে দিল। দিল্লীতে জেবুন্নিসার কবি সম্মেলন বা 'মশা'রা হত একথা দেশ বিদেশের চারদিকে প্রচারিত হয়েছিল। অনেকেই জেবুন্নিসার এই মশারাতে যোগদান করার আশা পোষণ করতেন, কিন্তু সম্ভব হত না। লাহোরে বসে কবি আকিল খাঁও আশা করতেন জেবুন্নিসার সঙ্গে মিলতে পারলে তাঁর কবি-শক্তি আরও জাগ্রত হবে।

এমনি একদিন সুযোগ উপস্থিত হল। ঔরঙ্গজেব অসুস্থ হয়ে পড়লে বায়ু সেবনের জন্য সপরিবারে লাহোরে গেলেন। জেবুন্নিসাও সঙ্গে গেল। আকিল খাঁ জেবুন্নিসার সঙ্গে এই সুযোগে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জেবুন্নিসাও আকিল খাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু পিতার কঠোর শাসনের আশঙ্কা তাকে নিরুৎসাহ করল।

পারস্য দেশ-নিবাসী সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুপুরুষ আকিল খাঁ যে সুবিজ্ঞ এবং কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার আছে, এ কথা অনেক আগেই জেবুন্নিসা শুনেছিল কিন্তু কোন উপায়ই শেষ পর্যন্ত বের করতে পারল না যার দ্বারা সে আকিল খাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে।

কিন্তু আকিল খাঁ একদিন সেই সুযোগ পেল।

জেবুন্নিসা লাহোরের সুন্দর দৃশ্য দেখে পুলকিত হয়েছিল। সেইজন্যে এই দৃশ্যসম্ভার চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্যে একটি বাগান প্রস্তুতে মন দিল। ফুলের বাগান। নানা রঙের অদ্ভুত ফুল। যাদের প্রাণে জেবুন্নিসার কোমল হাতের ছোঁয়া লেগে অপরূপ হয়ে উঠবে। সৌরভ বিকশিত করে অপরূপ সুগন্ধ বাতাসে ছড়াবে।

সেই বাগান প্রস্তুতে জেবুন্নিসা খুবই ব্যস্ত, এক এক সময় অবশ্য অবসর পেলে সহচরীদের নিয়ে চৌসর খেলা খেলত। একদিন আকিল খাঁ এই সুযোগ অবহেলায় না যেতে দিয়ে মজুরের বেশ ধারণ করে ইট, সুরকীর বোঝা মাথায় নিয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন। জেবুন্নিসা কিছুই বুঝতে পারে নি, হঠাৎ আচমকা এক অজানিত মজুরকে প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠল। কিন্তু আকিল খাঁর মুখের ওপর চাইবা মাত্র আকিল খাঁ কবিতার ছন্দে বলে উঠলেন—

'মন্ দর্ তলবত্ গির্দ-এ-জহাঁ মে গির্দন্'
'আমি তোর অনুসন্ধানে জগতের চারদিক ঘুরছি।'

জেবুন্নিসা পূর্বেই জেনেছিল, আকিল খাঁ তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বড়ই ব্যাকুল। সেইজন্যে কবিতার চরণ শুনে ও আকৃতি দর্শন করে সুচতুরা জেবুন্নিসার বুঝতে বাকী থাকল না—এই ব্যক্তিই আকিল খাঁ। তাই চৌসর খেলতে খেলতে উত্তর দিলেন।

'গর বাদ শুই বর সর-এ-জুলফম্ নরসী'
'বায়ুরূপে এলেও আমার কেশাগ্র পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

এই উত্তর শুনে আকিল খাঁ নতশিরে চলে গেলেন। তারপর থেকেই জেবুন্নিসা ও আকিল খাঁর মধ্যে পত্রাদি চলতে এবং গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল।

ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সুস্থ হয়ে দিল্লীতে ফিরে গেলেন, কিন্তু জেবুন্নিসা বাগানের কাজ শেষ না হওয়াতে ফিরে গেল না। সে সেই লাহোরেই থেকে গেল। অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্য। বাগান শেষ না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সে বাদশাহকে প্রলোভিত করল। বাদশাহ না থাকাতে জেবুন্নিসার সঙ্গে আকিল খাঁর মেশার প্রচুর সুযোগ হল। উভয়েই তারা মহব্বতের মেহেদি রঙে রাঙা হয়ে কাব্য মনের ছন্দময় দুনিয়াতে বুলবুলের সুস্বর শুনে নতুন নতুন স্বপ্ন রচনা করল।

জেবুন্নিসার তখন বয়স খুব কম না। আওরং যে সময়ে নিজেকে সঁপে দেবার আকাঙ্ক্ষায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা ভোলে, জেবুন্নিসা আওরতের সেই সন্ধিক্ষণ পার হয়ে অনেক দূর গিয়েছিল। কিন্তু তার মনে ছিল ক্ষুধা। সে ক্ষুধা ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা। নয় মহব্বতের জন্য বুভুক্ষু অন্তর তার লালায়িত ছিল।

সে পুরুষের স্পর্শ সুখ চাইত কিন্তু সে স্পর্শ সুখ দানবের নির্মম পেষনে বিকৃত করবার রূপে নয়—সে চাইত স্পর্শের মধ্যে দিয়ে কবিতার ভাষাহীন সপ্তমার্গে পৌঁছতে, যেখানে ভাষা পৌঁছয় না, ভাব হারায় তার পথ, ঠিক সেই অমৃতলোকে। আকিল খাঁর মধ্যে সে তাই পেয়েছিল। তাই তার বাদশাহী ঐশ্বর্যের প্রাসাদ থেকে নেমে এসে দীনা ও দেওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় সে চিন্তা করত—

'আহ্ জেবুন্নিসা বহুকুম কজা
নাগহাঁ অজ্ নিগাহ মখফী শুদ।'
'আহা, জেবুন্নিসা বিধাতার আদেশে
দৃষ্টি থেকে অকস্মাৎ লুকিয়ে গেছে।

কিন্তু নির্মম বিধাতা সে সুখ তার বেশীদিন স্থায়ী করলেন না। একদিন বাদশাহ পিতার এত্তেলা এসে উপস্থিত হল—'পত্র পাওয়া মাত্র যেন দিল্লীতে চলে আসা হয়।'

বাদশাহের আদেশ, লঙ্ঘন করার সাধ্য জেবুন্নিসার নেই। কিন্তু পেছনে ছিল একটি ষড়যন্ত্র। বাদশাহের চর চারদিকেই তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। সেই চরের কাছ থেকে শুনেছিলেন বাদশাহ, জেবুন্নিসাও আকিল খাঁর অবৈধ প্রণয় সংবাদ।

শুনে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু স্বভাবত তাঁর সংযম দিয়ে সাময়িক নিজেকে সংযত করেছিলেন। জেবুন্নিসা তারপর দিল্লীতে ফিরে গিয়েছিল।

সুচতুর বাদশাহ একদিন জেবুন্নিসাকে ডেকে তার শাদীর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বললেন—আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি তোমার শাদী করা দরকার। আমি অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করব, তোমার মতের অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করছি।

বাদশাহ পিতার এই প্রস্তাব শুনে আগে জেবুন্নিসা প্রতিবাদ করেছে,

কিন্তু বর্তমানে সেরূপ অভিযোগ না করে করজোড়ে মাথা নত করে বলল—জাঁহাপনা আমার গোস্তাকি মাফ করুন। এ ক্রীতদাসী শাহনশাহ আলমগীরের আদেশ শিরোধার্য পূর্বক গ্রহণ করছে। ধৃষ্টতা বলে যদি মনে করা হয় তবে জাঁহাপনার কাছে দাসী এই স্বাধীনতাটুকু প্রার্থনা করে, এ শাদীর কথা যেন সর্বত্র প্রচারের আদেশ প্রদান করা হয়। এ সংবাদ শুনে যাঁরা শাদীর প্রার্থী হবেন, দাসী স্বয়ং তাদের কুল-শীল পরীক্ষা করে একজনকে মনোনীত করবে।

জেবুন্নিসার প্রার্থনানুসারে তার শাদীর কথা সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ল। লাহোর, কাবুল, ইস্পাহান, ইরান, পারস্য, বাংলাদেশ প্রভৃতি সর্বত্র বাদশাহ প্রচার করে দিলেন তাঁর কন্যার শাদীর কথা। অনেক দেশ বিদেশ থেকে শাদীর প্রার্থীর এত্তেলা এসে দিল্লীর প্রাসাদে ভীড় জমাল। তাঁর মধ্যে আকিল খাঁর এত্তেলাও দেখা গেল।

নিজ-বংশমর্যাদা বর্ণনাসহ শাদী প্রার্থীদের প্রার্থনা-পত্র এসে পৌঁছলে পিতা-কন্যার মধ্যে অনেক আলোচনার পর লাহোরের সুবেদার আকিল খাঁর সঙ্গে জেবুন্নিসার শাদীর ব্যবস্থা হল। সেই বিষয়ে আকিল খাঁকে জানিয়ে দিল্লীতে আসবার জন্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আদেশ-লিপি নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী ছুটল। বাদশাহী ফরমান্ পেয়ে আকিল খাঁ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং শীঘ্রই যাত্রার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু যাত্রা আর তাঁর করা হল না। আর এক সংবাদ গোপনে তাঁর কাছে ছুটে এল। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দরবারে আকিল খাঁর বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সভাসদ্‌দের মধ্যে অনেকেই জেবুন্নিসার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আকিল খাঁ ও জেবুন্নিসার এই পরিণয়—তাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারল না। বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসা, রমণীরত্ন, তাকে আকিল খাঁর মত একজন তুচ্ছলোক ঠকিয়ে নিয়ে যাবে! সহ্য করতে না পেরে এই শাদীর ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার জন্যে আকিল খাঁর কাছে তাঁরা একটি পত্র প্রেরণ করল। তাতে লেখাছিল—

লাহোরে জেবুন্নিসার সঙ্গে তোমার যে গুপ্ত প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল, একথা শাহনশাহ ঔরঙ্গজেব আলমগীর অবগত আছেন। তিনি যে প্রকৃতির লোক, তুমি তাঁকে বিলক্ষণ জান—অতএব বুঝতেই পারছ, এর পরিণাম কি? বাদশাহজাদীকে শাদী করার প্রকৃত অর্থ যে প্রাণবধ

ছাড়া কিছু নয়, তোমার মত সুচতুর লোককে বেশী বলার প্রয়োজন নেই।

কুটিল প্রকৃতির ঔরঙ্গজেব বাদশাহ যেমন সকলকেই অবিশ্বাস করতেন—সেরূপ তাঁর ওপর শত্রু-মিত্র কেউই বিশ্বাস স্থাপন করত না। সকলেই জানত, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দ্বারা সাধিত হতে পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় বিরল। এই সব ভেবে আকিল খাঁ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন—নিশ্চয়, ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সরল মনে তাঁর কাছে ফরমান পাঠান নি, কোন দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। শাদীর প্রস্তাব সেই দুরভিসন্ধির আবরণ মাত্র। দিল্লীতে গেলে আর রক্ষা থাকবে না—শিরশ্ছেদন বা হস্তীপদতলে বিমর্দিত হতে হবে।

এই সব চিন্তা করে আকিল খাঁ মনে করলেন—বাদশাহজাদীকে লাভ করা আগে নয়, আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে। অতএব তিনি জেবুন্নিসাকে শাদী না করাই স্থির করে তদনুসারে কবিতায় স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে তা দিল্লীতে প্রেরণ করলেন এবং বাদশাহী কাজ পরিত্যাগ করে প্রাণভয়ে লাহোর থেকে সরে পড়লেন।

জেবুন্নিসা যখন আকিল খাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করল তখন তার মাথা ঘুরে গেল। এত করে বাদশাহ পিতার মনোরঞ্জন করে যে শাদীর আয়োজন সম্পূর্ণ হল, সে শাদী আকিল খাঁ ভেঙে দিল!

আকিল খাঁ কবিতায় যে পত্র প্রেরণ করেছিল—

'নহি হোতা বন্দাসে তায়েত জিয়াদা
বস্ অব্ খানা আবাদ ও দৌলত জিয়াদা।'
'দাসের দ্বারা অধিক আদেশ প্রতিপালিত
হতে পারে না। ধন দৌলত ও বাড়ি
ঘরের এই শেষ।'

জেবুন্নিসা দারুণ মর্মাহত হল। জীবনে শাদীই করবে না বলে সে ঠিক করেছিল। যদিই বা সে ইচ্ছা তার হল, খোদা তার সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিল। এখানে ফকীরী বা আমিরী কন্যার একই মনের অবস্থা। জেবুন্নিসা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর নয়, এবার শাদীর কথা চিরতরে বিস্মৃত হতে হবে। আল্লার অভিপ্রেত নয় তার জীবনে সুখ আসুক। খোদা যখন অনিচ্ছুক তখন মানুষ কি করবে?

সেদিন জেবুন্নিসার মানসিক অবস্থা চিন্তা করলে তার দুঃখে প্রত্যেকেরই

চোখে জল আসে। জীবনে সে কি পেল? কিছু না। ধনদৌলত, হীরা, মণিমাণিক্য সবই ছিল কিন্তু ব্যবহার করার স্পৃহা না থাকায় তা হল একান্ত মূল্যহীন। জেবুন্নিসা যেন কুঁড়েঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সারারাত কম্পমান তৈলপ্রদীপ জ্বালিয়ে কেঁপেছে, প্রদীপের বুকে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে—প্রদীপের তেল যেন ফুরিয়ে না যায়, ফুরিয়ে গেলে আলো নিভে যাবে। অন্ধকারে দয়িত তাকে না দেখতে পেয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রদীপের তেল ফুরবার আগেই দমকা বাতাসে প্রদীপ নিভে গেল। জেবুন্নিসা অবাক হয়ে তাই ভাবতে পারে না, কেমন করে প্রদীপ নিভল?

ঔরঙ্গজেব অনেক আগে থাকতেই পারস্যাধিপতির পুত্র শাহজাদা ফরুখকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছিল কিন্তু গোপনে ঔরঙ্গজেব জেবুন্নিসার পুনর্বায় শাদীর তোড়জোড় করার জন্যে শাহজাদা ফরুখকে সত্বর দিল্লীতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। শাহজাদা ফরুখও জেবুন্নিসাকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সুপুরুষ ও কাব্যরসে রসিক ব্যক্তি। মোগল পরিবারের সকলের একান্ত বাসনা ছিল এরূপ এক রাজপুত্রের সঙ্গে সম্রাট দুহিতার শাদী হোক্। আর তাছাড়া ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজনীতি দিয়ে এই শাদী সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন শুধু পারস্যাধিপতিকে নিজের বশে আনবার জন্যে।

ইরানের রাজপুত্র শাহজাদা ফরুখ্ দিল্লীতে এসে জেবুন্নিসার শাদী প্রার্থী হলে জেবুন্নিসা শাহজাদা ফরুখকে একবার স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছায় নিজের মহলে আহার করাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠান। শাহজাদা ফরুখ জেবুন্নিসার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হন। তিনি জেবুন্নিসাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক সাদরে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আহার করবার জন্য যথাসময়ে জেবুন্নিসার মহলে উপস্থিত হন এবং ভোজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করে খাদ্যসামগ্রীর প্রশংসা করতে করতে আহারে প্রবৃত্ত হন।

জেবুন্নিসা চিকের অন্তরাল থেকে আহারের তদারক করছিল। শাহজাদা ফরুখ জেবুন্নিসার উপস্থিতি লক্ষ্য করে হঠাৎ কবিতায় বললেন—

'সম্বুসা—এ-বেসন বিদা'

'বেসনের সম্বুসা দেও।'

এই কথাটির অর্থ দু'প্রকার ভাব প্রকাশ করে। সরলভাবে দেখতে গেলে বেসনের সম্বুসা, সিঙ্গারার মত খাদ্যদ্রব্য দেও, এই অর্থ হয়। অক্ষর বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে অর্থ করতে গেলে বে, সন অর্থাৎ 'স' ও 'ন' এই দু অক্ষর ছাড়া 'সম্ব্সা' দেও, এই ভাব ব্যক্ত হয়। সম্ব্সা থেকে 'স' ও 'ন' বাদ দিলে কেবল 'বুসা' শব্দ হয়। 'বুসা' শব্দের অর্থ চুম্বন। তাহলে বুঝতে পারা যায় যে শাহজাদা ফরুখ্ জেবুন্নিসাকে বলছেন—চুম্বন দেও।

জেবুন্নিসা সরলভাবের অর্থ ধরে না নিয়ে শেষের কুটিল অর্থই ধরে নিল। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তঃপুরের রমণীকে লক্ষ্য করে একজন অপরিচিত পুরুষ এইরকম কথা বলে ধৃষ্টতা প্রকাশ করাতে জেবুন্নিসা বড় রুষ্ট হল। সেও তৎক্ষণাৎ দ্ব্যর্থযুক্ত কথায় উত্তর প্রদান করে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

'অজ মতবখ্-এ-মা দর তলব'

এ কথার সরল অর্থ করতে গেলে—'আমাদের রান্নাঘর থেকে চেয়ে নেও'—এরূপ বুঝায়। 'মা' ও 'দর' এই দু শব্দ একত্র করলে 'মাদর' শব্দ হয়, এর অর্থ মাতা। এইরকম বললে—'তোর রান্নাঘরের মার কাছ থেকে চেয়ে নেও' অর্থ প্রকাশ হয়। শাহজাদা ফরুখও শেষের অর্থই গ্রহণ করে লজ্জিতমনে আহার-স্থান থেকে মাথা হেঁট করে চলে গেল।

জেবুন্নিসা আগেই একরকম স্থির করেছিল—আর শাদী করবে না। কেবল তার পিতার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করা ধৃষ্টতা ভেবে শাহজাদা ফরুখকে শাদী করতে সম্মত হয়। তাও সন্তুষ্টচিত্তে বা স্বেচ্ছায় নয়। এই ঘটনার পর সে শাহজাদাকে শাদী করতে কোনমতেই স্বীকার করল না। সে বলল—যে ব্যক্তি রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে কর্তব্যজ্ঞানহীন, হেন ব্যক্তিকে শাদী করা ধিক্।

ইরান রাজপুত্র ইতিপূর্বেই একটি স্বরচিত কবিতা পাঠিয়ে মোগলবাদশাহ দুহিতা জেবুন্নিসার হৃদয় আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তার উত্তর প্রদানেও জেবুন্নিসা তার কবিতার মধ্যে দিয়ে যথোপযুক্ত অর্থ ব্যবহার করেছিল।

'তয় অয়্ মাজবীন্ বেপরদা দীদন্ আভু দারম্
জমালত্ হা-এ-হুসনত্রা রসীদন্ আর্জু দারম্।'
'হে চন্দ্রাননে—তোমাকে অবগুণ্ঠন থেকে বিমুক্ত
দেখতে বাসনা পোষণ করি।

তোমার রূপ লাবণ্যের সমীপে পৌঁছবার
ইচ্ছা করি।

জেবুন্নিসা শাহজাদা ফরুখের এই কবিতা পাঠ করবার পর নিজের উত্তর প্রদান করে।'

'বুলবুল্ অজ্ গুল্ বগুজর—
র্গিদ্ চমন্ বীনদ মরা।
বুত পরস্তী কে কুনিদ্—
গর ব্রহমন্ বীনদ মরা।
দর সুখন্ পিনিহা শুদম্—
চৌ বু-এ-গুলদর্ বর্গ-এ-গুল্,
হর্ কি দীদন মৈল্ দারদ—
দর্ শুখন্ বীনদ মরা।'

'আমাকে বাগানে দেখলে বুলবুল ফুল ত্যাগ করে।
ব্রাহ্মণ যদি আমাকে দেখে তবে সে আর কেন
মূর্তি পূজা করবে।
ফুলের সুবাস যেমন ফুলের পাপ্‌ড়ীর ভেতর
লুকিয়ে থাকে, আমিও তেমন আমার কবিতার
ভেতর লুকিয়ে আছি।
যে আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে সে আমার
কবিতার ভেতর আমাকে দেখতে পাবে।'

জেবুন্নিসা এরমধ্যেই সংবাদ পেয়েছিল. আকিল খাঁ দিল্লীতে লুকিয়ে আছে। জেবুন্নিসা আকিল খাঁকে কিছুতে ভুলতে পারছিল না। তার হৃদয়-মনের সব জায়গায় আকিল খাঁর স্মৃতি। আকিল খাঁ কাপুরুষের মত তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও জেবুন্নিসা কিছুতে তাঁকে বিস্মৃত হতে পারছিল না। তাই একদিন লোক দ্বারা আকিল খাঁর অনুসন্ধান করে বাদশাহ পিতার অগোচরে সাবধানে এক কবিতার লিপি প্রেরণ করল—

'শুনিদম তর্ক খেদমত কর্দ আকিল খাঁ বনাদানী'
'শুনিলাম নির্বুদ্ধিতায় আকিল খাঁ খিদমত
অর্থাৎ রাজসেবা ত্যাগ করেছে।'

এই লিপি পেয়ে আকিল খাঁ শাহজাদীকে সংক্ষেপে তাঁর উত্তর লিখে পাঠালেন।:

'চিরা কারে কুনদ-আকিল কি বাজ আয়েদ পুশিমানী'
'আকিল কি এমন কাজ করে যে জন্য পরে
অনুতাপ করতে হয়?'

এ স্থলে আকিল খাঁ দুটি অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমত তার নাম, দ্বিতীয় অর্থ,—বুদ্ধিমান।

এরূপে জেবুন্নিসা ও আকিল খাঁর মধ্যে আবার পত্রাদি চলাচল আরম্ভ হল এবং কিছুদিন পর আকিল খাঁ জেবুন্নিসার অনুরোধে মহলে যাতায়াত আরম্ভ করলেন।

জেবুন্নিসার মহলে আকিল খাঁ ছদ্মবেশে যাতায়াত করছে এ বিষয় বেশীদিন গোপন থাকল না। বাদশাহী মহলের প্রায় অনেক লোকই এই ঘটনা জানতে পেরে একথা নিয়ে দুর্গ মধ্যে কানাঘুষা করতে লাগল। এক সময় দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংবাদ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কানেও পৌঁছতে বাকী রইল না। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে কন্যার এই ব্যবহারে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হলেন। এবং গোপনে সন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করলেন। একদিন জেবুন্নিসার এক বাঁদীকে উৎকোচদানে বশীভূত করে আকিল খাঁ কখন কন্যার মহলে আসে জেনে নিলেন। এবং একদিন হাতে-নাতে ধরবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন।

একদিন আকিল খাঁ জেবুন্নিসার মহলে উপস্থিত থাকার সময় বাঁদীর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব নিজে প্রহরীর দ্বারা মহল ঘেরাও করিয়ে কন্যার মহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

জেবুন্নিসা মহলের মধ্যে পিতার আগমন বার্তা শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। যা তার জীবনে কখনও হয় নি, তাই তার জীবনে হল। শাহজাদী রোশোনারার মত তারও কলঙ্ক সাম্রাজ্যের লোকেদের রসের খোরাক হল। কিন্তু উপায় কি? দিলের তাড়না, প্রাণের আকাজ্ক্ষায় যে চঞ্চলতা কমাতে পারে নি তার সেলামী তাকে দিতেই হবে। দুরু দুরু বক্ষে পিতার কবল থেকে নিষ্কৃতির জন্য মরিয়া হয়ে মুহূর্তে পরিত্রাণের চেষ্টা করল। সামনে একটি স্নানের জল গরম করবার বড় দেগ্ মহলের এক কোনে ছিল, অনন্যোপায় হয়ে সে তারই মধ্যে আকিল খাঁকে লুকিয়ে রাখল।

এদিকে ঔরঙ্গজেব কন্যার মহলে প্রবেশ করে সমস্ত স্থান তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও আকিল খাঁর কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না। তিনি

বিস্মিত হয়ে সংবাদকারীর ভুল সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করছিলেন, হঠাৎ সামনে একটি জল গরম করবার বৃহৎ দেগ দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তিনি অনুমানে ঠিক করলেন—এর মধ্যে আকিল খাঁর লুকিয়ে থাকা খুবই সম্ভব। এরূপ মনে করে তিনি তাতার প্রহরিনীকে দেগ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এতে কি হয়? উত্তরে জানতে পারলেন, এতে জেবুন্নিসা বেগমের স্নানের জল গরম করা হয়।

এ কথা শুনে তিনি বললেন—জল গরম করা হচ্ছে না কেন? এখনই জল গরম কর।

জেবুন্নিসা পিতার এই নিদারুণ আদেশ শুনে মৃতপ্রায় হয়ে গেল। তার প্রতিবাদের ভাষা কোথায়? প্রতিবাদ করলেই বা শুনছে কে? চিরদিন জেবুন্নিসা আল্লাকে ডেকে এসেছে, কোরাণের অনুচ্ছেদ ব্যাখা করেছে, সেই মুহূর্তে মনে মনে খোদাকে অনেক ডাকল, বলল—'তুমি তো জান খোদা, আমার মনের অভিপ্রায়! আমি জীবনে কি পেয়েছি? তাই যেটুকু পেয়েছিলাম, আপন কলিজায় ঢেকে রাখবার জন্যে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি।' কিন্তু খোদা মৌনই রইলেন। বরং বাদশাহের নিষ্ঠুরতায় তাঁর সাহায্য প্রমাণিত হল। রুদ্র প্রকৃতির ঔরঙ্গজেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জলন্ত আগুনে ভরা চুল্লির ওপর সেই বৃহৎ দেগ চড়িয়ে দিতে বললেন।

এ দৃশ্য জেবুন্নিসার পক্ষে কিরূপ হৃদয়-বিদারক হয়েছিল সে কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে আকিল খাঁ এ ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন, তাঁকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই। একদিন জীবনের প্রথম বসন্তে মুবারক এমনি পিতার কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছিল সেদিনও জেবুন্নিসা কিছু বলতে পারে নি, আজও পারল না। আজও রমণী সুলভ জড়তা তাকে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট করে হতবুদ্ধি করে রাখল।

পিতা দেগের কাছ থেকে সরে গেলে হতবুদ্ধি জেবুন্নিসা পাগলের মত চীৎকার করে দেগের অভ্যন্তরের উদ্দেশ্যে বলল—

'দম্ বাশ মিসাল-এ-কল্লা বারে'

তার অর্থ, একবার মুহূর্তের জন্য মুণ্ডের মত থাক, মুণ্ডের অর্থ এখানে ছেদিত মস্তক বুঝতে হবে। অর্থাৎ ছিন্ন মস্তকের মুখ ও জিহ্বা থাকলেও যেমন কথা বলতে পারে না, সেইরূপ নীরব থাক।

আকিল খাঁ জেবুন্নিসাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসতেন। হেন প্রিয়জনের

সু. ২৫-১৬

অনুরোধ অবহেলা করা অপেক্ষা স্বয়ং জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরা শ্রেয় মনে করলেন এবং তদনুসারে তিনি তিলে তিলে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করলেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি কটি কথা বলেছিলেন।

'বাদ মুর্দন জে জফা-এ-তু অগর ইয়াদ্ কুনম্
অজ্ কফন্ দস্তবরু আরম ও ফরিয়াদ কুনম্'
'মৃত্যুর পরও যদি তোর উৎপীড়নের কথা মনে করি
শবাচ্ছাদনের ভেতর থেকে হাত বের করে
আল্লার নিকট বিচার প্রার্থনা করব।'

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ আকিল খাঁকে নৃশংসরূপে হত্যা করার পর তাঁর কন্যাকে কোনরূপ লাঞ্ছনা বা তিরস্কার করেন নি কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, ঔরঙ্গজেব মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেব এ যাবৎকাল বহু যুদ্ধ বিগ্রহে সাম্রাজ্যকে আসন্ন ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচিয়ে চলেছিলেন। বিশেষ করে জিজিয়ার বিরুদ্ধে রাজপুতরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বার বার মোগল বাদশাহকে চঞ্চল করে তুলছিল। মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ খাইবার গিরিবর্ত্মের সন্নিকটে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

সম্রাট পূর্ব থেকেই মারবাড় রাজ্য অধিকার করতে উৎসুক ছিলেন। সুতরাং যশোবন্তের মৃত্যুর পর তিনি মারবাড় রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্বে আনলেন। ইতিমধ্যে যশোবন্তের বিধবা রাণী তাঁর অচিরজাত পুত্রসন্তানের সঙ্গে দিল্লীর পথে স্বদেশ যাত্রা করলেন। ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁদের গতিরোধ করলেন। রাঠোর রাজ্যের এই ঘোর সঙ্কটকালে যশোবন্তের মন্ত্রিপুত্র রাজপুতকুলগৌরব দুর্গাদাস উদ্ধার কর্তারূপে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অপূর্ব কৌশলে ও বীরত্বে রাণীমাতা ও তাঁর শিশুপুত্র নির্বিবাদে মারবাড়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর মেবারের রাণা রাজসিংহ মারবাড়ের সঙ্গে যোগদান করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সম্রাটের সৈন্যরা উভয় রাজ্যে প্রবেশ করে দেশ ছারখার করতে লাগল, কিন্তু তারা কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারল না।

ঔরঙ্গজেবের কোন পুত্র তখন দিল্লীতে ছিল না, এক শাহজাদা আকবর ছাড়া। শাহজাদা আজম ও মুয়াজ্জম কাবুলে ও দাক্ষিণাত্যে। সম্রাট এই

আকবরকে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। কিন্তু রাজপুতনায় গিয়ে বিদ্রোহ দমনের পরিবর্তে শাহাজাদা আকবর বিদ্রোহীদের দলে মিশে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করল।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহীপুত্রকে দমনের জন্য নিজেই বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। আজমীরের কাছে শাহজাদা আকবরের শিবির সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বাহিনী অধিকার করল। শাহজাদা দুর্গাদাসের সহায়তায় মারাঠারাজ সাম্ভাজীর রাজ্যে আশ্রয় নিল। বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে ভ্রাতা আকবরকে জেবুন্নিসা যে সব গুপ্ত চিঠি লিখেছিল, রাজসৈন্য শিবির অধিকার করে তা হস্তগত করল। এবং সম্রাটের কাছে নিয়ে গেল।

অপরাধী পুত্র হস্তচ্যুত, সুতরাং বিদ্রোহীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ঔরঙ্গজেবের সমস্ত ক্রোধ জেবুন্নিসার ওপরে গিয়ে পড়ল। অবশ্য যদি সম্রাট একটু অনুসন্ধান করতেন তাহলে জেবুন্নিসার অপরাধের পিছনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র নিহিত আছে, দেখতে পেতেন। সহোদর ভাইকে ভালবাসার জন্যে যে সব চিঠি তাকে সে দিয়েছিল তার মধ্যে উপদেশ ও আদেশ ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে যে জাল-পত্র প্রবেশ করিয়ে জেবুন্নিসার চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল—তা কে আর বলবে?

সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রাসাদে ফিরে কন্যাকে ডাকতে পাঠালেন। এবং সে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব জলদগম্ভীরস্বরে প্রহরীদের হুকুম দিলেন—অবিলম্বে এই বিদ্রোহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। বাদশাহের হুকুম অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালিত হল।

জেবুন্নিসা কিন্তু কোন কথাই জিজ্ঞেস করল না। কেন তার এই অবস্থা? কি জন্যে সে সম্রাটের এই সম্মান পেল? শুধু হতবুদ্ধির মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ছল ছল চোখে পিতার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল।

বিদ্রোহিনীদের শাস্তি প্রাণদণ্ড বা আজীবন কারাবাস। মোগল সাম্রাজ্যের বিধানে বিদ্রোহীর শাস্তি বড় চরম। বিনা অপরাধে বিনা বিচারে জেবুন্নিসার আজীবন কারাবাসের নির্দেশ প্রচারিত হল। যেখানে দারা শিকো তাঁর

জীবনের শেষদিন কাটিয়ে গেছেন। সেই সলমীগড় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে জেবুন্নিসা আবদ্ধ হল।

জেবুন্নিসা চলে যাবার পর মোগল হারেমের রাতের স্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে দিয়ে রমণীকণ্ঠে কে যেন পাগলের মত হি হি করে হেসে উঠল। তবে কি এতকাল অন্ধকারের মধ্যে কোন পিশাচিনী ওৎ পেতে মোগল হারেমের ধ্বংসের মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল! কিন্তু দেখা গেল, উদিপুরী বেগম সরাবের পাত্র হাতে করে পালঙ্কে অর্ধশায়িত হয়ে অবিন্যস্তবসনে মাতাল কণ্ঠে হেসে চলেছেন। তাঁর তন্দ্রাবিজড়িত দুটি চোখের নীলে যেন কি এক বিজাতীয় কুটিল সর্বনাশের ছায়া! তিনি বিড় বিড় করে বলছেন--আমি কি জন্যে মোগল হারেমে ঢুকেছিলাম? আমি কি জন্যে আমার প্রিয়তমের হত্যাকারীকে আপন বক্ষে স্থান দিয়ে তাঁকে পেয়ারের ইস্তেজার দেখিয়েছি? শাহজাদী রোশোনারার দেহের মধ্যে বিষের নীল ছায়া পুরে তাকে যন্ত্রণায় শেষ করে দিয়েছি। আর সে কাজ করেছে, আমারই সৃষ্ট বাঁদর হিন্দুস্তানের বাদশাহ আলমগীর পাদিশাহ। যাঁর কথায় সমস্ত সাম্রাজ্যে চন্দ্র ও সূর্য ওঠে। আর আজ, পিতার বুক থেকে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্যের বিচারে আজীবনের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেছি। আমারই লোক সম্রাটের কাছে জেবুন্নিসার লিখিত জাল চিঠি দেখিয়েছিল।·· ·········উদিপুরী বেগম হাসতে হাসতে পাগলের মত পালঙ্কের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আর হারেমের স্তব্ধতা ভেঙে গিয়ে ঐশ্বর্য ঝলমল কক্ষের রত্নশোভায় দারুণ আলোড়ন উঠল।

জেবুন্নিসা পিতার অবিচারে কাঁদে নি। সে মনে মনে নিশ্চিন্তই হয়েছিল। কাঁদবে কেন? সে তো নতুন কোন পরিবেশে গিয়ে নতুন জীবনের সুরু করছে না? ছিল বন্দী প্রাসাদে জীবনের এতগুলি বছর। এখন না হয় সেই প্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আর একটি স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এখানে অনেক লোকের মুখ দেখা হত, সেখানে হবে না। কিন্তু অনেক লোকের মুখ দেখে তার এত বছর ধরে লাভ কি হয়েছে? কিছুই হয় নি। বন্দীর মানসিক অবস্থার মতই তার মানসিক অবস্থা থেকেছে। মাঝে মাঝে যা পরিবর্তন হয়েছে, শাসনের রক্তচক্ষু দিয়ে আবার তা স্তিমিত করে দেওয়া হয়েছে। আলো অনেক ছিল প্রাসাদের মাথার ওপর আসমানের মাঝে। কিন্তু সে আলো

ভাল করে দেখার মত সুযোগ ছিল না। বাদশাহজাদীর সম্মানে তাকে পিতা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন কোষাগার, কিন্তু ধনরত্নের পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন। তার জন্যে দুঃখ তার মনে জমে নি। সে শুধু চেয়েছিল, সরল সুন্দর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে—শালিমার বাগের—অম্বুরীবাগের সহস্র ফুলের মধ্যে একটি ফুলের মত সুন্দর জীবন।

মানুষের শরীরে জন্মে জীবনের চাহিদাকে হত্যা করে ঐশ্বর্যের মেকি জৌলুসে যদি প্রাণের মমতা নিঃশেষিত হয়ে যায়—তবে বাদশাহ কন্যার জীবনের মূল্য কি? দুনিয়ার সমস্ত আওরতের মনের যে আবেদন, সেই আবেদন নিয়েই বাদশাহ কন্যার পৃথিবীতে আগমন। তার কাছ থেকে যদি ধর্মচ্যুত, অপার্থিব, অসম্ভব, কিছু আশা করা হয়—তাহলে ভুলই করা হবে!

তাই সলিমগড় কারাগারে নির্বাসিতা হতে জেবুন্নিসা মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। আলো নেই, বাতাস নেই, পুষ্পের সৌরভ নেই, জগতের কোন লোভই তাকে আর হাতছানি দিয়ে ডেকে মর্মপীড়া দেবে না। বেশ হবে। বাকী দিনগুলি অন্ধকারের কারাপ্রাচীরের আড়ালে কাটাতে পারলে আর বিচারের জন্য অন্তত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কারুর কাছে দাঁড়াতে হবে না।

একুশটি বছরের একাধিক নির্মম দিনরাত্রিগুলি জেবুন্নিসার কেটেছে কঠোর জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব যেমনি কন্যাকে স্নেহ করতেন তেমনি বিদ্রোহিনীর শাস্তি অতি নির্মমভাবে সমাধা করেছিলেন। এমন কি কন্যার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, বার্ষিক চার লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে দিয়েছিলেন তাকে ভুলে যেতে সে একদিন ছিল সম্রাট মহীউদ্দিন আলমগীরের একমাত্র পেয়ারী কন্যা জেবুন্নিসা।

শুধু বন্দী। বন্দীর যেটুকু প্রাপ্য তার বেশী এই এতগুলি বছর সে কিছুই পায় নি। রাজদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর কলিজার স্নেহপাশ সম্পূর্ণ শুষ্ক করে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয়, মানুষের শরীরের এই মহান পুরুষকে।

কারাপ্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ বন্দী-দশায় তখন তার কবি চিত্তে বেদনাভরা কত ভাবের উদয় হত, কত বিষাদ গীতি মুকুলিত হয়ে ঝরে পড়ত। তাই কারাগৃহের সেই অন্ধপ্রকোষ্ঠে বসে সে লিখেছিল।

'কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, যতদিন চরণ যুগল,
বন্ধু সবে বৈরী তোর আর পর আত্মীয়-সকল।
সুনাম রাখিতে তুই করিবি কি, সব হবে মিছে,
অপমান করিবারে বন্ধু যে গো ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ-কারা হতে মুক্তি-তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌কী রাজচক্র নিদারুণ, বিরূপ কঠোর;
জেনে রাখ্‌ বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে না লৌহ-কারাগার।'

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জেবুন্নিসা লিখেছিল।

'বর মজার—এ-মা গরীবাঁ নে চেরাগ ওনে গুলে
নে পর-এ পরওয়ানয়ে ওনে সদা-এ-বুলবুলে।'
'জন্মভূমিত্যাগী আমাদের সমাধির ওপর
একটি প্রদীপও নেই, ফুলও নেই।
একটি পতঙ্গের পক্ষ পর্যন্ত নেইও
বুলবুল পাখীর শব্দ নেই।'

মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। জেবুন্নিসা কারাকক্ষে বসে বসে প্রতিটি দিন মৃত্যুকে প্রার্থনা করেছিল। মৃত্যু তাব জীবনেব আনন্দলোকে নিয়ে যাবে। মৃত্যু আসবে মহাবল আনন্দময় বাহু দিযে আলিঙ্গন করে জ্যোতিকলোকে নিয়ে যেতে। যেখানে স্বার্থ নেই, বাদশাহী তখ্‌ত নেই। হত্যার কলুষতা নেই। ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য নেই। শাসনের রক্তচক্ষু নেই। সেই অপার্থিব দেশের আকাঙ্ক্ষায চিরজীবন ধরে জেবুন্নিসা প্রার্থনা করেছে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থনা করছে।

শেষপর্যন্ত সেই মৃত্যুই একদিন তার দুবাহু বাড়িয়ে মহব্বতের আলিঙ্গনে জেবুন্নিসার অতৃপ্ত জীবনের মুক্তি এনে দিল। দোষ কি জেবুন্নিসা করেছিল? তাকে কি পথনারীর মর্যাদায় ফেলা যায়? এ প্রশ্নের সমাধান—আসমানের ঐ নীলের সমারোহে লুকায়িত যে মহান পুরুষ বসে বসে দোষগুণের বিচার করছেন, তিনি করবেন।

কিন্তু বাদশাহজাদীর মৃত্যুর কথা যখন ঘোষিত হল, বাদশাহের সমগ্র রাজ্য সেদিন শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণ করেছিল। আর যে বাদশাহ

এতদিন স্বার্থের অমানুষী মায়া ও রাজনীতির কুটিল-চক্রে অপত্য-স্নেহও ভুলেছিলেন, তিনি আর শোক সংবরণ করতে পারলেন না।

দরবারকক্ষের হাজারো মণিমুক্তায় শোভিত ঐশ্বর্যশালী সিংহাসনের উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কুটিল ভয়ঙ্কর মুখের ওপর ক্ষুদ্রাকার দুটি চোখ ভরে অশ্রুধারা স্রোতস্বিনী হয়ে নির্ভীক তেজস্বী সম্রাটের কঠিন বুকখানা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইল। তিনি চীৎকার করে শুধু সমস্ত দরবার কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে পাগলের মত বলে উঠলেন—কোষাগার খুলে দাও, সমস্ত ধনরত্ন গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দাও। আমার রত্ন আজ সমাধির গর্ভে বিলীন হয়ে গেল।

জেবুন্নিসার মৃত্যুর পর পাঁচটি বছর নিদারুণ এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মোগল বংশের শেষ বাদশাহ মহীউদ্দিন আলমগীর অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে অন্যায় করেছেন, হত্যার কলুষতায় তাঁর হাত কালিমালিপ্ত করেছেন কিন্তু কখনও তীব্র অনুশোচনায় এতবেশী ক্ষতবিক্ষত হন নি, যা তাঁর কন্যার বিহনে হয়েছিলেন। তিনি পরে বুঝেছিলেন, আল্লা তাঁর কাছ থেকে কৌশল করেই কন্যাকে ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কেউ তাঁর স্নেহপাত্রী থাক্, আল্লার অভিপ্রেত ছিল না।

আজ তাই দিল্লীর কাবুলী-তোরণের বহির্ভাগে তিরিশ হাজারী উদ্যানে ঘাসের গালিচার নীচে সমাহিত জেবুন্নিসার সমাধি দর্শন করে বলতে ইচ্ছা করে, শত শত বছর পূর্বে যে কুসুম কোমল সৌন্দর্যের বর্ণাঢ্য নিয়ে নিজেকে জগতে বিকশিত করে গিয়েছিলে; তোমার ব্যর্থজীবনের সেই আকুতি ভরা হৃদযবেদনার সুর এখনও স্তিমিত হয় নি, তোমার কবিতার মধ্যে যে বুলবুলের সুস্বর জাগ্রত হয়ে তোমাকে মনে করাত, তেমনি আজও তোমার সেই রচিত কবিতা পড়লে, আর বুলবুল ডেকে উঠলে তোমাকে মনে পড়ে।

দিল্লীর প্রাসাদের সেই ভগ্নস্তূপ এখনও আছে। এখনও সেখানে সূর্য ওঠে, রাত্রে চন্দ্রিমা তার আলো বিকশিত করে দয়িতকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। পুষ্পের সৌরভ চারদিকে তার সুগন্ধ বাতাস ছড়িয়ে যদি নরনারীর মিলনের সেতু রচনা করে তাহলে তোমার কথা তাদের মনে পড়বে।

জীবনে যে না পাওয়ার বেদনা কি! পেয়েও যে হারায়—তার বেদনা

উপশমের জন্য তোমার জীবনগাঁথা চিরকাল অমর-স্মৃতি ধারণ করবে। আওরতের চোখের অশ্রুই তোমার স্মৃতি হয়ে চিরকাল থাকবে। তাই তোমারই রচিত কবিতা মনে পড়ে।

'কতকাল লুকাবি রে প্রজ্বলিত হিয়া!
ধক্ ধক্ শিখাগুলি, ঐ দেখ্ আসে বাহিরিয়া।
তোর ঐ দীর্ঘশ্বাস-বাষ্পরাশি-তলে
আকাশের যত তারা ম্লানদীপ্তি লুকাবে সদলে।'

মোগল মহিমার মহাশ্মশান ঐ দিল্লী, ঐ আগ্রা। সবই গিয়েছে,—আছে শুধু হৃদয়-মনোহর স্মৃতি! সেই দিল্লী আগ্রার বাদশাহী-উদ্যান একদিন একটি অতুলনীয় সুষমাময়ী প্রসূনের সুবাসে আমোদিত ছিল, যার পবিত্র সুরভি এখনও তেমনিই স্নিগ্ধ, তেমনিই মনোমদ।